সানন্দা

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২

রান্নাঘর
হিমাচলি কুইজ়িন

বিশেষ রচনা
ব্যতিক্রমী দুর্গাপুজোর গল্প

ফ্যাশন
'Plus' en Vogue
পুজোর ফার্স্ট কাট

স্বাস্থ্য
ডেঙ্গুর মোকাবিলায়

সানন্দা প্রচ্ছদকাহিনি

গল্প
ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়
পত্রলেখা নাথ
সুবর্ণ বসু
রজতশুভ্র মজুমদার

নেপথ্যের দশভুজা
যারা পুজোর সময় আড়ালে থেকে বাকিদের ছুটিকে মসৃণ করে তোলেন, তাঁদের কথা।

প্রশাসনে মহিলারা
রানি দ্বিতীয় এলিজ়াবেথ কি প্রশস্ত করেছেন পৃথিবীর মহিলা প্রশাসকদের পথ?

সূচিপত্র

৩৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২। ১৩ আশ্বিন ১৪২৯



৪

প্রচ্ছদকাহিনি ১
নেপথ্যের দশভুজারা

শুধুই মাটির প্রতিমা নয়, দশভুজারা লুকিয়ে আছেন আমাদেরই আশেপাশে। যাদের নিরন্তর পরিশ্রমে খুশিতে ভরে ওঠে আমাদের পুজোর চারদিন। রইল এরকমই কয়েকজন ‘দশভুজা’-র কাহিনি।



৮৮

পুজোর মেনু
পুজোয় ভোজবাজি

পুজো মানেই ঘোরাফেরা আর ডায়েটহীন খাওয়াদাওয়া। এই সময় বিভিন্ন রেস্তরাঁ, হোটেল আলো করে থাকে হরেক স্বাদের পুজোর মেনু। শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণের সেরকমই কিছু রেস্তরাঁর মেনুর খোঁজ নিয়ে হাজির হল এবারের সানন্দা।

৩ চিঠিপত্তর
৩ সুদোকু
১২ প্রচ্ছদকাহিনি ২
গল্প ১ : নির্মাণকৌশল
সুবর্ণ বসু
গল্প ২ : অন্তরাগের ওপারে
পত্রলেখা নাথ
গল্প ৩ : লাইকা’স লিপস্টিকস
ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়
গল্প ৪ : ভোর হল দোর খোলো
রজতশুভ্র মজুমদার
৩০ প্রচ্ছদকাহিনি ৩
সম্প্রতি দ্বিতীয় এলিজ়াবেথের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হল তথাকথিত রাজা-রানির যুগ। এখন প্রশাসনের অর্ধেক আকাশ নারীদের। বিশ্বের নানা প্রান্তে নির্বাচনের মাধ্যমে জয়ী তেমনই কিছু নারী-প্রশাসকদের সাফল্যের নানা ইতিবৃত্ত।
৩৮ শেফস স্পেশ্যাল ১
পুজোয় অফুরান আনন্দের সঙ্গে চলুক হাউস পার্টির আনন্দ। হাউস পার্টি মানেই হল ঘরে তৈরি মুখরোচক খাবার। সেই খাবারে থাকুক রেস্তোরাঁর স্বাদ। ঘরে বসে সেই স্বাদের সন্ধান পেতে রইল ‘দি অ্যাস্টর’-এর লোভনীয় পদ।
৪০ নগর
৪২ স্বাস্থ্য
পুজোর মরসুমে শহরে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে কপালে। রইল বিশেষজ্ঞের পরামর্শ
৪৫ পরিচর্যা
৪৬ রান্নাঘর
চেনা উপকরণে জন্ম নেয় হিমাচলের স্বাদের জাদু। বাহারি রান্নার স্বাদের কুকবুক।
৫২ ফ্যাশন ১
৬০ সৌন্দর্য
৬৩ কেনাকাটা
৬৪ ইভেন্ট ১
৬৬ ধারাবাহিক
শ্রীমতী
তাপস রায়
৭২ শেফস স্পেশ্যাল ২
‘অল্টেয়ার বুটিক হোটেল’-এর লোভনীয় পদ
৭৪ ফ্যাশন ২
৭৮ ফ্যাশন ৩
৯৬ বিনোদন
৯৭ গ্র্যান্ড
পুজোর গ্র্যান্ড আয়োজন
৯৮ বিশেষ রচনা
কলকাতা ও জেলার একাধিক ঐতিহ্যবাহী বাড়ির পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা রীতিনীতি।
১০২ পার্শ্বরচনা
এই পুজোয় মেতে উঠুন পোষ্যদের সঙ্গে। আদরের পোষ্যদের সান্নিধ্যে উৎসবযাপনের পরামর্শ রইল এবারের পাতায়।
১০৫ রিভিউ
১০৬ অ্যাপ
১০৬ ইভেন্ট ২
১০৭ মেক-আপ

প্রচ্ছদ: স্বস্তিকা দত্ত
মেক-আপ: ভাস্কর বিশ্বাস
হেয়ার: কুশল মল্লিক
পোশাক: অপরাজিতা
লোকেশন: মাটি বাড়ি
ছবি: দেবর্ষি সরকার

সম্পাদক: পায়েল সেনগুপ্ত

এবিপি প্রা: লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রা: লিমিটেড, সিপি-৪, সেক্টর V, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৯১ থেকে মুদ্রিত।

RNI NO. 44046/86

30th September 2022, 37 years 4 Issue.



বোধন ২০২২

‘সানন্দা’-র বোধন সংখ্যাটির জন্য আমরা সারাবছর অপেক্ষা করে থাকি। বোধন হাতে আসা মানেই মনে হয় বেজে গেছে পুজোর বাদ্যি। এর মাধ্যমে আমরা যেমন পুজোর আগে নিত্যনতুন ফ্যাশন ট্রেন্ড ও স্কিন কেয়ার সম্বন্ধে বিশদে জানতে পারি, তেমনই পুজোয় নানা অজানা রেসিপির সন্ধান পাই। যেমন এবারে পেলাম বার্মিজ় কুইজ়িন, নানা রকম ভর্তা, বাংলার ঐতিহ্যবাহী মিষ্টির হদিশ। ভাল লেগেছে ভ্রমণ কাহিনিগুলিও। আটলান্টিক সাগরের তিমির রোমাঞ্চকর কাহিনি এক অন্য জগতে নিয়ে যায় যেন। এছাড়া সিনেমা নিয়ে লেখাটিও ভাল লেগেছে। এছাড়া ফ্যাশন এবং রূপচর্চার নানা খুঁটিনাটির কথা জেনেও ভাল লাগল। বিশেষ রচনাগুলিও প্রতিবারের মতোই বেশ মনোগ্রাহী। জন্মদিনের ১৫০ বছরে অতুলপ্রসাদ সেনের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্যের লেখাটি খুবই ভাল লেগেছে। সব মিলিয়ে এবারেও জমজমাট সানন্দার বোধন সংখ্যা।

সংহিতা দত্ত রায়, শ্যামবাজার
ই-মেল মারফত

এবারের রচনাগুলি

‘সানন্দা’ পত্রিকা'র এবারের বোধন সংখ্যায় তথ্যবহুল রচনাগুলি আমাকে সত্যিই মুগ্ধ করেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে দেব আরাধনার নানা অজানা ইতিহাস থেকে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। আমাদের দুর্গাপুজো বিশ্বের দরবারে সম্মান পেয়েছে। এই যাত্রাপথ তো একদিনে তৈরি হওয়া নয়। তার পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বিবরণ এক কথায় অনবদ্য। বিপ্লবী অগ্নিকন্যাদের রচনাটিও চমৎকার। বাংলাদেশের পাঁচজন কলাকুশলীর সাক্ষাৎকার আলাদা মাত্রা যোগ করেছে এই সংখ্যায়।

বৃন্দা সেন, রিষড়া
ই-মেল মারফৎ

সৌন্দর্যের ইতিবৃত্তান্ত

‘সানন্দা’-র এবারের বোধন সংখ্যায় সৌন্দর্য সংক্রান্ত যে চারটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে যেমন আছে সৌন্দর্যের ইতিহাস, তেমনই আছে তার মডার্ন রূপও। ঠোঁটের নানা সাজগুলি অবাক করে। হেয়ার স্ক্রাবের নানা খুঁটিনাটি খুবই উপকারী। রূপচর্চা তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাসটি প্রশংসনীয়।

লীনা রায়, শ্রীরামপুর
ই-মেল মারফৎ

গল্প-উপন্যাস-ভ্রমণ

সানন্দা-য় গল্প এবং উপন্যাস মনোনয়নের জন্য পাঠাতে চাইলে হাতে লিখে কিংবা প্রিন্টআউট করে আমাদের দফতরে পাঠাতে হবে। ইমেলে পাঠানো গল্প সানন্দা-র প্রিন্ট সংস্করণের জন্য গ্রাহ্য করা হবে না। অবশ্যই নিজের নাম, ঠিকানা এবং ফোন নম্বর যেন লেখা থাকে। গল্প বা উপন্যাস মনোনীত হলে আমরা ওয়ার্ড ফাইলটি চেয়ে নেব। গল্পের শব্দসংখ্যা ২৫০০ থেকে ৩০০০।

ঠিকানা:
সানন্দা গল্প বিভাগ,
এবিপি প্রাইভেট লিমিটেড,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০০১

যাঁরা সানন্দা-র ওয়েবসাইটের জন্য গল্প পাঠাবেন, তাঁরা ১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প মেল করবেন, হার্ড কপি পাঠাবেন না। মেল-এর সাবজেক্টে অবশ্যই লিখবেন ‘সানন্দা ওয়েব গল্প’। ভ্রমণকাহিনির ক্ষেত্রে ইউনিকোডে টাইপ করে আমাদের ইমেল করতে হবে। ছবি ভাল রেজ়লিউশনের হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে হাতে লিখে পাঠানো ভ্রমণকাহিনি গ্রাহ্য হবে না। প্রিন্টেড ছবি পাঠাবেন না। ডিজিটাল ছবি পাঠাতে হবে। অন্য বিভাগে লেখা পাঠাতে হলে মেল-এ সাবজেক্ট অবশ্যই উল্লেখ করে দেবেন।

মেল আইডি:
sananda@abp.in

সু দো কু

১৪৯

৫		৩	৬					
	২			৭				৮
	৮		৯	৫	২			৩
	৫	৯	১		৪			
		৮	২			১		
					৫	৪	২	
৭			২	৪	১		৮	
৮				৩			৭	
					৭	২		১

উপরের ছকগুলিতে মোট ৯টি ঘর রয়েছে। প্রতিটি ঘরে ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কয়েকটি সংখ্যা বসানো আছে। ফাঁকা ঘরগুলিতে হিসেব করে বাকি সংখ্যাগুলো বসাতে হবে। এমনভাবে বসাতে হবে, যাতে উপরে-নীচে বা পাশাপাশি লাইনে ১ থেকে ৯-এর মধ্যে কোনও সংখ্যা দু’বার না বসে।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

৩০ অগস্ট সংখ্যার সমাধান

৭	৬	২	৯	৮	১	৪	৫	৩
৯	১	৮	৪	৩	৫	২	৭	৬
৩	৪	৫	৬	২	৭	৮	১	৯
৮	২	৩	১	৪	৯	৭	৬	৫
৪	৫	১	৭	৬	২	৯	৩	৮
৬	৭	৯	৮	৫	৩	১	৪	২
২	৯	৪	৩	১	৬	৫	৮	৭
১	৩	৭	৫	৯	৮	৬	২	৪
৫	৮	৬	২	৭	৪	৩	৯	১



নেপথ্যে যাঁরা

নেপথ্যের দশভুজারা...

মাটির তৈরি প্রতিমা নন, কিন্তু আপামরের পুজো আনন্দে-খুশিতে ভরাতে নিরন্তর পরিশ্রম করে চলেন এঁরা, পুজোর ক'দিনও! বিভিন্ন পেশার তেমনই কয়েকজনের পুজো-কড়চা জানার চেষ্টায় 'সানন্দা'।



মানুষ আছেন অনেকেই। এমন বেশ কিছু পেশার মানুষ আছেন, যাঁদের কাছে পুজো মানেই ছুটি নয়, অবসর নয়। সাংবাদিক, ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, মিউনিসিপ্যালিটির কর্মী, বিদ্যুৎকর্মী, সমাজসেবী, ট্র্যাফিক পুলিশ, পুলিশ, ড্রাইভার... এমন কত কে-ই তো আছেন যাঁরা নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে পাশে দাঁড়ান মানুষের। কেউ কেউ একটু বেশি লক্ষ্মীলাভের আশায়, আরও একটু সচ্ছল পরিবারের আশায় এই দিনগুলোতেও ছুটি নেন না। মা দুর্গা যেমন নিজের কর্মে ব্রতী, এঁরাও তেমনই উৎসবের রোশনাইয়ের মাঝে নিজেরা কর্মব্রতী। তবে কলকাতার পুজোর কথা উঠলে প্রথমেই মনে আসে ট্রাফিকের কথা, যা বাদ দিয়ে পুজোর শহর ভাবা সম্ভবই নয়। অনেকেই বলেন, পুজোর সময় ট্রাফিকের অবস্থা যেমন থাকে, তেমন নাকি সারাবছর থাকে না। পুজোয় মানুষের ঢল ও যানবাহন ব্যবস্থা, সামলানো কতখানি চ্যালেঞ্জের বিষয়, জানা গেল অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ কলকাতা পুলিশ অলোক সান্যালের কাছ থেকে, কত মহিলা পুলিশ এবং ট্রাফিক পুলিশের নিরন্তর পরিশ্রমের ফল একটা নিরাপদ পুজো, সেকথাও জানালেন তিনি। ‘‘সারা বছরের মধ্যে পুজোটা সুষ্ঠুভাবে সামলানো আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আর চাকরির উন্নতির দিক থেকে দেখতে গেলেও কত ভাল করে আমরা পুজো


ডা. সুমিতা সাহা

এমন বেশ কিছু পেশার মানুষ আছেন, যাঁদের কাছে পুজো মানেই ছুটি নয়। সাংবাদিক, ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, মিউনিসিপ্যালিটির কর্মী, বিদ্যুৎকর্মী, সমাজসেবী, ট্র্যাফিক পুলিশ, পুলিশ, ড্রাইভার... যাঁরা নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে পাশে দাঁড়ান মানুষের। মা দুর্গা যেমন নিজের কর্মে ব্রতী, এঁরাও তেমনই উৎসবের রোশনাইয়ের মাঝে নিজেরা কর্মব্রতী।

সাধারণ বাঙালিরা মুখিয়ে থাকেন পুজোর চারটে দিনের জন্য। এই ক’দিনের জন্য কতদিন আগে থেকে কতরকমের পরিকল্পনা মনে মনে... কেউ হয়তো বিদেশে চাকরি করেন। তিনি মুখিয়ে থাকেন এই ক’টা দিন ঘরে ফেরার জন্য। বন্ধু-পরিজনদের সঙ্গে ক’টা দিনের নির্ভেজাল অবসরের জন্য। আবার কেউ কেউ কর্মক্লান্ত সারাবছরের পর এই কয়েকদিনের জন্য নানা ইচ্ছে মনে জমিয়ে রাখেন। অবসরই হোক বা আড্ডা, ঠাকুর দেখা হোক বা প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে বেড়ানো...সিংহভাগের পুজো রুটিন এমনটা হলেও ব্যতিক্রমী


অলোক সান্যাল





পর্ণা চক্রবর্তী

সাধারণ মানুষ যাতে ঠিকমতো স্বাস্থ্য-পরিষেবা পান, তা নিশ্চিত করতে পুজোর দিনগুলোতেও নিরলস পরিশ্রম করেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। রোগীর পরিজনদের পাশে থেকে, ভাগ করে নেন তাঁদের যাবতীয় দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগ।

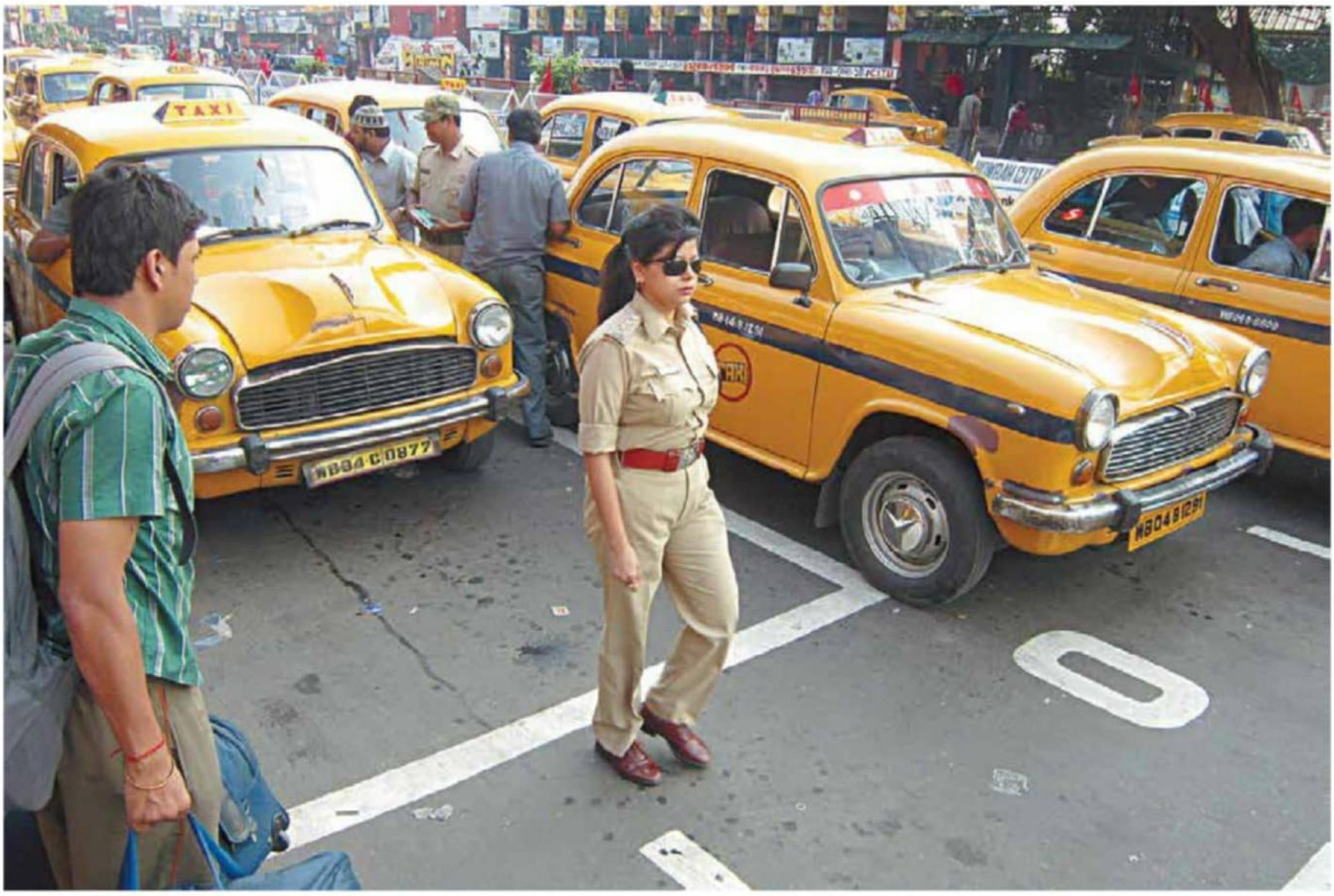


সামলালাম, সেটাও ম্যাটার করে। পুজোয় বহু মানুষ রাস্তায় বের হন, তার উপর বাইরে থেকে কলকাতায় পুজো আসেন, প্রায় দু-তিনলাখ লোক রাস্তায় থাকেন। সকলের নিরাপত্তা বজায় রেখে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করে, যান চলাচল বিঘ্নিত না করে কাজ করে যাওয়া নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। তবে এটা শুধুই আমাদের কাছে একটা পারফরম্যান্স নয়, মানুষের হাসিমুখ দেখতে পাওয়াও নিরন্তর উৎসাহ জোগায়। পুজোর ভিড়ে ঠিকমতো রাস্তায় হেঁটে কোনও পথচলতি বাচ্চা যখন আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ে, থাম্বস আপ দেয় বা স্যালুট করে, মানুষ আমাদের ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানায়, তখন অসম্ভব ভাল লাগে। এই অনুভূতিই আমাদের কাজ করে যাওয়ার উৎসাহ জোগায়।'' তবুও সকলের ছুটি অথচ অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি নিরন্তর পরিশ্রম করে যাওয়া, কোথাও কি মনখারাপের জন্ম দেয় না?



রেবা কয়াল মণ্ডল

''প্রথমদিকে তাও মনে হত, বিশেষ করে পরিবারের লোকেদের সঙ্গে একটু ঘোরাফেরার কথা। কিন্তু সত্যি বলতে কী, এই কাজটা মাথার মধ্যে একবার ঢুকে গেলে পুজোর ছুটির কথা মাথাতেও আসে না। তা ছাড়া আগে একটু চতুর্থী বা পঞ্চমীর দিন সুযোগ পাওয়া যেত, একটু বেরিয়ে ঘোরার। এখন পুজো অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে যায়। তা ছাড়া পুজো মানে তো শুধু আর চারদিন নয়, একেবারে কার্নিভাল পর্যন্ত প্রবল ব্যস্ততা। এখন বাড়ির লোকেরাও, বিশেষ করে পুলিশ কর্মীদের বাড়িতে সকলেই এখন এটা জেনেই অভ্যস্ত যে আমাদের পাওয়া যাবে না। ফলে ছেলেমেয়েরা নিজেদের মতো প্ল্যান করে নেয়, পুলিশ আবাসনের পুজোতেও তারা ব্যস্ত থাকে, বা চলে যায় পাড়ার পুজোতে। তা ছাড়া পুজো মানে শুধু ট্রাফিক পুলিশের কাজ নয়। এটা পুরো পুলিশ ইউনিটের সমবেত প্রয়াস। কলকাতা শহরে প্রায় সাড়ে তিনহাজারের কাছাকাছি পুজো আছে। বারোয়ারি পুজো খুব না বাড়লেও বেড়েছে আবাসনের





প্রিয়ঙ্কা রায়, সাব-ইন্সপেক্টর



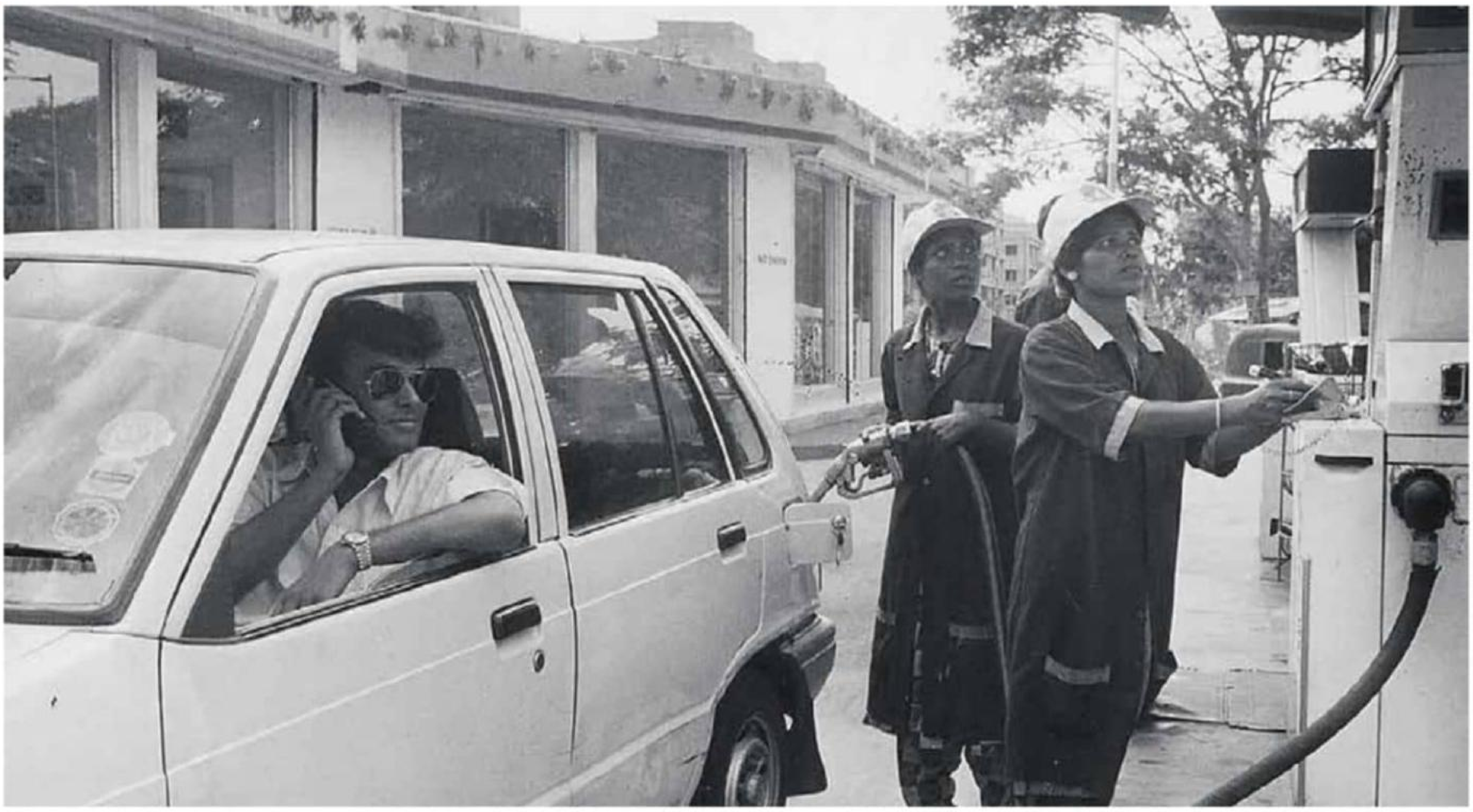
তানেয়া রায়, অনলাইন শপিং প্ল্যাটফর্ম কর্মী

পুজোর ভিড়ে অনেক সময়ই চুরি বা ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা ঘটার আশঙ্কা থাকে। প্যান্ডেলের ভিড় সামলানোও বিরাট কাজ। ফলে দম ফেলার অবকাশ পান না পুলিশকর্মীরা।

পুজোর সংখ্যা। এত মানুষ, এত পুজো, এত গাড়ি সামলাতে গেলে প্রতিটি থানার সাহায্য নিতে হয়। ট্রাফিক স্মুদ করার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে নতুন রুট বের করা একটা বিরাট ব্যাপার। তা ছাড়া ২৪ ঘণ্টা মানুষ রাস্তায় থাকেন, নিরাপত্তার ব্যাপারটা তো আছেই। সব মিলিয়ে পুজো আমাদের পুলিশকর্মীদের একত্রিত প্রচেষ্টা। এই পরিশ্রমসাধ্য কাজ সফলভাবে করতে পারাটাই আমাদের উদ্দেশ্য। মানুষ আমাদের চেষ্টাকে সফল মনে করলে সেটা আমাদের জন্য খুবই তৃপ্তির অনুভূতি নিয়ে আসে।'' এ তো গেল পুলিশ প্রসঙ্গ, নিরাপত্তার ২৪ ঘণ্টার কথা। এঁদের কাজ আমরা দেখতেও পাই। কিন্তু এই বিরাট কর্মকাণ্ডে যাঁরা সত্যিই দশভুজার মতো আড়ালে থেকে নিশ্চিত করেন আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সেসব দশভুজদের গল্প কীরকম? ডাক্তারদের কথা দিয়েই শুরু করা যাক। এমনিতেই সারাবছর তাঁদের ব্যস্ততার শেষ নেই। কোভিড-কালে তো আরওই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে নিরন্তর কাজ করেছিলেন তাঁরা। পুজোতেও ছুটি পান না অনেকেই। যেমন কনসালট্যান্ট নিওনেটোলজিস্ট ডা. সুমিতা সাহা। ''সপ্তমী থেকে দশমী আমাদের হাসপাতালে ওটি বন্ধ থাকে। কিন্তু আউটডোর পেশেন্ট তো থাকেনই। তাঁদের চিকিৎসা করতেই হয়। আমি যেহেতু আইসিইউ-য়ের দায়িত্বে তাই পুজোর মধ্যেও এমন অনেক পেশেন্টদের পাই, যাঁরা খুব খারাপ অবস্থায় ভর্তি হন। হয়তো সারাদিন তাঁদের চিকিৎসাতেই কেটেছে পুজো, এমন অভিজ্ঞতা একাধিকবার হয়েছে। কলকাতায় প্রায় ১০ বছর কাজ করছি, এর মধ্যে অনেকবারই প্রায় পুরো পুজো হাসপাতালে কাটিয়েছি এমনও হয়েছে! হয়তো একটা দিন বেরোতে পেরেছি। আবার ওপিডি বন্ধ থাকলে সকালে রাউন্ডের পরে একটু বেরিয়ে অঞ্জলি দিয়ে এসেছি। সত্যি বলতে, চারদিন ধরে পুজো উপভোগ করছি এটা কখনও আশাই করি না। পরিবারের তরফ থেকে প্রচুর সাপোর্ট পাই। পুজোর চারদিনের মধ্যে অন্তত দু'টো বিকেল হয়তো নিজের জন্য, পরিবারের জন্য সময় পাই। এবারেও প্ল্যান আছে, ওইটুকু সময় পেলে বাচ্চাদের নিয়ে, পরিবার নিয়ে বেরব।'' অনেকটা ডাক্তারদের সুরই শোনা যায় নার্সদের গলাতেও। পেশায় নার্স পর্ণা চক্রবর্তী বললেন, ''তিরিশ বছরের বেশি হয়ে গেল এই পেশায়। পুজোয় কাজ করাও আমার জীবনের অঙ্গই হয়ে গিয়েছে। এই পুজোতেও



পূজা কুণ্ডু, পেট্রল পাম্প কর্মী





পুজোয় বহু মানুষ রাস্তায় বের হন। নিরাপত্তা বজায় রেখে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করে, যান চলাচল বিঘ্নিত না করে কাজ করা নিঃসন্দেহে কঠিন। এই কাজটাই করে দেখান ট্র্যাফিক পুলিশেরা।

প্রায় প্রতিদিনই ডিউটি থাকবে। সত্যি বলতে কী, আমার ভাল লাগে। আমি রয়েছি মেডিক্যাল কলেজে। রোগীরা যেমন হাসপাতালে ভর্তি হন, তাঁদের সঙ্গে তাঁদের পরিজনেরাও তো আসেন, থাকেন, রাত জাগেন। পুজোর সময় এ রকম হলে তাঁরা কেউই তো আনন্দ করতে পারেন না। রোগীদের কষ্ট বলুন বা তাঁদের নিজের লোকেদের উদ্বেগ, সবটাই যে তাঁদের পাশে থেকে, ভাগ করে নিতে পারি— এটুকুই আমার আনন্দ। ছুটি না পাওয়ার কোনও ক্ষোভই জন্ম নেয় না মনে। কত ঘটনা রয়েছে এরকম, যখন পুজো দেখার আনন্দকে হাজারগুণে ছাপিয়ে গিয়েছে মানুষের রোগ-ভোগে তাঁদের পাশে থাকতে পারার আনন্দ! প্রসূতি বিভাগে দীর্ঘদিন কাজ করেছি আমি। অন্য জায়গায় অস্ত্রোপচার করাতে গিয়ে, তারপর পেট-কাটা অবস্থায় হবু মা আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছেন, তাঁদের পরিষেবা দিয়ে সুস্থ করে তুলতে পেরেছি, এমনও বহু ঘটনা রয়েছে। এক্ষেত্রে আমার স্বামী, শাশুড়ি, ননদ সম্পূর্ণভাবে পাশে থেকেছেন। আমার ছেলে যখন ছোট ছিল, পুজোর সময় সে যাতে মায়ের অভাব বোধ না করে, সেদিকে খেয়াল রেখেছেন সকলে। সবচেয়ে বড় কথা, আমি আমার কাজকে খুব ভালবাসি। আমার মনে হয়, ঠাকুরের বিরাজ তো সর্বত্র! আমরা যে মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিই, এটাও কি একরকমের পুজো নয়?''

সাব-ইন্সপেক্টর প্রিয়াঙ্কা রায়ের কথাতেও প্রায় একইরকম ব্যস্ততার ছবি ফুটে উঠল। "গত তিন বছর ধরে এই পেশায় রয়েছি। এমনি সময় ডিউটি আওয়ার্স নির্দিষ্ট করা থাকলেও, সব সময় যে তার মধ্যেই কাজ শেষ হয়, তা নয়। হয়তো দশটায় কাজ শেষ কোনওদিন, কিন্তু সাড়ে ৯টা নাগাদ কোনও ঝামেলা হল কোথাও, তখন সেটা শেষ না হওয়া অবধি কাজ করে যেতে হয়। আর পুজোর ক'দিন তো সপ্তাহে সাতদিন ২৪ ঘণ্টাই কাজ করতে হয়। কারণ ওই ক'দিন অনেকগুলো বাড়তি কাজ থাকে। প্যান্ডেলের ভিড় সামলানো, ট্র্যাফিক ডিউটি, অ্যাক্সিডেন্ট, মারামারি বা চুরি-ছিনতাইয়ের মতো সমস্যা সামলানো... সবই করতে হয় ঘুরিয়েফিরিয়ে। এমনি সময় যদি কোনওদিন নাইট ডিউটি পড়ে, সেক্ষেত্রে পরদিন সকালে ডিউটি শেষ হলে পুরো দিনটা ছুটি পাই।''



—তনুশ্রী রায়, সমাজকর্মী





তন্দ্রা কুণ্ডু, স্ট্রিট ভেন্ডার

কিন্তু পুজো দেখতে বেরনো অগণিত মানুষের মুখে হাসি ফোটান রোল-চাউমিন-ফুচকা-আইসক্রিমের পসরা সাজানো দোকানিরা। এই দিনগুলোতেই যে তাঁদের ব্যবসার বহর থাকে তুঙ্গে।

পুজোয় সেটাও হয় না। বলা ভাল, ওই ক'দিন বিশ্রাম বা ছুটি নেওয়ার ” মোটামুটি পঞ্চমী থেকে পুজোর ডিউটি শুরু হয় তাঁর। গত বছর দশমী অবধি প্রত্যেকদিন বিকেল থেকে সারারাত টানা পুজোর ডিউটি করতে হয়েছিল। এছাড়া সিভিল ডিউটি তো ছিলই। এবছরও মোটামুটি একই শেডিউল তাঁর। ফলে পরিবারকে সময় দেওয়া, ঠাকুর দেখা, এককথায় পুজো উপভোগ করার কোনও অবকাশই পান না প্রিয়ঙ্কা। যদিও বললেন, কিছু কিছু থানায় রোটেশনাল শিফ্টের ব্যবস্থা থাকে। তবে সেটা হাতে গোনা। পরিবারের লোকেরাও এখন তাঁর এই ব্যস্ত শেডিউলে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন। আর তাই মনখারাপও এখন আর ছুঁতে পারে না সেভাবে। “সকলকে যখন দেখি পরিবার, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ঠাকুর দেখছেন, খাওয়াদাওয়া করছেন, নিজের পরিবার-বন্ধুদের অবশ্যই মিস করি। তবে কোথাও একটা ভাললাগাও কাজ করে। আমাদের উপস্থিতি থাকে বলেই তো সকলে নিশ্চিন্তে ঘোরাফেরা করতে পারেন সকাল থেকে রাত। বা কেউ কোনও সমস্যায় পড়লে আমাদের কাছে সাহায্য চান যখন, তখনও তাঁদের উপকার করতে পারলে ভাল লাগে।” তবে বাড়িতে এই ক'দিন যদি কোনও বাড়তি সমস্যা তৈরি হয়, সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনেকটাই জটিল হয়ে ওঠে, বললেন প্রিয়ঙ্কা। “এমনিতে হয়তো ইমার্জেন্সিতে ছুটি নিতে পারি। কিন্তু পুজোর সময় এতটাই চাপ বেড়ে যায় যে, নিজের পরিবারের কথা ভাবার অবকাশও থাকে না। বাড়িতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লেও অনেকসময় যাওয়ার পরিস্থিতি থাকে না। কিন্তু চাকরির ধরনটা এমন জেনেই তো জয়েন করেছি। সুতরাং, মানিয়ে নিতেই হয়।” ভিড়-যানজট সামলে নানা মানুষকে গন্তব্যে পৌঁছে দেন অ্যাপ ক্যাব চালক রেবা কয়াল মণ্ডল। বললেন, ‘‘চার বছর ধরে গাড়ি চালাচ্ছি, পুজোর সময়ও চালাই। কিছুটা মানসিক প্রস্তুতি এ ব্যাপারে ছিলই, বাকিটা কাজ করতে করতে হয়ে গিয়েছে। পুজোর সময় মানুষের পথচলা যদি একটু সহজ করে দিতে পারি, তারপর তাঁরা যে ‘থ্যাঙ্কস' বলেন, মন ভরে যায় সত্যি। তবে আমরাও তো মানুষ, আমাদেরও পরিবার রয়েছে। পুজোয় পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর ইচ্ছে তো হয়ই। তখন একটু দিনটাকে



ছকে নিই। সকালে হয়তো সংসারের জরুরি কাজগুলো সেরে গাড়ি নিয়ে বেরলাম। রাতে বাড়ি ফিরে সকলে মিলে ঠাকুর দেখতে গেলাম! কত সময় হয়তো গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছি, তখন মানুষ আমাকে দেখে আলাপ করতে এসেছেন। আশীর্বাদ করেছেন, শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এই মানুষগুলোর ভালবাসা আমার ক্লান্তি কাটিয়ে দেয়। এর জন্য পুজোর আনন্দের সঙ্গে এইটুকু আপস তো করাই যায়!''

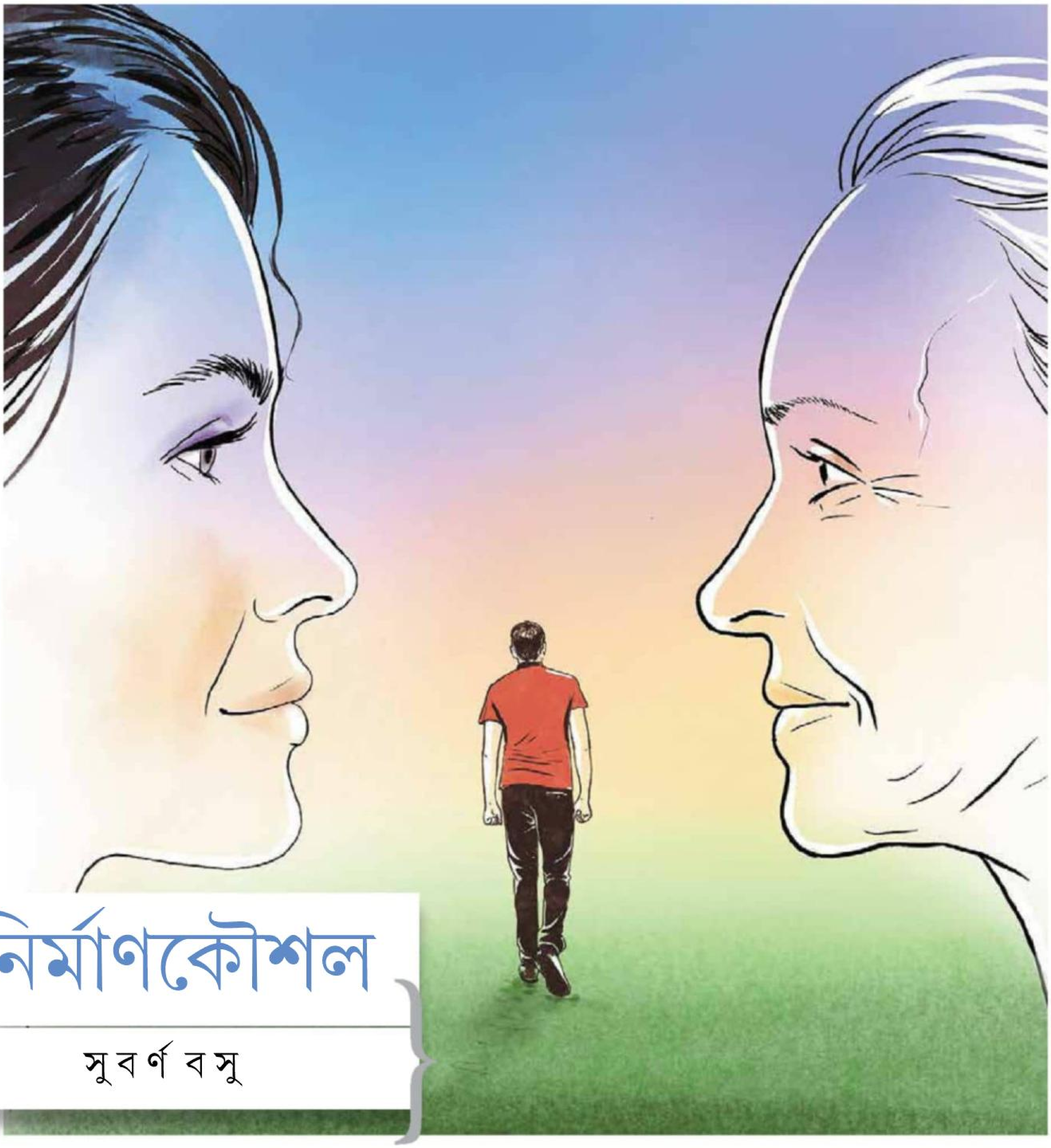
রোজকার ছাপোষা দিন হোক কিংবা পুজোর মরশুম, পেট্রোল পাম্পের ব্যস্ততা সবসময়ই তুঙ্গে। এইরকমই একটি পেট্রোল পাম্পের পলিউশন ডিপার্টমেন্টে কর্মরত পূজা কুণ্ডু। পুজোয় আবশ্যিক শর্তেই ছুটি নেই তাঁর। সেসময়ও ডিউটি ৯টা থেকে ৮টার বাঁধা নিয়মেই। কোনও কোনও দিন সময় গড়ায় সাড়ে আটটা বা ন'টাতেও। এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে পূজা জানান, "পুজোয় পরিবারকে সময় দিতে পারি না, সে নিয়ে খারাপ লাগা তো আছেই। চাইলে ছুটি নেওয়া যায়। কিন্তু আর্থিক অবস্থা তো তেমন ভাল নয়। ছুটি নিলেই তো মাইনে থেকে কাটা যাবে।" মূলত পলিউশন ডিপার্টমেন্টে সংক্রান্ত কাজ থাকলেও, পুজোয় ভিড়ের সময় তেল ভরার কাজেও হাত দেন পূজা। তাঁর সাফ কথা, "কাজ জানি যখন, সাহায্য করতে তো ক্ষতি নেই। কাজের মাঝে ফাঁক পেলেই গান শুনি। ওটাই রিফ্রেশমেন্ট। তারপর আবার কাজে লেগে পড়ি।" এভাবেই ছোট ছোট খুশির বিনিময়ে পূজাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কাহিনি উৎসবের আলোর আড়ালে হারিয়ে যায়। এ তো গেল পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর যুদ্ধের গল্প। সমাজের আরও পাঁচজনের পাশে দাঁড়ান যাঁরা, সেই সমাজকর্মীদের পুজো কেমন কাটে? রক্তের প্রয়োজনে পাশে দাঁড়ানো এরকমই এক সংস্থা 'ব্লাডমেটস'-এর স্বেচ্ছাকর্মী তনুশ্রী দত্ত জানালেন প্যান্ডেলে দাঁড়িয়ে ডোনার খোঁজার গল্প, "আমি এখানে এসেছিলাম মূলত কোভিডকালে। মূলত ক্যাম্প করা ও ডোনার জোগাড় করে দেওয়া, রক্তের প্রয়োজনে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। ডোনার কো-অর্ডিনেশন ব্লাডমেটসের মূল স্তম্ভ। যেহেতু এমার্জেন্সি ব্লাড রিকুইজ়িশনের ভিত্তিতে এই টিম ডোনার জোগাড় করে তাই পুজোয় চাপ কমলেও একেবারে ছুটি তো হয় না। যদিও এর জন্য আগে থেকেই প্ল্যান করে রাখা হয়। এমন হয়েছে যে পুজোয় প্যান্ডেল হপিং-এ বেড়িয়েছি, হঠাৎ তার মাঝেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডোনার ডেটা দিতে হয়েছে আমাদের অন্য টিমকে, রক্তের জন্য অজস্র ফোন করতে হয়েছে। কিন্তু খুবই অরগানাইজ়ডভাবে এখানে কাজ করি। আর আমরা তো সবটা জেনেই কাজটা করতে নেমেছি। পুজোর সময় সোশ্যাল মিডিয়া কম স্ক্রোল করে মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারলে আমার মানসিক শান্তি হয়।" আর পরিবারের সাপোর্ট? এ প্রসঙ্গে হেসে তাঁর বক্তব্য, "কাজের জন্য সবসময় ব্যস্ত থাকলে একটু ভুল বোঝাবুঝি বা অভিমান তো হতেই পারে, তবে তারা পাশে না থাকলে যে শুরুটাই হত না, এ কথাটাও তো সত্যি।"

পুজোর দিনে যাতে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে অসুবিধে না হয়, সে জন্য অতিরিক্ত সময় অবধি চালু থাকে মেট্রো পরিষেবা। ভারতের একমাত্র মহিলা চালিত মেট্রো স্টেশন, কলকাতার নেতাজি ভবন। এই স্টেশনেরই এক উচ্চপদস্থ মেট্রোকর্মী জানান, ''দক্ষিণের পুজো শুরু হয় ভবানীপুরের এই অঞ্চল থেকেই। কালীঘাট বা রবীন্দ্র সরোবরের মতো ভিড় না হলেও পুজোয় রাত এগারোটা-বারোটা অবধি লোক সমাগম থাকে। ভিড়ে কেউ আহত হলে বা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তাকে প্রাথমিক সেবা-শুশ্রূষা করা, তৈরি থাকতে হয় সব সময়ই। যদিও অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে দক্ষিণের অনেক স্টেশনেই স্পেশ্যাল মেডিক্যাল টিম থাকে।'' পরিবার প্রসঙ্গেও তিনি অকপট, ''ব্যক্তিগতভাবে আমার ফ্যামিলি খুবই সাপোর্টিভ। প্রত্যেকেরই হয়তো তাই। নচেৎ এই পেশায় যুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এখানে সহকর্মীদের সঙ্গে থাকি, এটা তো আমার সেকেন্ড ফ্যামিলি। মিলেমিশে থাকি। দেখতে দেখতে সময় কেটে যায়।''



উৎসবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে কেনাকাটার প্রসঙ্গ। আপাতদৃষ্টিতে হয়তো 'অত্যাবশ্যক পরিষেবা'-র অন্তর্গত নয়, কিন্তু কেনাকাটা, নতুন জামা, উপহার ছাড়া পুজোর কথা কি আদৌ ভাবা সম্ভব? গত কয়েক বছর ধরে দোকান-বাজারের লিস্টে বেশ অনেকটা জায়গা দখল করে নিয়েছে অনলাইন শপিং। দোকানে গিয়ে কেনাকাটা করার ফুরসৎ নেই যাঁদের, প্রত্যেকেই নির্ভর করেন অনলাইন শপিংয়ের উপর। আর সেই কারণে বিভিন্ন শপিং সাইটের কর্মীদের কর্মব্যস্ততাও বহুগুণ বেড়ে যায় এই সময়। এই প্রসঙ্গে একটি নামী অনলাইন শপিং প্ল্যাটফর্মে চাকরিরতা তানেয়া রায় জানালেন, "আমি অপারেশনস-এ রয়েছি। প্রডাক্ট ডেলিভারি যাতে নির্ধারিত সময়ে সম্ভব হয়, সেটা অনেকটাই আমাদের দেখতে হয়। এমনি সময়ে সোম থেকে শুক্র কাজ করি, অনলাইনও কাজ করা সুযোগ থাকে। কিন্তু পুজোর সময় ফিল্ডে যেতেই হয়। যেহেতু ওই সময় শপিং করার প্রবণতা অনেকটাই বেড়ে যায় এবং বিভিন্ন ধরনের সেল, অফারও পুজোর আগে-আগে দেওয়া হয়, তাই অসম্ভব রাশ থাকে। এমনও হয়েছে যে, সকাল সাতটায় কাজ করা শুরু করেছি, কাজ শেষ করেছি রাত দুটোয়! বাইচান্স এর মধ্যে কোনওদিন ওয়র্ক-ফ্রম-হোমের সুযোগ পেয়ে গেলে, সেটাই মোর দ্যান এনাফ।" পুজো উপভোগ করার কথা প্রসঙ্গে তানেয়ার বক্তব্য, "কাজের চাপ থাকে ঠিকই, তবে চেষ্টা করি, ওর মধ্যেই কোনওভাবে পুজোর ফিল নিতে। এমনও হয়েছে, রাত দুটোয় কাজ শেষ করে ঘণ্টাখানেকের জন্য ঠাকুর দেখে পরদিন আবার ভোরবেলায় ডিউটি জয়েন করেছি। অথবা লাঞ্চে রেস্তরাঁয় খেতে গিয়েছি ল্যাপটপ সঙ্গে নিয়ে। বা অষ্টমীর সকালে যেখানে অডিট করতে গিয়েছি, সেখানেই কাছের প্যান্ডেলে অঞ্জলি দিয়েছি। ওই কারণে নতুন জামা পরেই কাজে বেরই..." হেসে উত্তর দিলেন তানেয়া। প্রায় কালীপুজো অবধিই এরকমই শেডিউল চলে তাঁর। যদিও এরপর দু'দিন পুরোপুরি ছুটি পান। "ক্রেতাদের কোনওরকম অসুবিধা যাতে না হয়, সেই ব্যবস্থা নিয়েই আমাদের কমপ্লিট অফ দেওয়া হয় দু'দিন।" প্রথমদিকে মনখারাপ হলেও এত বছরের কর্মজীবনে এখন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছেন তানেয়া। "খারাপ তো লাগেই থেকে থেকে, তবে যখন ক্রেতারা ভাল ফিডব্যাক দেন, বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় কোম্পানিকে ট্যাগ করে কমপ্লিমেন্ট দেন, ধন্যবাদ জানান, তখন মনখারাপ অনেকটাই কমে যায়। মনে হয়, নিজে স্বাধীনভাবে পুজো উপভোগ করতে না পারলেও, অনেকের পুজোকে তো স্পেশ্যাল করে তুলতে পারছি!" ইমার্জেন্সি সার্ভিস নয় ঠিকই, কিন্তু পুজো দেখতে বেরনো অগণিত মানুষের মুখে হাসি ফোটান রাস্তার ধারের সারি সারি রোল-চাউমিন-ফুচকা-আইসক্রিমের পসরা সাজানো দোকানিরা। পুজোর দিনে এঁদের ছুটি নিতে কেউ বাধা দেবে না ঠিকই। কিন্তু এই দিনগুলোতেই যে ব্যবসার বহর থাকে তুঙ্গে। দমদমের এমনই একজন স্ট্রিট ফুড ভেন্ডর তন্দ্রা কুণ্ডু জানালেন তাঁর মতো করে কাটানো পুজোর গল্প, "আমার এই দোকানটা পাঁচ বছর হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ পাঁচ বছর দোকানে কাজ করতে করতে পুজো দেখেছি। বিক্রির হিসেবে অন্য মাসের তুলনায় পুজোর মাস খুবই আনন্দের। এই যে এত মানুষ আমাদের দোকানে খেয়ে তৃপ্তি পান, সেটাই তো আমাদের পুজোয় পরম পাওনা। পুজোয় রাত বারোটায় বাড়ি ফিরি। নতুন জামা-কাপড় পরা, হোল নাইট পুজোয় ঘোরা কোনওটাই হয়ে ওঠে না। পুজোর দিনগুলোয় ভাল বিক্রি আর কাস্টমারদের মুখে খাবারের সুখ্যাতি-ই প্রাপ্তি।'' কেমন ছিল মহামারির পুজো? আর নিউ নরমাল পুজো নিয়ে প্রত্যাশাই বা কেমন? এর উত্তরে বলেন, "লকডাউনের আগে ব্যবসা খুবই ভাল ছিল। লকডাউনে ব্যবসা একেবারে শেষ হয়ে গেল। এখন সব কিছু স্বাভাবিক হচ্ছে, প্রাক-পুজো বাজারও ভাল হয়েছে। এবারের পুজো নিয়ে সাধারণ মানুষের মতো আমাদেরও অনেক আশা।" ''পুজো যেন রোগবিহীন হয়, পরেরবার থেকে বাকি সকলের মতো আমরাও যেন পুজো উপভোগ করতে পারি,'' বললেন কলকাতা কর্পোরেশনের ভেক্টর ইউনিটের স্বাস্থ্যকর্মী। ২০১২-১৩ থেকে ডেঙ্গির প্রকোপের জন্য পুজোতেও ডেঙ্গি প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে তাঁদের। ''মানুষকে সতর্ক করতে পথে নামতে হচ্ছে। পরিবার পরিজনের একটা প্রত্যাশা তো থাকেই পুজোয় তাদের সময় দেওয়ার। কিন্তু যেখানে মানুষের স্বাস্থ্য-সুরক্ষার প্রশ্ন, সেখানে কম্প্রোমাইজ় করা যায় না। ভাল ব্যাপার যে এবছর করোনার প্রকোপ প্রায় নেই। কিন্তু ডেঙ্গি বাড়বে না কমবে, সেটা বৃষ্টির উপর নির্ভর করছে। যত জল কম জমবে, তত কম ছড়াবে এই রোগ। আমাদের কাজ, বাড়ি-বাড়ি ঘুরে ও প্যান্ডেলের আশপাশে জমা জল ও নোংরা কমানো। সন্ধেবেলা ফ্রি হয়ে যাই। ফলে ছুটি না থাকলেও সন্ধেবেলা বেরোতে পারি।''

ছবি: আনন্দবাজার আর্কাইভ ও আইস্টক



নির্মাণকৌশল

সুবর্ণ বসু

১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

আজ ভোরের ফ্লাইটে কলকাতায় এসে নেমেছি। উঠেছি এয়ারপোর্টের কাছে একটা গেস্ট হাউসে। চেক ইন করার পর ঘড়িতে দেখলাম ভোর ছ'টা পঁচিশ। আমার নেমন্তন্ন দুপুর বারোটায়। কাজেই দু'-তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে ফ্রেশ হয়ে নেওয়া যেতেই পারে। সে কথা ভেবেই জামাকাপড় বদলে স্নান করে নিলাম। তার পর কী মনে হতে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। গেস্ট হাউসের তিন তলার বারান্দা থেকে ইতস্তত ছোট ছোট রঙিন প্যান্ডেল দেখা যাচ্ছে। আজ বিশ্বকর্মা পুজো। সেই উপলক্ষেই আমার নেমন্তন্ন। কাল পরশু আরও কয়েকটা কাজ সেরে কুড়ি তারিখে ফেরার ফ্লাইট। বিশ্বকর্মা পুজোর প্যান্ডেলগুলো দেখে মনের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। কোথাও যেন কিছু একটা খুলে যাচ্ছে, আর বাঁধভাঙা বন্যার মতো ঝাঁপিয়ে আসছে স্মৃতির ঢেউ। মনে হল, চার দিক এত নিস্তব্ধ কেন, মাইক বাজবে না? এখন হিন্দি গান কী চলছে বাজারে? জানি না। খোঁজ নেওয়া হয়নি বহু দিন। আমি এ দেশে থাকি না। আমেরিকার ফ্লোরিডায় থাকি। সেখানে একটা কলেজে পড়াই।

বারান্দা থেকে বিছানায় গিয়ে শুলাম। খানিকক্ষণ এ পাশ ও পাশ করার পরই বুঝতে পারলাম ঘুম আসবে না। বিশ্বকর্মা পুজোর দিনটা যে মাথার ভেতর এমন তোলপাড় করবে ভাবতে পারিনি। মনে পড়ার জিনিসের কি অভাব আছে? আচ্ছা, আপনারা মহিমা ব্যাটারির নাম শুনেছেন? দুলুনির্মলের মেয়ে মিন্টিদিদিকে চিনতেন কেউ? তার ভাই পিন্টু কালোয়াতকে? রায়বাড়ির নুটু, তার দিদি

ঝুমা, জায়সওয়ালদের নরেন, তার বোন চুলবুলি, সরখেলদের দুই ভাই দিপু-টিপু— এদের নাম শুনেছেন? আমরা একসঙ্গে পাড়ায় খেলতাম। আমাদের ছোটখাটো সব পুজোয় প্যান্ডেল সাজাত অমিয়দা। ছোটবেলায় মা মারা গিয়েছে বলে মামার বাড়িতে মানুষ। চুপচাপ বিষণ্ণ মুখে কী যেন ভাবত, আর কাগজ কেটে তৈরি করত রঙিন পাখি ফুল শিকলি ঝাড়বাতি। ফড়েপুকুরের শিবদাস ভাদুড়ী স্ট্রিটে ডাবলুদার দোকানে ঘুড়ি কিনতে গিয়েছেন? মাঝরাত অবধি মা জেঠিমাদের হইহই করে রান্না করতে দেখেছেন বিশ্বকর্মা পুজোর আগের দিন? দু'চার বছর আগের কথা তো নয়, সে তিরিশ বছর আগেকার কথা। তখন আমি ক্লাস সিক্সে পড়ি। চলুন ঘুরে আসি, বেশি সময় নেব না, বেলা বারোটা নাগাদ নেমন্তন্ন যেতে হবে যে...

সেপ্টেম্বর, ১৯৯২

১

'পহেলা নশা, পহেলা খুমার, নয়া প্যার হ্যায়, নয়া ইন্তেজ়ার...''
সকাল থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে মাইকের গান। এই গানটা তখন খুব হিট করেছিল। অন্তাক্ষরীতে এই গানটা নিয়ে খুব ঝামেলাও বাঁধত আবার। 'প' দিয়ে কারও টার্ন এলে যেই সে এই গানটা গাইতে শুরু করেছে, অমনি কেউ কেউ হইহই করে উঠে বলেছে, 'এটা হবে না, এটা হবে না, এটা প-দিয়ে শুরু নয়, চ-দিয়ে শুরু... চাহে তুম কুছ না কহো, ম্যায়নে সুন লিয়া...'
এক একটা গানের সঙ্গেও যে কত কথা জড়িয়ে থাকে!
শ্যামবাজার বল্লভ স্ট্রিটের যেখানে থাকতাম, সে জায়গাটা একটু গলির ভিতরে। অটো স্ট্যান্ড রিকশা স্ট্যান্ড আশপাশে না থাকলেও, কয়েকটা লেদ মেশিন, ওয়েল্ডিংয়ের কারখানা ছিল। ফলে বিশ্বকর্মা পুজো এবং মাইকের অভাব হয়নি। সবচেয়ে বড় ছিল মহিমা ব্যাটারির বিশ্বকর্মা পুজো। বিশাল বাড়িটার গেট খোলা থাকত সারাদিন। সামনে ম্যারাপ বেঁধে পুজো এবং আর একটু দূরে খাওয়াদাওয়া। দুলুনির্মল ধুতি আর ফতুয়া পরে সব কিছু তদারক করত। সে সময় বল্লভ স্ট্রিটের যে কোনও বাড়িতে ঢুকলেই দেখতে পেতেন মহিমা ব্যাটারির বাংলা ক্যালেন্ডার। সে বছর করেছিল, অর্ধনিমীলিত চোখে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং মাথার উপর প্রস্ফুটিত রক্তজবার মধ্যে মা কালীর মুখ। সেই মহিমা ব্যাটারির ক্যালেন্ডারটা ভাল করে খেয়াল করলেই দেখা যেত, তলায় লেখা প্রোপ্রাইটরের নাম— শ্রীনির্মলচন্দ্র বিশ্বাস। ওই হচ্ছে দুলুনির্মল। দুলু উপসর্গটা আমাদের যোগ করা। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় সর্বক্ষণ ডাইনে-বাঁয়ে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দুলতেন। তাই ওই নাম। এ রকম আরও ছিল। খোকনদার অভ্যেস ছিল মিনিটে মিনিটে পশ্চাদ্দেশ চুলকোনো। তার নাম হয়েছিল কৃমিখোকন।
যা-ই হোক, বিশ্বকর্মা পুজোর কথায় পরে আসছি। স্মৃতির ঝাঁপি যদি খুলতেই হয়, তা হলে আগের দিন থেকে খোলাই ভাল। কারণ, আমাদের বাংলা ইস্কুলের ক্যালেন্ডার তখন অনেকটাই আলাদা ছিল। আমাদের সময় ছিল, বিশ্বকর্মা পুজোর সময় হাফইয়ার্লি আর দোলের সময় অ্যানুয়াল। না যেত ভাল করে ঘুড়ি ওড়ানো, না যেত রং খেলা। আমার মা-জেঠিমাদের মুখে বুলিই ছিল, 'জ্বর এসে গেলে পরীক্ষা দিতে পারবে না।' জ্বর কেন আসবে? পড়ন্ত রোদে ঘুড়ি ওড়ালে গা গরম হয়ে জ্বর এসে যাবে, ভিজে গায়ে রং মেখে অনেক ক্ষণ হুড়যুদ্ধু করলেও একই ব্যাপার। সে দুঃখের কথা আর কী বলি— মনে করলে তিরিশ বছর পরও যেন কষ্টে জ্বর এসে যায়।
বিশ্বকর্মা পুজোর দিন হত আমাদের অরন্ধন। আগের দিন মেরেকেটে দুপুর পর্যন্ত পড়াশোনা করে নিলেই ব্যস, বিকেল থেকে বইখাতা শিকেয় তুলে হইচই শুরু। ঠাম্মা মা জেঠিমারা রান্নাঘরে শিলনোড়াকে প্রণাম করে রান্না শুরু করে দিতেন, চলত মাঝরাত অবধি। তখন বুঝতাম না, এখন সে সব সুস্বাদের অভাব খুব টের পাই... পান্তাভাত, ছাঁচিকুমড়ো, কচুশাক, পাঁচ রকম ভাজা, ঘন মুসুর ডাল, চালতার অম্বল, পায়েস। আর পুজোর দিন এর সঙ্গে যোগ হত ইলিশমাছ। প্রত্যেকের দুটো করে— একটা করে ভাজা, একটা করে ঝালের। সন্ধেয় হাঁটতে হাঁটতে যেতাম ফড়েপুকুর। বাবা, ছোটকাকার সঙ্গে। কেনা হত ঘুড়ি, লাটাই, লুদ্দির মাঞ্জা, পাঁচশো গজ, হাজার গজ। বাড়ি ফিরে ভিসিআর ভাড়া করে আনত ছোটকাকা। সেবার এসেছিল রামগোপাল ভার্মার একটা ভয়ানক ভূতের ছবি—'রাত'। আমরা ভাইবোনেরা সবাই টিভির ঘরের সোফায় জড়ামড়ি করে বসে সিনেমাটা দেখেছিলাম বেশ রাত অবধি।
দেখেছেন তো আমার কাণ্ড! গল্প বলতে বসে নিজের কথাই বলে যাচ্ছি শুধু! আসলে স্মৃতির ফ্লাডগেট খুলে গেলে যা হয়, নিজেই সামলাতে পারছি না, হাপরহাটি বকে আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে ফেলছি। না, এ বার গল্পে আসতেই হবে। প্রথমে আসতে হবে অমিয়দার কথায়। বল্লভ স্ট্রিটের যে দিকটা খালধারে মিশেছে, তার বাঁ দিকটা ঘুরে গেলেই পেছনমাঠ। তার আগে সেনগুপ্তদের বাড়ি। দুষ্প্রাপ্য অ্যান্টিকের কয়েক পুরুষের ব্যবসা। ওদের বাড়ির মেয়ে বিয়ের পর বাচ্চা হতে গিয়ে মারা যায়। তখন মামারা সদ্যোজাত অমিয়দাকে তাদের কাছে নিয়ে আসে। ছোটবেলা থেকে মামার বাড়িতেই মানুষ। শুনেছিলাম, তার বাবার দিকের কেউ আর খোঁজখবর নেয়নি। অমিয়দা ছিল পড়াশোনায় দুর্দান্ত। আমাদের চেয়ে অনেকটাই বড়। স্কটিশচার্চ কলেজে পড়ত। অঙ্কে অনার্স। টুকটাক টিউশনি করত। চুপচাপ নিজের মতো থাকত। গুমোর ছিল না, পাড়ায় মিশত সবার সঙ্গে। আগেই বলেছি, হাতের কাজ ছিল খুব সুন্দর। সরস্বতীপুজো লক্ষ্মীপুজোর ডেকরেশনের কথা অমিয়দাকে ছাড়া ভাবা যেত না। অমিয়দার অনেকগুলো টিউশনের মধ্যে একটি ছাত্র ছিল পিন্টু কালোয়াত। আর সেখান থেকেই শুরু হল গল্প।

২

"হ্যাঁ রে পিন্টাস, তুই যে ও রকম গান গাস, তোর বাপের ব্যাটারিগুলো সব এক সঙ্গে বার্স্ট করে না?"
এই ছিল দুলুনির্মলের ছেলে পিন্টু কালোয়াতের উদ্দেশ্যে আমাদের সকলের প্রশ্ন। কারণ পিন্টুকে বাড়িতে এক রোগাভোগা গুরুজি গান শেখাতে আসতেন। পিন্টু বোধ হয় সব কিছুই চড়ার সা থেকে শুরু করত। পিন্টুর দাপটে গুরুজির গলা চিঁ চিঁ করত। পিন্টু যখন গান গাইত, তখন পাশের বাড়ির টিভির ভল্যুম বাড়িয়ে দিয়েও ক্রিকেট খেলার কমেন্ট্রি শোনা যেত না। লোকে বলত, পিন্টু একটু পাগলাটে আছে। তার গান নিয়ে কথা বললে সে মারাত্মক ক্ষেপে যেত, আকাশের দিকে তাকিয়ে নানা অশ্রাব্য কথার বৃষ্টি নামাত। পিন্টু আমাদেরই বয়সি। তার দিদি মিন্টি তখন ক্লাস টেন। মিন্টিদিদির কথাও বলে নিতে হয় এই ফাঁকে। আমাদের পাড়ার এই মেয়েটি ছিল লক্ষ্মীঠাকুরের মতো সুন্দর। কখনও চোখ তুলে কারও সঙ্গে কথা বলেনি। তার গলার আওয়াজও ভাল করে শোনেনি কেউ। খুব মিষ্টি করে হাসত। বাঁ দিকে গজদাঁত ছিল, গালে টোল পড়ত। ছোট্ট চিবুক আর তেকোনা ছোট্ট কপাল। চোখ-নাকও মানানসই সুন্দর। পাতলা ঠোঁট। এই মেয়েই যে ওই কাণ্ড ঘটাবে, কেউ কী ভাবতে পেরেছিল? অত বড় ব্যাটারির কারখানার মালিক যার বাপ, যে দুলুনির্মলের কাছে প্রায় শখানেক লোক চাকরি করে, সেই মেয়ে কি না মন দিয়ে বসল চালচুলোহীন অমিয়দাকে!
তবে গোলমালটা ধরা পড়ত না। সব কিছুর জন্য দায়ী কালোয়াত পিন্টু। সে কথায় পরে আসছি।
না, দুলুনির্মল লোক খারাপ ছিল, এ কথা শত্তুরেও বলতে পারবে না। প্রতিবছর পয়লা বৈশাখে সকাল ন'টা থেকে দশটার মধ্যে সে পৌঁছে যেত পাড়ার সকলের বাড়ি বাড়ি। প্রত্যেক বাড়িতে ক্যালেন্ডার আর মিষ্টির বাক্স দিয়ে হাতজোড় করে শুভ নববর্ষ জানাত সে। বিশ্বকর্মা পুজোয় তার বাড়িতে নেমন্তন্ন থাকত পাড়ার সকলের। সারাদিন। সকালে পুজোর প্রসাদের ফল মিষ্টি। দুপুরে খিচুড়ি বেগুনভাজা আলুরদম, চাটনি পাঁপড় রসগোল্লা। রাত্তিরে প্যান্ডেল থেকে একটু দূরে আলাদা শামিয়ানার নীচে

সরু চালের ভাত, শুক্তো, মাছের মুড়ো দিয়ে ডাল, ঝুরি ঝুরি আলুভাজা আর পাঁঠার মাংস। ঢালাও। তার লেবারদের জন্য অপর্যাপ্ত লিকারের ব্যবস্থা রাখতেও কোনও বার কার্পণ্য করেনি সে।

তার বিশ্বকর্মা ঠাকুর হত প্রায় বারোয়ারির দুর্গাঠাকুরের মতো বড়। বিশাল হাতির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো রাজপোশাক পরা বিশ্বকর্মা। চওড়া বলশালী চেহারা। সরু গোঁফের নীচে মৃদু হাসি। সে হাসিতে সব কিছু নির্মাণ এবং মেরামত করতে পারার কনফিডেন্স।

বিশ্বকর্মাপুজোর দিন মিন্টিদিদি শাড়ি পরত। সকালে পুজো হয়ে গেলে সকলের হাতে প্রসাদের ফল মিষ্টি দিত। আমরা নিতাম, অমিয়দাও নিত। কেউ কোনও গোলমাল টের পায়নি। সব কিছু বেশ সুন্দর করেই চলছিল। আমরা জানতে পেরেছিলাম ঘটনাটা, সেও এক বিশ্বকর্মা পুজোর সময়ই। সেবার হেদুয়ার পার্কে ঘুড়ি আর মাঞ্জার একটা মেলা বসেছিল। আমরা দেখতে গিয়েছিলাম। রায়বাড়ির নুটু, জায়সওয়ালদের নরেন, সরখেলদের দুই ভাই দিপু-টিপু, সবাই ছিল। পাড়ার বড় দু'এক জন সঙ্গে ছিল। অনেক রকম ঘুড়ি এসেছিল— মাছের মতো, জাহাজের মতো, ফানুসের মতো। সে সব দেখে একটু ঘুরেটুরে ফিরছিলাম। হঠাৎ ফেরার সময় কী যেন একটা দেখে জায়সওয়ালদের নরেন আমার হাত খামচে ধরল। আমি বলেছিলাম, "কী রে! কী হল?"

পাড়ার অনেকে ছিলাম এক সঙ্গে। তাই নিজেকে সামলে নিয়েছিল ঘোড়েল নরেন। বলেছিল, "কিছু না, পা-টা মচকে গেল, তাই..."

পরে জেনেছিলাম, ও অমিয়কে বসন্ত কেবিন থেকে বেরতে দেখেছে। সঙ্গে মিন্টিদিদি। মিন্টিদিদি বেথুনে পড়ত।

না, আমাদের কারও বাগড়া দেওয়ার কথা মনে হয়নি। কেউ কোনও কথা গাবিয়েও বেড়াইনি। নিজেদের মধ্যে খুব কনফিডেনশিয়াল গ্রুপেই আলোচনা হয়েছিল শুধু। সকলেরই মনে হয়েছিল, একাবোকা, মুখচোরা, বাপ-মা হীন, মামার বাড়িতে মানুষ হওয়া অমিয়দা ছেলেটা খুব ভাল। তার সঙ্গে মিন্টিদিদিকে বেশ মানায়।

তবে আগুন কখনও চাপা থাকে না। আস্তে আস্তে অনেকের কানেই খবরটা উঠল। দুলুনির্মলের কানে তখনও কথাটা ওঠেনি। গোলমালটা পাকাল কালোয়াত পিন্টু।

পিন্টুকে যখন পড়াতে যেত অমিয়দা, তখন মিন্টি আশপাশে কোথাও থাকত না। এক বার সম্ভবত তার কিছু জরুরি কথা জানানোর দরকার হয়েছিল অমিয়দাকে। তখন তো মোবাইলের ব্যাপার ছিল না। ল্যান্ডলাইনেও ওরা কেউ কাউকে ফোন করত না। কোনও কারণে অমিয়দার কলেজ আর মিন্টিদিদির স্কুল সে সময় বন্ধ ছিল। তাই একটা হাতচিঠি মুখ বন্ধ খামে করে ভাইয়ের হাতে দিয়েছিল মিন্টিদিদি। বলেছিল, অমিয়দার হাতে দিয়ে দিতে। কেউ যেন কিছু জানতে না পারে।

এ বার ঘটনা হল, কাকে দিয়েছে রাজার পার্ট! যে ছেলেটা ওরকম রাগরাগিণী গাইতে পারে, যে ছেলেটা রেওয়াজে বসলে পাড়ায় একটা কুকুর থাকে না, দিনের বেলা বাড়ির ছাদে কাক-চিল বসে না, সেই ছেলেটার মাথায় যে ঘিলু আছে— এমন উচ্চ ধারণা কারও ছিল না। পিন্টুর গান শুনলে সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করতেন যে, ভূতের রাজার বর পাওয়ার আগে গুপী গায়েনও এর চেয়ে মিষ্টি গাইত। 'পড়োসন' সিনেমার ভোলা, মানে সুনীল দত্তও এর চেয়ে বেশি সুরে গাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। মাথায় গোলমাল না থাকলে কেউ ওভাবে গান চালিয়ে যায় না। মানুষ তো আর কান বন্ধ করে গান গায় না! আর কানে আঙুল দিয়ে গান গাইলেও, নিজের গলা ভালই শোনা যায়। মিন্টিদিদির দোষ হয়েছিল, পিন্টুর রেওয়াজ সেরে ওঠার সময় চিঠিটা পিন্টুর হাতে দেওয়া। সেই মহান কালোয়াত, চিঠিটা গানের খাতার মধ্যে রেখে বেমালুম ভুলে গেলেন।

৩

রাত প্রায় ন'টার সময় সেনগুপ্তদের বাড়ি থেকে যখন দুলুনির্মল বেরল, তখন গোটা পাড়া থমথম করছে। অমিয়দার দাদামশাই সমরেন্দ্র সেনগুপ্তর সঙ্গে দুলুনির্মলের কী আলোচনা হয়েছে, কেউ জানল না। শুধু কয়েক দিন পর শুনতে পাওয়া গেল, কলেজের পড়াশোনা শেষ করে অমিয়দা বেঙ্গালুরু চলে যাবে। সেখানে সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, মানে সমরদাদুর ছোটবেলার বন্ধু থাকেন। সেখানে তাঁর বিশাল প্রাইভেট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। অমিয়দা তাঁর কাছে গিয়ে থাকবে। সরখেলদের সঙ্গে সেনগুপ্তদের লতায়-পাতায় কী যেন একটা যোগাযোগ ছিল। সরখেলদের বাড়ির দিপু-টিপুরা জানাল, সমরদাদুর সেই বন্ধুর নাম ভবরঞ্জন। লোকটার অগাধ পয়সা। উনিই অমিয়দার সমস্ত দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছেন। উনি নাকি অমিয়দাকে হায়ার স্টাডির জন্য বিলেতেও পাঠাবেন।

কিন্তু কেন? কলকাতায় কি পড়াশোনা হয় না?

বহু কৌতূহলের চাপে পড়ে টুকরো টুকরো করে পুরো ছবিটা পরিষ্কার হল।

পিন্টু কালোয়াতের গানের শুঁটকো গুরুজির হাতে মিন্টিদিদির চিঠিটা পড়ে যায়। সে আবার ধোয়া তুলসীপাতাটি সেজে চিঠিটা তুলে দেয় দুলুনির্মলের হাতে। দুলুনির্মল রেগে আগুন হয়ে যায়। মেয়েকে বাড়িতে বন্ধ করে রাখে, আর কথা বলতে যায় অমিয়র দাদামশাই সমরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে।

সম্পর্কটাকে গুরুত্ব দেন না সমরেন্দ্র, কিন্তু তাঁর একটাই কথা— এখনই এ সব করলে যে, অমন ব্রাইট ছেলেটার উন্নতি আটকে যাবে! কেরিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে! অতএব পত্রপাঠ তাকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এতে সমরেন্দ্রর সাপও মরল, দুলুনির্মলের লাঠিও ভাঙল না। পিন্টু কালোয়াতকে পড়াতে যাওয়াও বন্ধ হয়ে গেল অমিয়দার। সারা পাড়াটায় যেন কেউ কালি ঢেলে দিয়েছিল। স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসটাই মরে গিয়েছিল। চুপচাপ অমিয়দা আরও চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। মিন্টিদিদিকে আমরা আর প্রায় দেখতেই পাইনি। তার আর বাড়ি থেকে বেরনোর হুকুম ছিল না।

পিন্টু কালোয়াতের গানের শুঁটকো গুরুজির হাতে মিন্টিদিদির চিঠিটা পড়ে যায়। সে আবার ধোয়া তুলসীপাতাটি সেজে চিঠিটা তুলে দেয় দুলুনির্মলের হাতে। দুলুনির্মল রেগে আগুন হয়ে যায়।



এ ভাবেই কেটে গিয়েছিল বেশ কয়েকটা মাস। সেবার পুজোর মুখে মুখেই অমিয়দার গ্র্যাজুয়েশনের রেজাল্ট বেরোল। অঙ্কে প্রায় পঁচাশি শতাংশ নম্বর নিয়ে ফার্স্ট ক্লাস। আমাদের চেয়ে একটু বড়দের গ্রুপটা বলে বেড়াল, এ রকম ছেলে হাতে হ্যারিকেন নিয়ে খুঁজলেও দুলুনির্মল কোথাও পেত! দুলে দুলেই ব্যাটার স্ক্রু ঢিলে হয়ে গিয়েছে, না হলে বিনা পরিশ্রমে পাওয়া অমন পাত্র কেউ হাতছাড়া করে না। আসলে দুলুনির্মল সরস্বতী বুঝত না, ওর কাছে লক্ষ্মীই সব। খানদানি বড়লোকের ঘর না হলে সে তার লক্ষ্মীমন্ত মেয়েকে পাত্রস্থ করবে না, এই ছিল তার প্রতিজ্ঞা।

ক্রমশ পাড়ায় জানাজানি হয়ে গেল, দুর্গাপুজোর পঞ্চমীর দিনই কলকাতা ছাড়ছে অমিয়দা। আর তার আগের রাতেই দুলুনির্মলদের বাড়িতে ঘটে গেল ভয়ঙ্কর বিপদ। সারা পাড়া নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, সে বার পুজোর আনন্দও অনেকটাই ম্লান হয়ে গিয়েছিল সেই ঘটনার অভিঘাতে।

মিন্টিদিদির মতো লাজুক নতমুখী একটা মেয়ে যে ও রকম পাগলের মতো ভালবাসতে পারে, সে কথা সারা পাড়া কেন, মিন্টির বাপ দুলুনির্মল পর্যন্ত ভাবতে পারেনি। বোকা মিন্টি, পাগল মিন্টি, অসহায় মিন্টি হয়তো কোনও সিনেমা দেখে শিখেছিল বাড়ি থেকে পালানোর এই উপায়টা। কিন্তু তার পর কী করবে ভাবেনি। সে নিজের মতো করেই ঠিক করে ফেলেছিল অমিয়দার সঙ্গে পালাবে। কিন্তু কী করে! অমিয়র বড়মামা যে নিজে সঙ্গে করে

অমিয়দাকে পৌঁছে দিয়ে আসবেন, সে কথাও সে জানত না। শুধু জানত, সে যদি তার বাড়ি থেকে পালিয়ে এক বার অমিয়র কাছে যেতে পারে, ব্যবস্থা একটা ঠিক হয়ে যাবে। তেমন হলে তারা দু'জনে এক সঙ্গে কোথাও চলে যাবে, অমিয় না হয় বেঙ্গালুরু যাবেই না।

বুঝলেন পাঠকবন্ধুরা, আজকের মাটিতে দাঁড়িয়ে তিন দশক পিছন ফিরে তাকালে ও রকম ভালবাসাকে রূপকথা বলে মনে হয়। আজকের ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি হিসেবি, এ ভাবে তারা ঝুঁকি নিতে পারবে কি না, আমার খুব সন্দেহ আছে। সম্পর্কের এই একবগ্গা জেদ, দামালপনা আর দেখতে পাই না। দ্রুত এগোচ্ছে সময়। আমি এখন ফ্লোরিডায় থাকি। আমার বুকের মধ্যে বাস করে আমার নব্বইয়ের বেড়ে ওঠা, আমার উত্তর কলকাতা, আশ্চর্য বোকা বোকা দামাল সব প্রেম— মোবাইল, ফেসবুক, হোয়াট্সঅ্যাপ, অফুরন্ত ডেটা ছাড়াই যারা এগিয়েছে উল্কার গতিতে। অনেক সময় হয়তো কোথাও পৌঁছয়নি, তবু যাত্রাটাই শাশ্বত হয়ে থেকেছে। স্মৃতির পটে জলবিন্দুর মতো লেগে থেকেছে, কখনও মোছা যায়নি।

অমিয়র বড়মামা পরে জনান্তিকে স্বীকার করেছিলেন, তাঁর বাবা অমিয়কে সাততাড়াতাড়ি কলকাতা ছাড়া করে কাজটা ভাল করেননি। ছেলেটা মিন্টির খবরটা পাওয়ার পর থেকে সারা রাস্তা শুধু কেঁদেছে। অমিয় ভেবেছিল, মিন্টি তাকে ভুলে যাবে। কারণ তার পক্ষে তো আর পৃথ্বীরাজ হয়ে সংযুক্তাকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। অঙ্কের ছাত্র বলেই সম্ভবত তার কিছুটা বাস্তববোধ ছিল। সে বুঝেছিল, মামার বাড়ির অন্নে প্রতিপালিত হয়ে বিদ্রোহ করা চলে না, যখন তার নিজের পায়ের তলার মাটিই শক্ত নয়। সে মিন্টির আশা ছেড়ে দিয়েছিল, সে নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিয়েছিল যে, মিন্টিও নিশ্চয়ই তাকে ভুলে যাবে। সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, মিন্টি চার পাঁচটা শাড়িতে গিঁট বেঁধে তিন তলার জানলা বেয়ে নামার চেষ্টা করবে।

মিন্টি পেরেছিল। পুরোটা নয়, তবে অনেকটা। রাতের অন্ধকারে দোতলা পর্যন্ত নেমে আসার পর হঠাৎ তার গায়ে টর্চের আলো এসে পড়ে। গেটের ভিতর দিককার সমস্ত আলো জ্বলে ওঠে। মিন্টি তাকিয়ে দেখে হাতে একটা বেল্ট নিয়ে হাফ প্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে গেটের সামনে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দুলছে দুলুনির্মল। সম্ভবত উত্তেজনায়, তার দোলনগতি অসম্ভব দ্রুত। ব্যর্থতার ভয়? শেষ মুহূর্তে ধরা পড়ে গিয়ে আত্মহত্যার ইচ্ছে? না কি চমকে যাওয়ার জন্য হাত ছেড়ে যাওয়া?

দোতলা থেকে সোজা নীচে শান বাঁধানো মেঝেয় পড়ে মিন্টি। দাঁড়ানো অবস্থাতেই। প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে অজ্ঞান হয়ে যায়। হাতের বেল্ট ফেলে দিয়ে সেই রাতেই গাড়ি বের করে দুলুনির্মল। মেয়েকে নিয়ে ছোটে হসপিটালে। পরের দিন পঞ্চমীর সকালে আমাদের মানচিত্র থেকে বরাবরের মতো নিরুদ্দেশ হয়ে যায় অমিয়দা। আর দশমীর দিন হসপিটাল থেকে বাড়ি ফেরে মিন্টিদিদি। গোড়ালিতে কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার। উঠে হাঁটাচলা করতে সময় লাগবে।

তার কয়েক বছর পর বল্লভ স্ট্রিট থেকে আমার বাস ওঠে। আমার বাবা বদলি হয়ে যায় নয়ডায়। সেখানেই আমার পরবর্তী পড়াশোনা। সেখান থেকেই আমেরিকা যাওয়া। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানতাম, মিন্টিদিদিকে বরাবরের মতোই খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। সুন্দর মেয়ে খুঁতো হয়ে যাওয়ার কষ্টে দুলুনির্মলও আর বেশি দিন বাঁচেনি। ব্যাটারি কারখানাও উঠে গিয়েছে। ওদের বিশাল বাড়িটা প্রোমোটিং হয়ে গিয়েছে। ওরা দুটো ফ্ল্যাট পেয়েছে একই ফ্লোরে। একটা ফ্ল্যাটে পিন্টু কালোয়াত তার পরিবার নিয়ে থাকে, অন্য ফ্ল্যাটটায় একা মিন্টিদিদি।

আবার আজ, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২

পুরনো কথার ঝাঁপি খুলে বসলে যা হয়, কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যায় তার ঠিক থাকে না। বলাই হয়নি, আমার কলকাতা আসার উদ্দেশ্য আমাদের পুরনো বাড়িটার একটা বিলিব্যবস্থা করা। বল্লভ স্ট্রিটের ওই বাড়ি ছেড়ে সকলেই নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছি আমরা। সকলে সহমত হয়ে সই সাবুদ করে জায়গাসহ বাড়িটা তুলে দিচ্ছি প্রোমোটারের হাতে। আমাদের সকলের চেনা প্রোমোটার। জায়সওয়াল প্রপার্টিজ়। প্রোপ্রাইটার নরেন্দ্র জায়সওয়াল। যে প্রথম বসন্ত কেবিন থেকে অমিয়দা-মিন্টিদিদিকে বেরতে দেখে উত্তেজনায় আমার হাত খামচে ধরেছিল। কাল সইসাবুদের তারিখ। কিন্তু নরেন আমাকে জোর করে আগের দিন আসতে বলেছে। ওর ফার্মে বিশ্বকর্মা পুজোয়। পুরনো কয়েকজন বন্ধুও আসবে। একটা রিইউনিয়ন মতো আর কী!

ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় গেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এখান থেকেই কার রেন্টালের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। নরেনদের ফার্মে গিয়ে সত্যিই খুব ভাল লাগল। পুরনো পাড়া একেবারেই বদলে গিয়েছে। নিজেকে তো রোজ চোখে পড়ে। পরিবর্তন বোঝা যায় না। তিরিশ বছর পর ছোটবেলার বন্ধুদের বড় হয়ে যাওয়া চেহারাটা দেখে অদ্ভুত অনুভূতি হল। গল্পে আড্ডায় খাওয়াদাওয়ায় সারা দুপুরটা কেটে গেল। মহিমা ব্যাটারির বিশ্বকর্মা পুজোর কথা বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল। তবে নরেনদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ওরকম ঠাকুর ডেকে রান্না করিয়ে নয়, সরাসরি হোটেল থেকে অর্ডার দিয়ে। অফিসের পিছন দিকের লনে টেবিল চেয়ার পেতে খাওয়ানো। মাটন বিরিয়ানি, চিকেন চাঁপ, ফিরনি। ভারতীয় তেলমশলা থেকে বহুদিন দূরে, তাই ভরসা হল না। খুব অল্প খেলাম। তবে বিশ্বকর্মা পুজোর খাওয়া বলে মনে হল না।

ছোটবেলার কথায় কথায় উঠল মিন্টিদিদি অমিয়দাদের কথা।

নরেন বলল, "মিন্টিদি এখনও বিশ্বকর্মা পুজো করে, জানিস? নিজের ফ্ল্যাটের মধ্যে। চল দেখা করে আসি। তুই কত দিন পর এলি, দেখে খুশি হবে।"

গেলাম মিন্টিদিদিদের ফ্ল্যাটে। আরও সুন্দর হয়েছে মিন্টিদি। ইংরেজিতে 'গ্রেসফুলি এজিং' বলে একটা কথা আছে, সে কথাটা মিন্টিদির ক্ষেত্রে পুরোপুরি খাটে। পরিচয় দিতে চিনতে পারল মিন্টিদি, সুন্দর করে হেসে বলল, "কত দিন পর! পুরনো পাড়াকে তো ভুলেই গিয়েছিস! মাঝে মাঝে তো আসতে পারিস। অন্তত আমরা যত দিন আছি।"

আমাকে প্রসাদ দিল। একটা কাচের ডিশে খিচুড়ি আলুর দম আর সন্দেশ। বড় তৃপ্তি করে খেলাম। এ কথা সে কথার ফাঁকেই চোখ আটকে গেল দেওয়ালে টাঙানো একটা ছবিতে। চিনতে ভুল হল না। একটা বিরাট স্কুলবাড়ির সামনে অমিয়দা। রোগাটে চেহারাটা সামান্য ভারিক্কি। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। পাশে একজন মহিলা, সম্ভবত স্ত্রী। অমিয়দার কোলে একটা খুব ফুটফুটে মেয়ে। মাথায় প্রজাপতি হেয়ারব্যান্ড।

আমার থমকে যাওয়া লক্ষ করে মিন্টিদি বলল, "অমিয়র মেয়েটা দারুণ মিষ্টি জানিস। অমিয় এখন ওর শ্বশুরমশাই, মানে ভবরঞ্জনবাবুর স্কুলটার প্রিন্সিপাল। ভবরঞ্জনবাবু নিজের স্কুল আর মেয়ে, দুইই অমিয়র হাতে তুলে দিয়ে বড় শান্তিতে চোখ বুজেছেন। অমিয়র মতো ছেলে কোথায় পাবেন, বল ভাই!"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "তোমার সঙ্গে যোগাযোগ আছে?"

"আছে তো, অমিয় ওর স্ত্রীকে বলেছে আমি ওর এক দূর সম্পর্কের বোন। স্কাইপে ওদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই কথা হয়। ওদের মেয়ের নাম ফুলখুকি। আমাকে পিসিমণি বলে ডাকে।"

অবাক হয়ে দেখলাম, মিন্টিদিদির মুখে একই সঙ্গে একটা ভাঙাচোরা কষ্ট আর আনন্দের উদ্ভাস যুগপৎ খেলা করে যাচ্ছে। কতকটা আনমনেই মিন্টিদিদি বলে উঠল, "দেখবি ভাই, জীবনে পুরো কষ্ট বা পুরো সুখ বলে কিছু হয় না, সব কষ্টের মধ্যেই একটু সুখ, আর সব সুখের মধ্যেই একটু কষ্ট মিশে থাকে।"

উঠে আসার সময় ভাল করে দেখলাম, মিন্টিদিদির বাড়ির ড্রয়িং স্পেসে পুজো হওয়া ছোট্ট বিশ্বকর্মাকে। বিষণ্ণ, গম্ভীর। তাঁর অভিব্যক্তিতে যেন আর সব কিছু নির্মাণ এবং মেরামত করতে পারার কনফিডেন্স নেই। সুখের রন্ধ্রপথে কী ভাবে চোরা দুঃখ ঢুকে পড়ে, কিংবা কষ্টের ফাটল ধরে কী ভাবে চুঁইয়ে পড়ে সুখের ছোঁয়া, এই ত্রুটি বোধ হয় তিনি সারাতে পারেন না। কিংবা হয়তো ওটাই দেবশিল্পীর নিজস্ব নির্মাণকৌশল।

অলংকরণ: মহেশ্বর মণ্ডল



অন্তরাগের ওপারে

পত্রলেখা নাথ

ঘণ্টাখানেক হল চেম্বারে এসেছেন অনিমেষ। কাল রাতে অসম্ভব পেটের যন্ত্রণায় ঠিক মতো ঘুম হয়নি। ওষুধ খেয়েও ঘন্টাদুয়েক বসে থাকতে হয়েছিল। ভোররাতে ব্যথাটা একটু কমেছে। কিন্তু শরীর যেন ছেড়ে দিয়েছে। খুব দুর্বল লাগছিল কদিন ধরেই। আজ যেন আর বসতেই পারছেন না। প্রায় দশ বছর ধরে দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে বসেন ডা. অনিমেষ মুখোপাধ্যায়। ওঁকে দেখাতে বহুদূর থেকে পেশেন্টরা আসেন, তাই একরকম জোর করেই আজ চেম্বারে বসেছেন। বাইরে এখনও দশ বারোজনের লাইন। রিসেপশনে বলা আছে ফোন করলে তবে পেশেন্ট ভিতরে পাঠাবে। নিজের চেয়ারে মাথা দিয়ে শরীরটা এলিয়ে দিয়েছিলেন অনিমেষবাবু। হঠাৎ চেম্বারের দরজা খুলে আচমকা একজন ঢুকে পড়ে। বলে, ‘‘ডাক্তারবাবু প্লিজ়, আমায় বাঁচান। আমি বাঁচতে চাই।’’ অনিমেষ লোকটির কথায় ধড়মড়িয়ে উঠে বসেন। লোকটির পিছন পিছন ঢুকেছে রিসেপশনে বসে থাকা মেয়ে দুটি। অনিমেষকে দেখে মেয়ে দুটি বলে, ‘‘স্যার আমরা কতবার বললাম, স্যার না বললে ভিতরে ঢোকা যাবে না। কিছুতেই শুনলেন না।’’ অনিমেষ হাতের ইশারায় মেয়েদুটিকে বাইরে যেতে বলে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে বলেন, ‘‘বসুন আপনি, বলুন কী হয়েছে আপনার? কী সমস্যা!’’ লোকটি চেয়ারটা টেনে ধপ করে বসে কাঁদো কাঁদো মুখে বলে, ‘‘স্যার আমি মনে হয় আর বাঁচব না। গত পনেরো দিন হল গলায় খুব ব্যথা। কিছুতেই সে ব্যথা কমছে না। খাবার গিলতেও কষ্ট হচ্ছে। আমি কি আর বাঁচব স্যার?’’ অনিমেষবাবু লোকটিকে বেডে শুইয়ে ভাল করে পরীক্ষা করেন। টর্চ দিয়ে গলার ভিতরটা দেখেন। যা ভেবেছিলেন, ঠিক তাই। লোকটির টনসিল পেকেছে। তবে মৃত্যুভয়েই লোকটা অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। অনিমেষ লোকটিকে পরীক্ষা করার পর বলেন, ‘‘আপনার বয়স কত?’’ লোকটি বলে, ‘‘তা প্রায় পঁচাত্তর হবে। কেন ডাক্তারবাবু? আমার কি বড় কোনও অসুখ হয়েছে?’’

অনিমেষের ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসির রেখা দেখা দেয়। বলেন, ‘‘জীবনের পঁচাত্তরটা বছর পৃথিবীতে কাটিয়ে দিলেন। জীবনের সব

সুখস্বাচ্ছন্দ্য তো পেয়েছেন। এখন যদি কিছু হয়ও, কী আছে!'' লোকটি এবার কেঁদে ফেলে। বলে, ''দয়া করুন স্যার, আমাকে বাঁচতেই হবে। আমার বাড়িতে মানসিক ভারসাম্যহীন স্ত্রী আছে। আমি মারা গেলে তাকে দেখবার কেউ নেই। আমার আগে ওর পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া দরকার।''

অনিমেষ এবার উঠে ভদ্রলোকের হাত দুটো ধরে বলেন, ''আরে শুনুন, অত উতলা হওয়ার কিছু হয়নি। আপনার টনসিলটা একটু বেশিরকমের অ্যাফেক্টেড হয়েছে। আমি দুটো অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছি, খাবেন। সঙ্গে গার্গল করবেন, দিনসাতেকের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।''

ভদ্রলোক চলে যেতে আবার চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দেন অনিমেষ। ভাবেন, সত্যি লোকটা মারা গেলে ওঁর স্ত্রী অসহায় হয়ে পড়বেন। এই বয়সেও লোকটির মাথায় কত চিন্তা! আচ্ছা অনিমেষের যদি কিছু হয়? ওঁর ১৯৪৬-এ জন্ম। তা পঁচাত্তর তো হবেই। না, ওঁর কিছু যায় আসে না। স্ত্রী মারা গিয়েছে বছরআটেক হল। ছেলে প্রতিষ্ঠিত, বেঙ্গালুরুতে থাকে। মরতে যখন হবেই, দুদিন আগে আর দুদিন পরে!

পকেটের ফোনটা বেজে ওঠে অনিমেষের। বন্ধু দেবাশিস ফোন করেছে। অনিমেষ তাড়াতাড়ি ফোনটা ধরে বলেন, ''হ্যালো, কী খবর বল!'' দেবাশিস কোনও উত্তর না দিয়ে বলে, ''অনিমেষ, এখন শরীর কেমন আছে? তোকে যে বললাম, আমি হসপিটালে থাকতে থাকতে একবার দেখিয়ে যা। কোথায় আছিস এখন?''

''আর কোথায়? নার্সিংহোমেই আছি! তবে শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। খুব দুর্বল লাগছে, পেটের ব্যথাটাও হালকা আছে। তোকে ফোন করবই ভাবছিলাম,'' অনিমেষ বলেন।

''আর দেরি করিস না, চলে আয়। ৬টা নাগাদ আমি বেরিয়ে যাব।''

রিসেপশনে ফোন করে বাকি পেশেন্টদের ক্যানসেল করে, বেরিয়ে পড়েন অনিমেষ। তারপর সোজা বাইপাসের ধারে দেবাশিসের হসপিটালে। প্রথমে কিছু রুটিন চেক-আপ, তারপরে সোনোগ্রাফি হয়। দেবাশিস একটু ঘুরে এসে বলেন, ''তোকে সিটি স্ক্যানটাও করাতে হবে।'' অনিমেষ দেবাশিসের চোখে চোখ রেখে বলেন, ''তুই কি সাসপেক্ট করছিস...''

''সাসপেক্ট করার মতো এখনও কিছু হয়নি। আগে রিপোর্ট আসুক, তারপর যা বলার বলব,'' দেবাশিস বলে ওঠেন। অনিমেষ সোনোগ্রাফিটা স্ক্রিনে দেখেছেন। ডাক্তারিতে কম দিন হল না। লিভারে বেশ কিছু মাস রয়েছে। এটা কতটা খারাপের চিহ্ন, অনিমেষ খুব ভালই জানেন। তবু অনিমেষ দেবাশিসকে কিছু বুঝতে দেন না। চেয়ার থেকে উঠে হাসিমুখে দেবাশিসের দিকে তাকিয়ে বলেন, ''ঠিক আছে ডাক্তারবাবু, আজকে আসি। রিপোর্টগুলো পেলে জানাবেন।'' দেবাশিস অনিমেষকে ডানহাতের বাহুতে জড়িয়ে ধরে।

ফেরার সময় গাড়িতে বসে ভাবেন অনিমেষ। সোনোগ্রাফির পর সিটি স্ক্যানের অর্থ, নিশ্চয়ই দেবাশিস সাসপেক্ট করছে ক্যানসার। তাছাড়া লিভারে যেভাবে মাসগুলো হয়েছে, তাতে খুব প্রাইমারি স্টেজ বলে মনে হয় না। ডাক্তারি হিসাব বলে, এ ধরনের কেস খুব বেশি হলে মাসছয়েক সময় দিতে পারে। আবার মাসদুয়েকের মধ্যেও সব শেষ হয়ে যেতে পারে। মৃত্যুভয় কোনওদিন ছিল না অনিমেষের। তবে আজ কেন মনে হচ্ছে, পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে? না, নিজেকে শক্ত হতে হবে। সকালের ওই পেশেন্টের কথা মনে পড়ে। মৃত্যু যখন একদম কাছে চলে আসে, তখন সব কিছু অন্যরকম হয়ে যায়। নিজের মনকে বোঝান অনিমেষ। চিরকাল রাজার মতো বেঁচেছেন, মরার সময় রাজার মতোই মরতে চান। মনখারাপ করে বসে থাকার সময় ওঁর হাতে নেই। টাইম লিমিটেড। হাতে প্রচুর কাজ। যাবার আগে সব শেষ করে যেতে হবে।

পর্ব-২

গ্যারেজে গাড়িটা ছেড়ে দোতলায় উঠে নিজের ঘরে ঢুকে পড়েন অনিমেষ। প্রতিদিনের মতো দীপা চা নিয়ে ঘরে আসে। অনিমেষ দীপার দিকে না ফিরেই বলেন, ''আজ চা খাব না দীপা, নিয়ে যাও। আর দেখো কেউ যেন আমাকে বিরক্ত না করে। ল্যান্ডলাইনে ফোন এলেও ডেকো না।''

দীপা চলে যেতে দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দেন। একটা পেন দিয়ে ক্যালেন্ডারের আজকের তারিখটা গোল করে দাগ দেন। তারপর সেখান থেকে দু'মাস উল্টে একটা তারিখের উপর হাত দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। এই কি তবে ওঁর শেষ দিন! নিজের মনেই হাসেন অনিমেষ। ঈশ্বর ছাড়া এভাবে কি কেউ দিনক্ষণ বলতে পারে? এর মধ্যে আবার মোবাইলটা বেজে ওঠে। দেখেন দেবাশিস ফোন করেছে। অনিমেষ ফোন তুলে বলেন, ''বল কী হল?'' দেবাশিস বলেন, ''শোন না, তোকে আর রিপোর্ট নিতে আসতে হবে না, আমি রিপোর্টগুলো তুলে নেব।'' অনিমেষ এবার হেসে বলেন, ''আরে আমি অত ভীতু নই। তোরা কনফার্ম না হলেও আমি কিন্তু জানি আমার কী হয়েছে। আমাকে কিছু লুকোবার দরকার নেই। ভুলে যাস না আমিও একজন সিনিয়র ডাক্তার। আর নিজের শারীরিক কন্ডিশন বোঝার ক্ষমতা আমার আছে।'' দেবাশিস আর কোনও কথা বললেন না।

ফোনটা রেখে বিছানার উপর চুপ করে বসেন অনিমেষ। হয়তো আর কয়েকটা দিন পৃথিবীতে থাকবেন। জীবনে যে কাজ অসমাপ্ত রয়ে গিয়েছে, যে সম্পর্কগুলো মান-অভিমানের টানাপড়েনে আটকে আছে, যাদের সঙ্গে দেখা করব-করব করেও এতদিন দেখা হয়নি, সেগুলো করে নেওয়া দরকার। খাট থেকে উঠে অনিমেষ আলমারির মধ্যে রাখা পুরনো একটা ডায়েরি বের করেন। তারপর মোবাইলটা বের করে সুমিতাভ সেনের নম্বর ডায়াল করেন। বারপাঁচেক রিং হতে এক ভদ্রলোক ফোন ধরেন, ''কে বলছেন?'' অনিমেষ বলেন, ''আমি কি অধ্যাপক সুমিতাভ সেনের সঙ্গে কথা বলতে পারি? একসময় আমি ওঁর খুব কাছের মানুষ ছিলাম। তারপর দীর্ঘ সময় ওঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি।'' ওপাশ থেকে ভদ্রলোক বলেন, ''আপনার নামটা যদি কাইন্ডলি বলেন, আমি সুমিতাভবাবুর ছেলে সন্দীপ বলছি।'' অনিমেষ বলেন, ''হ্যাঁ নিশ্চয়ই, আমার নাম অনিমেষ মুখোপাধ্যায়।''

''আচ্ছা, আপনিই ডাক্তারবাবু। বাবা আপনার কথা খুব বলতেন।''

''বলতেন মানে?'' অনিমেষ চমকে বলে ওঠেন।

''ও আপনি জানেন না! বাবা বছরদুয়েক হল প্রয়াত হয়েছেন।'' অনিমেষ একটু সময় চুপ করে থেকে বলেন, ''আপনার বাবা আমার দীর্ঘ সময়ের পেশেন্ট ছিলেন। বছরপাঁচেক আগে আপনাদের বাড়ি খুব যেতাম। আপনি সম্ভবত তখন বাইরে ছিলেন। আপনাদের উত্তরের ঝুল বারান্দাওলা বসবার ঘরটায় বসে কত গানবাজনা করেছি। পুরনো দিনের সঙ্গীতশিল্পীদের নিয়ে কত স্মৃতিচারণা করতেন আপনার বাবা। আমাকে বলেছিলেন আপনার বাবার সঙ্গে আঙুরবালা দেবীর বারকয়েক সাক্ষাৎ হয়েছিল। আঙুরবালা দেবীর একটা দুর্লভ রেকর্ড আমাকে দেবেনও বলেছিলেন। আমি যাব যাব করে যাওয়া হয়নি।''

সন্দীপ বলে ওঠে, ''আপনার নাম বাবার মুখে খুব শুনতাম। শেষ সময়ে বাবা অনেকবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। তখন কোভিড পরিস্থিতিতে আপনি চেম্বারে বসছিলেন না। বাবা একটা চিঠি লিখে দিয়েছিলেন আপনাকে দেওয়ার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটা আপনাকে দেওয়া হয়নি। আপনার পার্সোনাল নম্বরটাও বাবা বলতে পারছিলেন না। তারপর বাবা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। যাক, এবার একদিন দেখা করে আপনাকে চিঠিটা আর রেকর্ডটা দিয়ে আসব।'' অনিমেষ বলেন, ''কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা বলি, আপনার হাতে সময় থাকলে চিঠিটা একবার পড়ে শোনাবেন?'' সন্দীপ বলে, ''এখন?'' অনিমেষ হালকা হেসে বলেন, ''হ্যাঁ আসলে আমার হাতেও আর বেশি সময় নেই।'' সন্দীপ বলে, ''আচ্ছা আপনি ফোনটা রাখুন, আমি চিঠিটা বের করে রিং ব্যাক করছি।''

সুমিতাভ সেনের মুখটা চোখের সামনে ভাসছে অনিমেষের। ধুতি পাঞ্জাবি পরা ছোটখাটো মানুষ। খুব পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল। ঠোঁটটা সব সময় লাল টুকটুকে হয়ে থাকত। সুমিতাভ বাবুর ল্যান্ডলাইন নম্বর থেকে ফোনটা বেজে ওঠে। অনিমেষ ফোনটা তুলে বলেন, ''হ্যাঁ বলুন।'' সন্দীপ চিঠিটা পড়তে থাকে।

'প্রিয় অনিমেষ, তুমি আমার বাড়ি আসবে বলেছিলে, কিন্তু এখনও তোমার সময় হল না। অথচ আমার হাতের সময় নিঃশেষিত প্রায়, আমি ফাইনাল বেলের অপেক্ষায় দিন গুনছি। তোমাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে। আর তোমার গলায় আঙুরবালা দেবীর যে গানটা শুনেছিলাম, সেটা আর একবার যদি শুনতে পেতাম, মনটা শান্ত হত। দুর্লভ রেকর্ড ডিস্কটা রেখেছি তোমাকে

দেব বলে। আমার ছেলে সন্দীপের হাত দিয়ে তোমার জন্য চিঠিটা পাঠালাম। একবার কষ্ট করে এসো ভাই, এটাই বোধহয় শেষ দেখা হবে আমাদের। ইতি তোমার সুমিতাভদা।'

ফোনের ওপার থেকে ভেসে আসা শব্দগুলো যেন তিরের মতো বিঁধছিল অনিমেষের হৃদয়ে। সে সময় একগাদা কাজের চাপ, কোভিড পরিস্থিতি সব মিলিয়ে সুমিতাভবাবুর বাড়ি যাওয়া হয়নি। এত খারাপ লাগছিল অনিমেষের। চিঠিটা শোনার পর আর কিছু কথা বলতে ইচ্ছে করছিল না। সন্দীপ বলে, ''তাহলে আপনার কাছে কবে যাব ডাক্তারবাবু? বাবার এই শেষ চিঠি আর ওই রেকর্ড ডিস্কটা আপনার কাছে পৌঁছে দিতে চাই।'' অনিমেষ বলেন, ''আমি এখন ফাঁকাই আছি, আপনি যেদিন খুশি ফোন করে চলে আসুন। তবে দেরি করবেন না।''

পর্ব ৩

রাতে খাবার টেবলে কিছুই খেতে পারেন না অনিমেষ। সর্বক্ষণের কাজের মেয়ে দীপা বলে, ''কী গো ডাক্তারকাকা, তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না! তোমাকে কি অন্য কিছু বানিয়ে দেব?'' অনিমেষ হেসে মাথা নেড়ে না বলেন। কী করে বোঝাবেন, এ জন্মের মতো খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে! চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়তে যাবেন, দেখেন দীপার পাঁচবছরের মেয়েটা প্যান্ট ধরে টানছে। অনিমেষ হাঁটু গেড়ে নিচু হয়ে বলেন, ''কী হয়েছে সোনামনি, ডাকছ কেন?'' মেয়েটি আধো আধো স্বরে বলে, ''দাদান ভাল করে খেয়ে নাও, না হলে শরীরে শক্তি হবে না। আর আমাকে গানও শোনাতে পারবে না।'' অনিমেষ এবার হো হো করে হেসে ওঠেন। সত্যি, মেয়েটাকে কবে থেকে একটা গান শোনাবেন বলেছিলেন। বললেন, ''বেশ কথা দিচ্ছি, তোমাকে আমি একটা গান শোনাবই শোনাব।'' মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে নিজের ঘরে যান। মাসখানেক হল নিজের লাইব্রেরির বইগুলো নাড়াচাড়া করা হয়নি। ডাস্টার দিয়ে ভাল করে বইগুলো ঝাড়পোঁছ করেন। কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে বইগুলোর পরতে-পরতে! র‍্যাক থেকে একটা করে বই টেনে পাতাগুলো ওল্টান। ওঁর নিজের একটা অভ্যেস ছিল, বইয়ের প্রথম পাতায় কেনার তারিখ আর নিজের নাম সই করা। এটা-ওটা দেখতে দেখতে র‍্যাকের পিছনের দিকে থাকা একটা বই পড়ে যায়। অনিমেষ তুলে দেখেন, কলেজজীবনে কেনা একটা কবিতার বই। 'ফিরে এসো চাকা'। বইটা ওল্টাতে গিয়ে হাতে এসে যায় লাল হয়ে যাওয়া পাতায় কালির কলমে লেখা একটা চিঠি। কলেজজীবনে পাওয়া প্রেমপত্র। মধুছন্দার লেখা। চিঠিটা এর আগেও বহুবার পড়েছেন অনিমেষ, আবারও পড়তে ইচ্ছে করে। কলেজের সেই আবেগ যেন ফিরে এসেছে। ভুল-বোঝাবুঝি হয়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল সম্পর্কটা। অনিমেষেরও ইগো কম ছিল না। হয়তো নিজে গিয়ে কথা বললে সেদিন সব ঠিক হয়ে যেত। হয়তো আজ অনিমেষের ঘরণী হত এই পত্রলেখিকা। কিন্তু না, অনিমেষ সেদিন একবারের জন্যও মুখ ফেরাননি। চিঠিটা হাতে পেয়ে এক ঝলকে অতীতের অনেক কথাই পর পর উঠে এসেছে অনিমেষের মনে। কেমন আছে এখন মধুছন্দা? শেষ মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তনীদের অনুষ্ঠানে এক ঝলক দেখা হয়েছিল মধুছন্দার সঙ্গে। ফোন নম্বরও নিয়েছিল সেদিন। আজ মধুছন্দাকে বড় দেখতে ইচ্ছে করছে। ফোনটা খুলে মধুছন্দার নম্বরটা একবার দেখে নেন। কিন্তু কী প্রসঙ্গে দেখা করতে বলবেন ওকে! সামনে অবশ্য ডাক্তারি অ্যাসোসিয়েশন ফোরামের প্রোগ্রাম আছে। মধুছন্দাও তো প্রাক্তনী। ওকে কিছু দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারে ডাকাই যায়। এ কথা সে কথা ভাবতে ভাবতে মধুছন্দার নম্বরে ফোন করেন। বলেন, ''মধুছন্দা, আমি অনিমেষ মুখোপাধ্যায় বলছি। আশা করি চিনতে পারছ!'' হঠাৎ আনএক্সপেক্টেড ফোন পেয়ে মধুছন্দা একটু অবাক হয়ে যান। তারপর মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কাজের কথা বলতে, বুঝতে পারেন। বলেন, ''হ্যাঁ অনিমেষদা, বলো।'' অনিমেষ ভণিতা না করে সরাসরিই বলেন, ''মধুছন্দা, আজ বিকেলে একবার রাজারহাট কফি হাউসে দেখা করতে পারবে?'' এত শর্ট নোটিসে সাধারণভাবে মধুছন্দা দেখা করেন না। কিন্তু অনিমেষদার ফোনে একবারেই রাজি হয়ে যান।

রাজারহাট কফি হাউস। বসে কফি খাওয়া, আড্ডা মারা, প্রেম করার আদর্শ জায়গা। অনিমেষ আজ নির্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট আগেই এসেছেন। গাড়ি থেকে নামার আগে নিজের মুখটা একবার গাড়ির আয়নায় দেখে নেন। প্রায় ত্রিশ বছর পর এভাবে একান্তে দেখা হবে মধুছন্দার সঙ্গে। কফি হাউসের মেন দরজাটা খুলে অনিমেষ ভিতরে ঢুকে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতেই মোবাইলটা বেজে ওঠে। ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে মধুছন্দার কণ্ঠস্বর, ''অনিমেষদা, তুমি সোজা এগিয়ে বাঁদিকের টেবলে এসো, আমি অপেক্ষা করছি।'' অনিমেষ এগিয়ে যান। হ্যাঁ ঠিক, বাঁদিকের একটা টেবলের কোনায় বসে আছে মধুছন্দা। এক ঝলকেই ওকে চেনা যায়। চুলের স্টাইলটা বদল করেনি। সেই স্টেপ কাটই আছে। তবে চেহারাটা একটু ভারিক্কি হয়েছে। অনিমেষ দূর থেকে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ দেখেন মধুছন্দাকে। মনে পড়ে মধুছন্দার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার দিনটা। সেদিন অবশ্য অনিমেষ খুব ডাঁটিসে মধুছন্দার সামনে এসে বসেছিলেন। মধুছন্দা বেচারি প্রথমদিন নিজের মনের কথা বলতেই পারেনি। কিছু নোটসের ব্যাপারে আমতা আমতা করে কথা বলে চুপ করে গিয়েছিল। প্রথমদিনটা খুব রেলিশ করে উপভোগ করেছিলেন অনিমেষ। তারপর সম্পর্কটা গভীর থেকে গভীরতর হয়েছিল। কিন্তু অনিমেষের ইগোর কারণে, গোঁয়ার্তুমির জন্যই সম্পর্কটা খুব বাজেভাবে শেষ হয়ে যায়। আজ লাল পাড় দেওয়া সাদা সিল্কের শাড়ি পরে এসেছে মধুছন্দা। আগের চেয়ে এখনই যেন বেশি ভাল লাগছে ওকে।

''কেমন আছ মধু?'' তিরিশ বছর আগে অনিমেষ এই নামেই ডাকত মধুছন্দাকে। মধুছন্দা একবার তাকায় অনিমেষের দিকে। বহুদিন পর মধু ডাকটাই যেন মরম ছুঁয়ে গেল মধুছন্দার। ''ভাল আছি অনিমেষদা। তুমি কেমন আছ? তোমার চেহারাটা একটু খারাপ লাগছে।'' অনিমেষ বলেন, ''আর যা কাজের চাপ! মাথা তোলার সময় পাই না। শোনো না, এবার কিন্তু আমি অ্যাসোসিয়েশনের অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নিতে পারব না। ওই সময় আমাকে বাইরে যেতে হবে। তোমাকে আর সেক্রেটারি রজত চট্টোপাধ্যায়কে সবটা দেখতে হবে।'' ''কোথায় যাচ্ছ?'' মধুছন্দা বলে ওঠেন। অনিমেষ বলেন, ''এখনও সব ঠিক হয়নি, তবে আমি ওই সময় থাকতে পারব না মনে হয়।'' মধুছন্দা আর কিছু বলে না। এর মধ্যে কফি এসে যায়। অনিমেষ মধুছন্দার দিকে তাকিয়ে আছে। একবার ভাবে সত্যি কথাটা কি বলে দেবে মধুছন্দাকে! আজ কেন ওকে ডেকেছে? তারপর ভাবে, থাক। অকারণ কারও সিমপ্যাথি পেতে চায় না অনিমেষ। তবে আজকে মধুছন্দার সঙ্গে কথা বলে ওর মন অনেকটা হালকা হয়েছে। এটাই হয়তো মধুছন্দার সঙ্গে শেষ দেখা। কফিশপের বিলটা মধুছন্দা দিতে গেলে, ওর হাত ধরে অনিমেষ। মধুছন্দা লাজুক দৃষ্টিতে তাকায় অনিমষের দিকে। এখনও হাতটা আগের মতোই নরম আছে মধুছন্দার। ''এবার তবে ওঠা যাক, কী বলো মধু।'' পকেটে হাত দিয়ে উঠে দাঁড়ায় অনিমেষ। মধুছন্দা তখনও চেয়ারে বসে। অনিমেষের দিকে তাকিয়ে বলে, ''আর একটু বোসো না অনিমেষদা।'' অনিমেষেরও বসতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু এভাবে আর জড়িয়ে পড়া যাবে না। একবার তো কষ্ট দিয়েছে মধুছন্দাকে। আর না হয় না-ই বা দিল! অনিমেষ বলেন, ''না গো, আজ তাড়া আছে। পরে আবার দেখা হবে কোনওদিন কোথাও।'' অনিমেষ উঠে যায়। মধুছন্দা চুপ করে বসে থাকে।

পর্ব -৪

খবরের কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দেন অনিমেষ। খুব ক্লান্ত লাগছে। পকেটের ফোনটা বের করে দেখেন, দেবাশিস বহুবার ফোন করেছিল। রিং ব্যাক করেন। দেবাশিস বলেন, ''অনিমেষ, তোকে দু'একদিনের মধ্যেই দিনসাতেকের জন্য হসপিটালে ভর্তি হতে হবে। কিছু টেস্ট করিয়ে মৈনাক দুবে তোর ট্রিটমেন্ট শুরু করতে চান।'' ''বুঝতে পেরেছি,'' বলেন অনিমেষ। ''তবে এটা সামনের সপ্তাহে করা যায় না? আমার নিজের কিছু কাজ বাকি আছে, সেগুলো না করে আমি শয্যাশায়ী হতে চাই না।'' ''দেখ এগুলো কিন্তু বেশিদিন ফেলে রাখার বিষয় নয়। তোর কন্ডিশন কেমন, তুই কি বুঝতে পারছিস না?'' দেবাশিস বেশ জোরের সঙ্গেই বলে ওঠেন।

খাটের মাথার দিকে একটা শো-কেসে কয়েকটা ফাইল রেখেছিলেন। ফোনটা রেখে সেগুলো অনেক কষ্টে টেনে বের করেন অনিমেষ। একটা অসমাপ্ত বইয়ের কাজ শেষ করে যেতে হবে। না হলে ওঁর এত বছরের অভিজ্ঞতা সব নষ্ট হয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে চিরতরে। ফাইলের পাতাগুলো একটার পর

একটা ওল্টাতে থাকেন অনিমেষ। পঞ্চাশ বছরের কেস হিস্ট্রি এবং কীভাবে রোগীকে বাঁচানো সম্ভব, সেই নিয়ে বিস্তারিত বইয়ের কাজ শুরু করেছিলেন। সবটা শেষ করতে পারেননি এখনও। পর পর বছর ধরে রোগীর নাম, রোগ, চিকিৎসাপদ্ধতি এক এক করে লেখা। বছর ছয়েক আগে একটি ছেলের চিকিৎসা করেছিলেন। বহু জায়গায় ট্রিটমেন্ট করিয়েও সে যখন ভাল হচ্ছিল না, শেষে অনিমেষের কাছে দেখায়। মাসছয়েকের মধ্যে অনিমেষ ছেলেটিকে সুস্থ জীবন দেন। সে সময় ছেলেটির বাড়ির আর্থিক অবস্থা একেবারে ভাল ছিল না। ছেলেটি ডাক্তার হতে চায় শুনে বিনা খরচে সেদিন ওর চিকিৎসা করেছিলেন। তখন ছেলেটি জয়েন্ট দেবে। অনিমেষকে প্রণাম করে বলেছিল, ‘‘আশীর্বাদ করবেন ডাক্তারবাবু, যেন আমি আপনার মতো ডাক্তার হতে পারি।’’ ছেলেটির কথা আজ বড় মনে পড়ছে অনিমেষের।

‘‘দাদাবাবু, টেবলে খাবার দিয়েছি। খেয়ে যান,’’ দীপা ডাইনিং থেকে বলে। বিছানা থেকে নামতে গিয়ে মাথাটা হঠাৎ ঘুরে যায় অনিমেষের। শরীরে যেন কোনও শক্তি নেই। কাল রাত অবধি ডাইনিংয়ে বসেই খেয়েছেন। তবে সেভাবে তো খেতে পারছেন না অনিমেষ। একটু সুপ, ফ্রুট জুস এইটুকু কোনওমতে গলায় ঢালছিলেন এই ক’দিন। সলিড ফুড খেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে খাট থেকে নামতেও পারবেন না। নিজে এমডি হওয়ায় নিজেই অসুখটা ধরা পড়ার পর ট্রিটমেন্ট করছিলেন। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে দেবাশিসের কথা শুনে হসপিটালেই ভর্তি হতে হবে। মাথার কাছে রাখা মোবাইলটা টেনে দেবাশিসকে আবার ফোন করেন অনিমেষ। বলেন, ‘‘শরীরটা বেশ খারাপ লাগছে। বাড়িতে অ্যাম্বুলেন্স পাঠা। আমি হসপিটালে ভর্তি হতে চাই।’’ ছেলেকে এতদিন সেভাবে কিছু বলেননি। ফোনে রোজই কথা হয়, বাবার শরীরটা খারাপ এটুকুই সে জানে। কিন্তু হঠাৎ নার্সিংহোমে ভর্তি হওয়ার খবরটা পেলে অভীক বেশ আঁতকে উঠবে, সেটা আন্দাজ করতে পারেন। তবু অভীককে পুরোটা বলতেই হবে অনিমেষের। ফোনে অভীকের নম্বর ডায়াল করেন। একবার রিং হতেই অভীক বলে, ‘‘বলো বাবা, কেমন আছ?’’ অনিমেষ সোজাসুজি বলেন, ‘‘অভীক তুই কয়েকদিন ছুটি নিয়ে কলকাতায় চলে আয়। আই অ্যাম সাফারিং ফ্রম ক্যানসার। ভেবেছিলাম হয়তো কেমো নিতে হবে না। কিন্তু শরীরের যা অবস্থা, দেবাশিস কেমো নিতে বলেছে। ওরই সাজেশনে কাল আমি মিস্টার দুবের আন্ডারে ভর্তি হচ্ছি বাইপাসের বেসরকারি হাসপাতালে।’’ ফোন রেখে দীপাকে ঘরে ডাকে অনিমেষ। বলে, ‘‘আমার গার্লফ্রেন্ডকেও একটু সঙ্গে এনো।’’ দীপা মেয়েকে নিয়ে ঘরে ঢুকে দ্যাখে, অনিমেষকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে। বলে, ‘‘আপনার কী হয়েছে কাকাবাবু?’’ অনিমেষ বলেন, ‘‘শোনো দীপা, আমি ক’দিনের জন্য হসপিটালে ভর্তি হব। তুমি আর কেয়ারটেকার মিলে সব দেখাশোনা কোরো। অভীক মনে হয় ক’দিনের মধ্যেই চলে আসবে। তোমরা সাবধানে থেকো।’’ দীপা এবার কেঁদে ফেলে। মাকে ওভাবে কাঁদতে দেখে ভয়ে কুঁকড়ে যায় মেয়েটি। অনিমেষ বাচ্চাটিকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, ‘‘আমি ক’দিনের জন্য একটু ঘুরতে যাচ্ছি, মাকে বিরক্ত কোরো না কিন্তু।’’ মেয়েটি ম্লানমুখে বলে, ‘‘তবে আমার গানটা কবে শোনাবে দাদান?’’ অনিমেষ মেয়েটির মাথায় হাত রেখে বলেন, ‘‘হ্যাঁ, ওই একটা বড় কাজ আমার বাকি থেকে গিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি শোনাব দিদিভাই।’’

পর্ব-৫

বাইপাসের ধারের বড় নার্সিংহোমের বিছানায় শুয়ে আছেন অনিমেষ। আজ থেকে কেমো শুরু হবে। তার আগে গত কয়েকদিন ধরেই বিভিন্নরকম টেস্ট হয়েছে। উনি যে ঘরটায় আছেন, সেটাকে একটা প্রাইভেট সুট বলা যায়। অনিমেষ যদিও বলেছিলেন এত দামি ঘরে ওঁকে রাখার দরকার নেই। কিন্তু দেবাশিস শোনেনি। অনিমেষের শরীরে সুচ ফোটাতে ভীষণ ভয়। কখনও কি ভেবেছিলেন, যে মানুষ এত বছর ধরে হাজার হাজার লোকের চিকিৎসা করে এসেছেন, তাঁকে আজ এভাবে নার্সিংহোমের বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে? কেমোথেরাপি ব্যাপারটা ভালই জানেন অনিমেষ। ভেন দিয়ে ওষুধগুলো পুশ করা হবে। তারপর তার যা প্রতিক্রিয়া, সেটা সামলে উঠতে পারলে দ্বিতীয় কেমো শুরু হবে। ঘরের এসি-টা একটু কমানো দরকার। অ্যাটেন্ডেন্ট মেয়েটি এলে ওকেই বলতে হবে। আর একটা খাতা-কলম চেয়ে নিতে হবে। এভাবে শুয়ে থাকাটা খুব বোরিং।

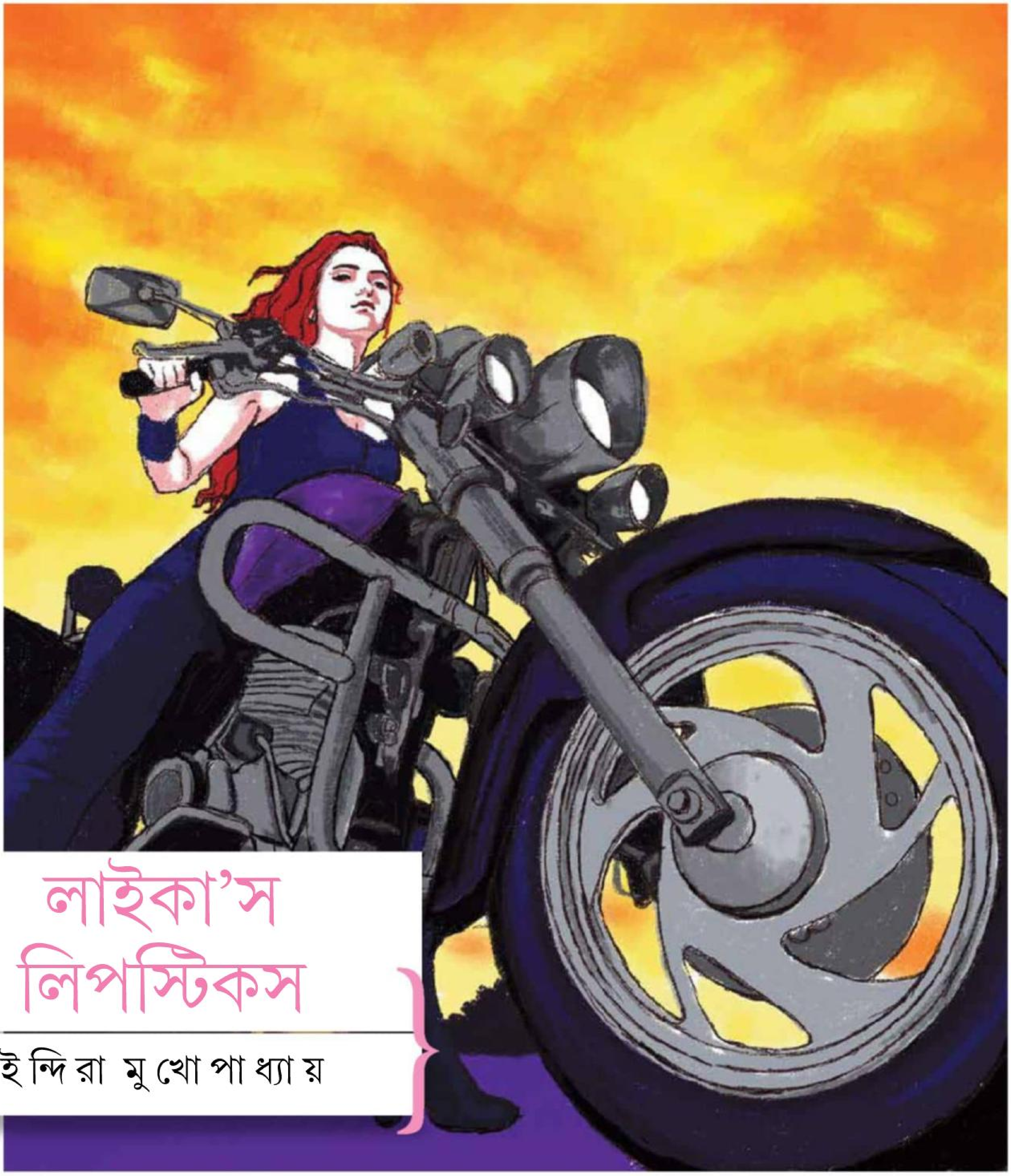
ঘরের চাপা দরজা ঠেলে কেউ ভিতরে ঢুকে আসে। অনিমেষ প্রথমে বুঝতে না পারলেও অচিরেই চেহারাটা চিনতে পারেন। মধুছন্দা ঢুকে আসছেন দরজা ঠেলে। অনিমেষের ভর্তি হওয়ার খবরটা তবে মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন জেনে গিয়েছে। মধুছন্দা ধীরগতিতে এসে অনিমেষের পায়ের দিকে রাখা চেয়ারে বসেন। তারপর অভিমানের সুরে বলেন, ‘‘আমাকে সেদিন একবারও বললে না অনিমেষদা? একবারও বললে না!’’ অনিমেষ কথা ঘোরান। বলেন, ‘‘তুমি কেমন আছ বলো? প্রোগ্রামের কাজ সব ঠিকমতো এগোচ্ছে তো!’’ মধুছন্দা মাথা নিচু করে বসে থাকেন। অনিমেষ অনুভব করেন, ওঁর দু’চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। ‘‘দ্যাখো মধু, জীবনের যে ক’টা দিন হাতে আছে, সে সময়টুকু আমি সম্পূর্ণভাবে আনন্দে থাকতে চাই, উপভোগ করতে চাই। এ সব কান্নাকাটি বন্ধ করো। বরং কিছু কনস্ট্রাক্টিভ কথা বলো, শুনি। মনটা একটু অন্যরকম হোক। তবে তুমি যে খবরটা পেয়ে দৌড়ে এসেছ, তাতে বুঝতে পারি আমার প্রতি তোমার ভালবাসা একটু হলেও আছে। একেবারে ফুরিয়ে যায়নি।’’ কথাটা বলে হাঁপিয়ে ওঠেন অনিমেষ। মধুছন্দা অনিমেষের মাথার কাছে গিয়ে বসে, তারপর অনিমেষের হাত দুটো ধরে বলে ‘‘তুমি কখনওই আমায় বুঝতে পারোনি অনিমেষদা। আমি চিরকাল তোমারই ছিলাম।’’ অনিমেষের ঠোঁটের কোনায় নরম হাসির রেখা ফুটে ওঠে। বলেন, ‘‘এই কথাগুলো যদি কিছু বছর আগে নিজে থেকে এসে বলতে মধু, ভাল হত। ঠিক আছে, বেটার লেট দ্যান নেভার।’’ কথা শেষ হতে না হতেই দু’জন নার্স ঘরে এসে ঢোকে। সঙ্গে ডাক্তার দুবে। ‘‘চলুন ডা. মুখোপাধ্যায়, এবার আপনাকে তো একটু শুয়ে পড়তে হবে। ইন্ট্রাভেনাস চালু করব।’’ মধুছন্দা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়েন অনিমেষ। নিডলগুলো শিরায় ঢোকানোর সময় অনিমেষ চোখ দুটো বন্ধ করে ফেলেন। অন্ধকারে একে একে কতগুলো মুখ ভেসে উঠতে থাকে। প্রথমেই যে মুখটা মনে পড়ে, সেটা কখনও আশা করেননি অনিমেষ। ছেলেবেলার এক বন্ধুর মুখ। তার সঙ্গে তো গত কুড়ি বছর কোনও যোগাযোগই নেই। অথচ কীভাবে যে ওই মুখটাই ভেসে এল, কে জানে! তারপর মনে আসে দীপার ছোট্ট মেয়েটার কথা। তাকে একটা গান শোনাতে হবে।

অভীকের আজ দিল্লি থেকে আসার কথা। ওকে কিছু জিনিস বুঝিয়ে দিতে হবে। ভাবতে ভাবতে শরীরটা অসাড় লাগে অনিমেষের। ওষুধ শরীরে ধীরে ধীরে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে তবে। চোখটা আর খোলার চেষ্টা করেন না অনিমেষ।

পর্ব-৬

কাল রাতে বাবাকে নার্সিংহোম থেকে বাড়ি নিয়ে এসেছে অভীক। রাতে বাবা একদম কিছু খেতে পারেননি। ঘুম থেকে উঠেই বাবার ঘরের দিকে এগিয়ে যায় সে। ঘড়িতে ছ’টা বাজে। বরাবর বাবা ভোরবেলাতেই ওঠেন। বারান্দার দিকের কোণের ঘরটা বাবার, তার ঠিক পাশের ঘরে বাবার স্টাডি। তার পাশে অভীকের ঘর। করিডোর দিয়ে এগোতেই অভীক দ্যাখে, বাবার স্টাডিরুমে আলো জ্বলছে। অভীক দাঁড়িয়ে পড়ে। তার মানে বাবা কি সকাল থেকে লেখার কাজ শুরু করে দিয়েছেন! এই শরীরে এত স্ট্রেস নেওয়া কি ভাল? ভীষণ বিরক্ত লাগে অভীকের। তাড়াতাড়ি দরজা ঠেলে মাথা ঢুকিয়ে দ্যাখে, যা ভেবেছে ঠিক তাই। বাবা মাথা গুঁজে রয়েছেন স্টাডিরুমের টেবলে। ‘‘কী ব্যাপার বাবা, কী করছ এই শরীরে?’’ অভীক ডাকে। তারপর ভিতরে ঢুকে বাবার গায়ে হাত দিতেই বাবার হাত লেগে পাশে রাখা টেপরেকর্ডারটা চলতে শুরু করে। এ তো বাবারই গলা! বাবা গান গাইছেন, ‘যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে’। অভীক ঠিক বুঝতে পারে না। ‘‘বাবা,’’ বলে আর একবার ঠেলা দিতেই বাবার নিথর দেহ চেয়ারে ঢলে পড়ে। অনিমেষের হাতের চাপে রেকর্ডারটা অন হয়ে গিয়েছিল। অনিমেষের উদাত্ত কণ্ঠস্বর সারা বাড়ি জুড়ে ভেসে বেড়ায়। দীপার পাঁচ বছরের মেয়ে মিতুল দৌড়ে ঘরে ঢুকে অনিমেষকে জড়িয়ে ধরতে এগিয়ে গিয়েও থমকে যায়। গানটা অর্ধেক হয়ে থেমে যায়।

অলংকরণ: কুনাল বর্মন



লাইকা'স লিপস্টিকস

ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়

নদীর ধারে বিশাল এক টাউনশিপ। অত্যন্ত সফিস্টিকেটেড আর হাইটেক ব্যাপারস্যাপার সেখানে। মহানগরের মধ্যেই বেশ বড়মাপের উপনগরী চন্দ্রপলিস। মোটের উপর শিক্ষিত ধনী লোকজনেরই বাস সেখানে। তাদের জীবনযাত্রার বেশিরভাগটাই যন্ত্রচালিত। এখানকার আবাসিকদের বাইরে বেরতে তেমন হয় না। টাউনশিপের চৌহদ্দিতেই তাদের নিজস্ব ব্যাংক, শেয়ার ট্রেডিং কোম্পানি, অতি আধুনিক হাইটেক ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম, মোটর সাইকেলের শোরুম, অটোমোবাইল ডিলারশিপ। থরে থরে চোখ জুড়োনো শিল্পাঞ্চল। মানে চন্দ্রপলিসের ভিতরটা যেন স্বর্গপুরী। নিখুঁতভাবে সাজানো-গোছানো এই চন্দ্রপলিস রাতের আঁধারে নিয়ন আলোর রোশনাইয়ে ঝলমল করে।

পুরো চন্দ্রপলিস তিনভাগে বিভক্ত, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্ল্যানড আর্কিটেকচারের আওতায়। একটি কমার্শিয়াল বা বিজ়নেস জ়োন। আর-একটি হল শিল্পাঞ্চল বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জ়োন। অন্যটি রেসিডেনশিয়াল জ়োন আর তার লাগোয়া এন্টারটেনমেন্ট বা রিক্রিয়েশনাল জ়োন। শিল্পাঞ্চলের মধ্যে রোবোটিকস্ কারখানায় দিনভর নানারকম প্রোডাকশন চলতেই থাকে। সুপার-স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল, সুইমিং পুল, জিমনেশিয়াম, লাইব্রেরি এমনকী, কেতাদুরস্ত ভাল স্কুলও রয়েছে। ছেলেমেয়েরা ফিটফাট হয়ে সেখানে নিয়মিত যায়। তাদের সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজ়ড ক্লাসরুম। হাতেগোনা কয়েকজন টিচার। বেশিটাই নিয়ন্ত্রণ করে যন্ত্র। নগরীর মধ্যেই ব্যাটারি অপারেটেড সেলফ-ড্রাইভিং বাস চলে।

চন্দ্রপলিসের অত্যাধুনিক যানব্যবস্থা খুবই অভিনব। অটোনোমাস, সেল্ফ-ড্রাইভিং গাড়ি। কিন্তু মানুষও ইচ্ছে করলেই চালাতে পারে। মজার ব্যাপার এই যে, ট্র্যাফিক লাইট বা ট্র্যাফিক পুলিশ নেই। দুটো গাড়ি কাছাকাছি এলেই, সেন্ট্রাল ভেহিকল গাইডেন্স সিস্টেম ৭জি নেটওয়র্ক দিয়ে তা সেন্স করে, স্পিড আর ডিরেকশন কনট্রোল করে। তাই মোড়ে মোড়ে ট্র্যাফিক লাইট নেই, কিন্তু সব গাড়ি কিছুটা সন্তর্পণে অথচ না থেমেই পেরিয়ে যায়! শহরবাসীর গাড়ির বিষয়ে কিছুটা স্বাধীনতা থাকলেও পুরো কন্ট্রোল নেই।
একটু তলিয়ে ভাবলে বোঝা যায় যে এই স্বয়ংক্রিয় গাড়িগুলি যেন চন্দ্রপলিসে বাসিন্দাদের সীমিত স্বাধীনতারই রূপক!
এখানে শপিং মল, মাল্টি কুইজ়িন রেস্তরাঁ, মাল্টিপ্লেক্স, সব মজুত। তবে বেশিটাই রোবট-নির্ভর। মানে রেস্তরাঁয় খাবার অর্ডার করা থেকে মানুষের মুখের সামনে সুখাদ্য হাজির হওয়া, সব করে মেশিন। মেশিনেই সিনেমার টিকিট বেরিয়ে আসে কার্ড সোয়াইপ করলে, আর চেয়ারে বসলেই শুরু হয়ে যায় মাল্টিপ্লেক্স স্ক্রিনের মুভি। এমনকী, নার্সিংহোমে পরিষেবা থেকে লাইব্রেরির বই ধার করা, কোনও কিছুতেই কোনও মানুষকে আর লাগে না সেখানে। ডাক্তারবাবুরা বাড়ি থেকেই রোবটের সাহায্য নিয়ে রিমোট-কন্ট্রোলড ট্রিটমেন্ট শুরু করে দেন। তবে টাউনশিপের সর্বত্র সিসি টিভির কড়া নজরদারি ছাড়াও কে ঢুকছে সেখানে বা কে বেরচ্ছে, তার তদারকি করে রেটিনা স্ক্যানার ও বায়োমেট্রিক মেজ়ারমেন্ট। যন্ত্রের নজরদারিতে পান থেকে এক টুসকি চুন খসলেই ধরা পড়ে যাবে যে কেউ।
এই টাউনশিপের বিশেষত্ব এটাই। যার যেখানে যাওয়ার, তার বাইরে কেউ যাতে যেতে না পারে, এমনই কঠোর নিরাপত্তাবেষ্টনী। টাউনশিপের মধ্যে যে সব অফিস-কাছারি রয়েছে, সে সব অফিসে মানুষকে ঢুকতে হলে, একমাত্র যার বায়োমেট্রিক ওদের সিস্টেমের সঙ্গে ম্যাচ করে, তার জন্যই দরজা খোলে। বিশাল মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং। যার যে ফ্লোরে যাওয়ার কথা, শুধু সেই ফ্লোরেই সে যেতে পারে, কারণ লিফটের মধ্যে ফেস রেকগনিশনের সফটওয়্যার লাগানো।
চন্দ্রপলিসের মানুষ খুব সুখী। তাদের গায়ে কোনওকিছুর আঁচ লাগে না। সেখানে লোকজনের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য এতটাই বেশি আর জীবনযাত্রা এতই যন্ত্রনির্ভর যে, মানুষের উপর নির্ভরশীলতা নেই। তাই পারিবারিক ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা কম। চন্দ্রপলিসের মধ্যে আপাত ক্রাইম, ভায়োলেন্স বা গুন্ডাগিরি তেমন একটা চোখে পড়ে না কারও। দিব্যি ভালই থাকে সকলে।

মহানগরীর মধ্যে এই বিশাল যন্ত্রচালিত শহরের মালিকানা তিনজন প্রধান ব্যক্তির। তাঁদের দ্বারা সুপরিকল্পিত এবং সুপরিচালিত এক কোম্পানি এই চন্দ্রপলিস। এই তিন মহারথী কর্ণধার হলেন তিনজন প্রতাপশালী ব্যক্তি। মিস্টার গুপ্তা নামে এক পঞ্জাবি, রিয়েল এস্টেট ম্যাগনেট। তাঁর সঙ্গে কাজ করেন মিস্টার সান্যাল নামে একজন রিটায়ার্ড হোমরাচোমরা বাঙালি আর্মি অফিসার। যাঁর বিচক্ষণতার কারণে তাঁকে চিফ এগজ়িকিউটিভ করা হয়েছে। আর চন্দ্রপলিস উপনগরী যাঁর ব্রেনচাইল্ড, তিনি হলেন মিসেস চিত্রা সুব্রহ্মণ্যম নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হলেও চন্দ্রপলিসকে এই তিনজনেই মূলত কুক্ষিগত করে রেখেছেন।
মিস্টার গুপ্তার ফোকাস হল রিয়েল এস্টেট। মিস্টার সান্যাল হলেন দক্ষ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। আর মিসেস চিত্রা সুব্রহ্মণ্যম হলেন একজন টেকনোলজি উইজ়ার্ড, যাঁর পরিকল্পনা এবং দক্ষতার জন্যই চন্দ্রপলিস ক্রমে এক হাইটেক নগরী হয়ে উঠেছে। এঁরা তিনজনই এখানে সব। রাজনৈতিক প্রভাবশালী নেতাদের কোনও জায়গা নেই চন্দ্রপলিসের মধ্যে। চন্দ্রপলিসের বাইরে সারা দেশ জুড়েই রাজনীতির মারপ্যাঁচ এখনও অল্পবিস্তর রয়েছে বটে। কিন্তু বর্তমানে চন্দ্রপলিসের সবটাই নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এই পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি।
জায়গাটির নাম 'চন্দ্রপলিস' রেখেছেন মিস্টার গুপ্তা। মোদ্দা কথা হল, এখানে এক আকাশের নীচে, চাঁদের আলোয়, সূর্যের আলোয়, প্রকৃতির কোলে লোকজন সুখেই আছে। দিব্য চলছে তাদের যন্ত্রনির্ভর হাইটেক এবং হাইএন্ড জীবনযাপন।

এর বাইরে রয়েছে মূল মেট্রোপলিসের বিশাল আউটস্কার্টস বা ঝুপড়ির মতো বসতি। যেমন সব বড় শহরেই থাকে আর কী।
বাইরের লোকজন চন্দ্রপলিসের ভিতরে প্রবেশ করে মাত্র দু'একটা কাজের জন্য। এখানে প্রাইভেট গাড়ি বা বাস চালাতে ড্রাইভার লাগে না, কারণ ব্যাটারি-অপারেটেড গাড়ি নিজেই পথনির্দেশ বুঝে ভিতরে, বাইরে নিয়ে যায় মানুষকে। যন্ত্র দিয়ে যে সব কাজ হয় না, তেমন কিছু বেসিক কাজ করার জন্য কিছু স্টাফ নিয়মিত আসে রেসিডেনশিয়াল কমপ্লেক্সে। হাতেগোনা কয়েকজন চন্দ্রপলিসের মধ্যে একটি মিডিয়া এবং মার্কেটিং কোম্পানিতে চাকরি করে। এ সব কাজ অতি সাদামাটা। হাইটেক কাজ সব করে রোবট।
প্রয়োজন ছাড়া চন্দ্রপলিসে এমন কাজের লোকেদের ঢোকার কোনও অধিকার নেই। কারণ রোবটের যুগে আনস্কিল্ড লেবারের দরকার ফুরিয়েছে। সব কাজ মেশিনে হয়। সেই নিয়ে বাইরের ঝুপড়ির লোকজনের বেশ ঈর্ষা এবং ক্ষোভ। অনেকদিন ধরেই তারা এ সব হজম করছে, করেই চলেছে। পারলে হাইটেক বাবুদের নখে টিপে মেরে ফেলতেও দ্বিধা করবে না তারা।
যখন চন্দ্রপলিস গড়ে উঠেছিল, ওই মানুষজন ভেবেছিল প্রচুর কাজের সুযোগ আসতে চলেছে। তাদের ঝুপড়ির লোকজনের জীবনযাত্রায় বুঝি নতুন করে জোয়ার আসবে। আর্থিক উন্নতি হবে। সকলেই যেমন স্বপ্ন দেখে আর কী।
কিন্তু যান্ত্রিক সভ্যতায় পুষ্ট পরিকল্পিত চন্দ্রপলিসের মতো হাইটেক স্থানে এইসব মানুষদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তাই ঝুপড়িবাসীর মনের মধ্যে কাজ পাওয়া নিয়ে চাপানউতোর তো আছেই।
মিস্টার গুপ্তা, মিস্টার সান্যাল আর মিসেস চিত্রা সুব্রহ্মণ্যম... এঁরা তিনজন নিজেদের পরিকল্পনামাফিক গঙ্গার ধারে এমন সুন্দর এক টাউনশিপ গড়তে পেরে মনে মনে ধন্য। তাঁরা সাড়া ফেলে দিয়েছেন রীতিমতো। মিডিয়ার মাধ্যমে সুপরিচিত, প্রথম এক হাইটেক টাউনশিপ হিসেবে চন্দ্রপলিস ইতিমধ্যেই খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। দেশের মধ্যবিত্তরা উচ্চবিত্তদের এহেন জীবনযাপনে একটুআধটু নাক কোঁচকালেও দেশের সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছেলেপুলেরা নিজেদের কোয়ালিটি আর এবিলিটি অনুযায়ী পছন্দের কাজ পেয়ে ধন্য। দেশের বিভিন্ন কোণ থেকে এই নতুন প্রজন্মের সমমনস্ক কমপিটেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, শিক্ষক, জার্নালিস্ট মাইগ্রেট করে চলে আসাতেও কোয়ালিটি লাইফস্টাইল গড়ে উঠেছে সেখানে।

ফ্রান্সে একটি কথা চালু আছে 'নোয়ার' (Noir) নামে। এর অর্থ হল ডার্ক। শহরের মধ্যেই গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে থাকে এই নয়ারের মানুষজন। ঠিক অন্ধকার জগতের লোকজন নয় এরা। আবার খুব স্বচ্ছতাও নেই এদের। শহরের বাকি লোকেদের থেকে দূরত্ব রেখে চলে তারা। অন্যথায় সমাজের বাকি লোকেরাই তাদের মূলধারা থেকে ব্রাত্য করে রাখে। এই লোকজনদের নিজস্ব কিছু স্ট্র্যাটেজি থাকে। ওদের হাবভাব, পোশাকআসাক, চালচলন আম আদমির চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুখের ভাষা অত্যন্ত খারাপ এবং রূঢ়। প্রকাশ্যে হাতে অস্ত্র নিয়ে ঘোরাফেরা করতেও বাধে না এদের। ঠিক ক্রিমিনাল বলা চলে না এদের, তবে একটা আলাদা, নিজস্ব জগৎ রয়েছে। সেই জগতে ঘোরাফেরা ওদের কেমন

যেন একঘরে করে রাখে। সেটাও ওদের ঠিক পছন্দ নয়। ঝুপড়িতে থাকা নিম্নবিত্তই হোক কিম্বা চন্দ্রপলিসের উচ্চবিত্ত, কারওর সঙ্গেই যেন এই নয়ারের লোকজনদের ওঠাবসা নেই তেমন।

চন্দ্রপলিসের বাইরে কিছু বিশেষ ছেলেপুলের আনাগোনা। তাদের হাবভাব, চেহারা, শরীরের ভাষা, মুখের ভাষা, সাজপোশাক— সবই বাকি লোকেদের চেয়ে সব সময়ই আলাদা। তারা যেন সাধারণ মানুষদের চেয়ে আলাদাই ক্যাটিগরিতে পড়ে। তাদের সর্বাঙ্গে বিচিত্র ট্যাটু করা। চুলে রংবেরঙের স্ট্রিক্স। মেয়েরা লম্বা চুলে গুচ্ছ গুচ্ছ রঙিন বিনুনি বেঁধে ঘোরে। নাকে, কানে, নাভিতে ফুটো করে সেখানে টুকটাক স্লিক গয়না ঝোলায় তারা। চোখেমুখে বেশ রুক্ষতা প্রকট তাদের। ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে মোটরবাইক নিয়ে, সাইলেন্সর না লাগিয়ে বিকট শব্দ করে রুদ্ধশ্বাসে রেসিং করে বেড়ায়। জানান দেয় যেন, আমরা আছি, ভুলে যাস না ব্যাটা। তাদের হাতে মাঝেমধ্যে বন্দুকও দেখা যায়। ছেলেগুলোর চেয়ে মেয়েগুলো আরও রাফ অ্যান্ড টাফ। বয়ফ্রেন্ডদের নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকে। এবং তা বহু ডেসিবেল অতিক্রম করে ফেলে প্রায়শই। লাইকা হল এই নয়ারের তেমনই এক মেয়ে।

চন্দ্রপলিস গঙ্গার ধারেই। তাই তার আওতায় নদীর বেশ কয়েকটি ঘাট পড়ে। সেগুলোকে সুন্দর করে বাঁধিয়ে, বেশ মনোমুগ্ধকর পরিবেশ তৈরি করে রেখেছে চন্দ্রপলিস কোম্পানি। মানুষের যে কাজগুলো নিজেকে করতেই হয়, মানে পূজাপার্বণ, বারব্রত, যেগুলো তাদের নিজের সংস্কার, সে সব বাঁচিয়ে রাখার জন্যই এই প্রচেষ্টা মিস্টার গুপ্তার। সেই সঙ্গে পাবলিকের ঘুরে বেড়ানোর মনোরম জায়গাও বটে। সেখানেও রয়েছে কড়া যান্ত্রিক নজরদারি। ঘাটের সিঁড়িতে কেউ নামলেই পাশ থেকে রোবটের অ্যাসিস্ট্যান্স পাবেন তিনি। যাতে কেউ পা পিছলে নদীর মধ্যে না পড়ে যান অথবা বেঘোরে না তলিয়ে যান। কেউ না ডুবে মরে সুইসাইড করে।
গুপ্তাজি, চিত্রা আর সান্যাল... এই তিনজনের বহুদিনের ইচ্ছে ছিল নিজের মতো করে, আধুনিক প্রযুক্তিতে একেবারে ফর্টিফায়েড এমন এক কর্পোরেট উপনগরী গড়ে তোলার। নদীর ধারে আরও কিছুটা জায়গা ঢুকিয়ে নিয়ে, সেটাকে টাউনশিপের আওতায় আনতে চান তারা। নদীর ধার থাকার জন্য বেশ জনপ্রিয় জায়গা। আধুনিককালে মানুষ এখন এমন জায়গায় থাকতে চাইছে। সেটাই বর্তমান প্রজন্মের ট্রেন্ড। কিন্তু নদীর ধারের সেই ঝুপড়ির মানুষজন কিছুতেই জায়গা ছাড়তে নারাজ। সংঘাতের সূত্রপাত সেখান থেকে। কিন্তু চন্দ্রপলিস কোম্পানির প্রচণ্ড টাকার জোর। তাই তারা এই মানুষগুলোকে যেনতেন প্রকারেণ বিতাড়িত করে সেই জমিটা কব্জা করে নিতে সক্রিয়, বাকি শহরের খোলনলচে বদলের আশায়। প্রসারিত হবে চন্দ্রপলিস। সেইসঙ্গে হবে আরও শিল্পায়ন এবং প্রযুক্তিবিদদের আগমন।
চন্দ্রপলিসের বাইরে ঝুপড়ির লোকজনেরা নিজেদের মতো করে বেঁচে আছে ঠিকই, কিন্তু আবার সেই বিশেষ ছেলেপুলের নয়ার গ্যাংকেও তারা ঠিক সহ্য করতে পারে না। সেটা তাদের হাবেভাবেই বোঝা যায়। খিটিমিটি লেগেই থাকে। এত উগ্র ব্যবহার সেই ছেলেপুলেদের যে, তাদের ভয়ে তঠস্থ থাকে ঝুপড়ির আম আদমি। এই গ্যাঙের নেত্রীই হল বছর তিরিশের মেয়ে লাইকা। খুব রুক্ষ, ঝগডুটে, একফোঁটা কমনীয় নয় তার হাবভাব, চালচলন। বেশ রহস্যময়তায়, ঘোর অন্ধকারে মুড়ে রাখে নিজেকে সেই নয়ার পরিবেশে।

বস্তির এক মস্তান আছে, ভিকি। সে এবং আরও কয়েকজন নিম্ন মধ্যবিত্ত কোনওমতে নিজেদের গ্রাসাচ্ছাদনটুকু চালায় সংসারের জন্য। তবে এই চন্দ্রপলিসের ক্রমাগত বাড়বাড়ন্ত এবং কর্পোরেট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে একদিন সোচ্চার হয় ভিকি। কিছু করতে না পেরে অগত্যা সে একদিন লাইকার সঙ্গে দেখা করতে যায়। লাইকা কেত মেরে ভিকির সঙ্গে আলাপ জমাতে থাকে। ভিকি লাইকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাকে জানিয়েছে ঝুপড়ির মানুষের রাগের কথা।
"চন্দ্রপলিসের হাত থেকে যেমন করেই হোক আমাদের এই বস্তিকে বাঁচাতেই হবে লাইকা।"
লাইকাও সে কথা বুঝে ভিকিকে বলে উঠেছে, "অ্যাদ্দিনে আমায় মনে পড়ল তবে! সব শালা স্বার্থপর!"

তলে তলে প্ল্যানিং শুরু হয়ে যায়। চন্দ্রপলিসের এই আগ্রাসন থেকে ঝুপড়িবাসীদের মুক্তি দেওয়ার ব্লু-প্রিন্ট ছকে ফেলে লাইকা। একটা বিষম আঘাত হানতে হবে। ব্যাটা গুপ্তা! তুই তো আর্মি অফিসার সান্যালের দয়ায় নিজে খুব হাইফাই জীবনযাপন করে থাকিস তোর সাধের চন্দ্রপলিসের মধ্যে। এবার দেখি কী করে তোর এত ঠাটবাট বজায় থাকে! আর ওই সাগরেদ সান্যাল আর ট্যাম-ব্রাম চিত্রা! শহরটাকে নয়ছয় করছে এক্কেরে! খুবলেখাবলে সব ঢোকাবি তোরা চন্দ্রপলিসের মধ্যে? শহর কি তোর, নাকি তোর বাবার?

তলে তলে প্ল্যানিং শুরু হয়ে যায়। চন্দ্রপলিসের এই আগ্রাসন থেকে ঝুপড়িবাসীদের মুক্তি দেওয়ার ব্লু-প্রিন্ট ছকে ফেলে লাইকা। একটা বিষম আঘাত হানতে হবে।



প্রতিবছর জন্মাষ্টমীর দিন গুপ্তা তাঁর শ্রীধর মাধবের অষ্টধাতুর মূর্তি মাথায় নিয়ে ধুমধাম করে গঙ্গায় স্নানে বেরন। গুপ্তার বিশ্বাস, এই টাউনশিপ শ্রীধরের দয়ায়। চন্দ্রপলিসের এত রমরমা সবকিছুই তাঁর আশীর্বাদে।

(২)
চন্দ্রপলিসে একবার ঢুকলে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির জালে ফেঁসে যাবে না তো? সেই ভয় আছে লাইকার। সেখানে ঢোকাও যেমন শক্ত, আবার বেরিয়ে আসাও দুষ্কর। কিন্তু এমন একটা কাণ্ড ঘটাতে হবে যাতে সেখানকার মানুষজন তথা চন্দ্রপলিসের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও রীতিমতো ভয় পায়। নড়েচড়ে বসে। "শালা ফাটিয়াল প্রযুক্তিবিদ সব!" আওড়ে ওঠে লাইকা।
এর মধ্যে ভিকি লাইকাকে জানায় চন্দ্রপলিসের মধ্যে মোটরবাইক শোরুমে তার চেনা একজন মেকানিকের কথা। সে অনেক আগে তাদের বস্তিতে থাকত।
"ইয়েস!" সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলে ওঠে লাইকা, আত্মপ্রত্যয়ের ভঙ্গিতে।
এরই মধ্যে ভিকি আবার লাইকাকে চন্দ্রপলিস সংক্রান্ত আরও ইন্টারেস্টিং তথ্য দেয়।
"জানো দি? একজন বড়লোক বাবুর লওতে বেটে মাঝেমধ্যেই চুপিচুপি সকলের চোখে ধুলো দিয়ে চলে আসে বাইরে। তুমি হয়তো মুখটা চেনো তার। কারণ সে মোটর সাইকেল রেসিং করে আমাদেরই বস্তির ছেলেদের সঙ্গে। মেকানিক প্রসাদের নাম তার কাছেই শুনেছিলাম আমি। এই প্রসাদ-কে তোমার কাজে লাগাতে পারো কিন্তু।"
লাইকা যেন নিজের মনেই বলে, "শ্লা! সব কাজ কি আর রোবট দিয়ে

হয় রে? কখনও কখনও এই মানুষকেও কাজে লাগে ওদের। আফটার অল মেশিন তো সব। সেই যন্ত্রকে চালনা করার জন্য মেকানিকই ভরসা। বাবুদের অত ডাঁট কোথায় থাকে তখন? তবে পাকা খেলোয়াড় সেই ছেলেটা বল! মালটা কে দেখতে হচ্ছে তবে। নাম্বার দে প্রসাদের।”
ভিকি বলে, “অত জোরে ছোঁড়াটা বাইক নিয়ে বাইরে বেরয়, দেখলে ভয় করে। পারলে ফুটপাথে উঠে পড়ে সব ভেঙেচুরে শেষই করে দেবে মনে হয়।”
ভিকির মুখে এ সব শুনতে শুনতে আবারও মাথায় বুদ্ধি খেলে লাইকার। “ডান!” বলে ওঠে লাইকা।
“প্রসাদ তো রইলই। তোদের ঝুপড়ির মধ্যে থেকে আর কেউ কোনও কাজ করে না ওখানে?”
“আর একটা মেয়ে রিসেন্টলি যাচ্ছে দি। ওর নাম রত্না।”
“চন্দ্রপলিসের আবাসিকদের ফ্ল্যাটের মধ্যে যায়?”
“তা তো জানি না দি।”
“তোর দ্বারা কিস্যু হবে না। চন্দ্রপলিস কমপ্লিটলি অটোমেটেড হলেও ছোট কিছু কাজ থাকে যা মানুষ ছাড়া হয় না। বুঝলি? তোদের এই বাইরে দাঁড়িয়ে আড্ডা মেরেই জীবন কেটে গেল। খোঁজখবরগুলোও ঠিকঠাক রাখিস না।”
“হ্যাঁ, দি। রত্না বিউটি কোর্স করেছে।”
“এই তো! বুঝে গেলাম তবে। বড়লোক বাবুদের গিন্নিদের পেডিকিওর, বডি মাসাজ, এ সব হয় যন্ত্রের সাহায্যে। কিন্তু আই ব্রো কিংবা পার্টিতে কায়দার চুল বাঁধা অথবা নেল আর্ট? এগুলো মানুষের দ্বারাই হচ্ছে এখনও। তার মানে রত্না বিউটি কোর্স করেছে বলেই ওখানে কাজও পেয়ে গিয়েছে চটপট। রত্নার অধিকার জন্মেছে সোজা বড়লোক বাবুদের বেডরুমে প্রবেশের।”
নেক্সট প্ল্যান অফ অ্যাকশন ছকে নেয় লাইকা।
মেকানিক প্রসাদ মারফত চন্দ্রপলিসের ইলেকট্রিশিয়ান রঞ্জুর কথা জানতে পারে। ভিকিকে বলে, “রঞ্জুর সঙ্গে রত্নাকে ভিড়িয়ে দিতে হবে, বুঝলি?”
ভিকি বলে, “যাহ কলা! আমি কাবাব মে হাড্ডি তবে?”
লাইকা বলে, “মিশন সাকসেসফুল হলে সব পাবি তুই। চিন্তা মত কর।”
লাইকার পরামর্শে রঞ্জুকে রত্না প্রথমে সিডিউস করতে শুরু করে। তারপরে নিয়মিত রঞ্জুর সঙ্গে গঙ্গার ঘাটের দিকে যায় রাতের দিকে, প্রেম করতে।
হঠাৎ রঞ্জু কেন? এত লোক থাকতে?
কারণ রঞ্জুরই একমাত্র চন্দ্রপলিসে ঢোকা-বেরনোর পারমিশন আছে। রঞ্জুই একমাত্র জানে ইলেকট্রিকাল সার্কিটের সব ঘাঁতঘোত। রত্না মারফত এ সব ইনফো সংগ্রহ করতে শুরু করে দিয়েছে লাইকা।

এবার মাস্টার প্ল্যান এগজ়িকিউট করার পালা।
মেন গেটের দু’ তিনজন গার্ডকে পটানোর প্ল্যান রয়েছে লাইকার। তাদের সঙ্গে জমিয়ে বন্ধুত্ব করে নেবে। যদিও এ সব তার হাতের ময়লা। ভুলেও ভয় দেখিয়ে নয়। ভাল ব্যবহার করতে হবে এদের সঙ্গে। কারণ লাইকার কাজে লাগবে এরা। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে তখন আঙুল বেঁকাতে জানা আছে তার।

চন্দ্রপলিসের অতন্দ্র প্রহরীদের জন্য আজকাল আরও টাইট আর গ্লিটসি ড্রেস পরছে লাইকা। মাঝেমধ্যে শিফন শাড়িও পরছে বদলে বদলে। সঙ্গে ডিজ়াইনার হল্টারনেক স্লিভলেস ব্লাউজ়। আগের চেয়ে সামান্য রুক্ষতা কমিয়ে ফেলেছে। গোল্ডেন লকস আর রেশমের মতো বারগ্যান্ডি কালারের চুল, সভ্য বাবুদের লক্ষ্মী মেয়েদের মতোই লাবণ্যময়ী করে তাকে। মাঝেমধ্যেই এক্সাইটিং স্টার্টার আনছে সে, নিজের জমানো টাকা দিয়ে। সপ্তাহে একদিন সস্তার রামের বোতল। বজ্র আঁটুনি প্রবেশদ্বারেই। অতএব এটুকু ইনভেস্ট করতেই হবে লাইকাকে।

তার মোটর বাইক চন্দ্রপলিসের গেটের সামনে এসে দাঁড়ালেই সিকিউরিটি গার্ড দু’জন নড়েচড়ে বসে আজকাল। আগে কেমন যেন নাক কোঁচকাতো এরাই। বলত, “ওই ট্যাটুওয়ালি এল!” যে মুখ দেখে আগে তাদের গা জ্বলত, এখন তাকেই ভাল লাগতে শুরু করেছে। লাইকা মাঝেমধ্যেই নিজস্ব কায়দায় জিনসের পকেট থেকে রিভলবার বের করে শো-অফ করে। কখনও পাতলা কাগজে তামাক রেখে রোল করে টেনে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, “ভাটের টেকনোলজি বাবুদের! চিন্তা মত কর, ম্যায় হুঁ না!”

মোদ্দা কথা হল, জন্মাষ্টমীর রাতে লাইকা এবং তার বিউটিশিয়ান অ্যাসিস্ট্যান্ট রত্না, দু’জনেই বিকেল থেকে হাজির থাকবে চন্দ্রপলিসের মধ্যে। লাইকা তার সাজপোশাক আমূল বদলে ঢুকে পড়বে চন্দ্রপলিসের চৌহদ্দির মধ্যে। রত্নার মেমসাহেব মানে গুপ্তাজির গিন্নীর জন্মাষ্টমীর আগের দিনই চাই তাকে। রত্নার সঙ্গে প্ল্যান হয় তার। রত্না গুপ্তাজির গিন্নীকে জানায়, পারবে না আসতে। মেনস্ট্রুয়েশন হয়েছে তার। পুজোবাড়িতে উৎসবের ঘটা। গুপ্তাজিরা এ সব খুব মানে । ছোঁয়াছুঁয়ি, আচারবিচার। অথচ গুপ্তাজির বউয়ের বিউটিশিয়ান সেদিন চাই-ই চাই। তাই রত্নাই তার বান্ধবী লীনাকে পাঠাচ্ছে তার বদলে। লাইকা চন্দ্রপলিসের মধ্যে ঢুকবে ভাবে, আবার পিছিয়ে আসে বায়োমেট্রিকের কথা ভেবে। মনে মনে বলে, “শ্লা! নিকুচির পুজো! এ যুগে এত টেকনোলজি বোঝে বাবুরা, অথচ মেন্স হলে এখনও সেই সেকেলে ছুঁৎমার্গ!”

রত্নার মতো লাইকারও গোবেচারা লুক আজ। নমনীয় হাবভাবে ঢুকতে হবে সেখানে। কেউ যাতে না বোঝে, সে আসলে কেন এসেছে। তবে প্যান্টির মধ্যে লুকিয়ে বন্দুক নিতে ভোলে না সে। ওটা তার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। পুরুষ কেউ সার্চ করতে এলেই ঘষে দেবে বুকদুটো, সে কায়দাও রপ্ত করা আছে তার।
সম্প্রতি লাইকা শুনেছে, মানুষের চোখের রেটিনা পালটানো মুখের কথা নয় কিন্তু ফেক ফিঙ্গারপ্রিন্ট লাগিয়ে নেওয়াই যায় সামান্য গাঁটের কড়ি খসাতে পারলেই। সে অ্যাডহেসিভ ফেলে রত্নার আঙুলে। ছাঁচ তৈরি হয়। সেই ছাঁচে আর একটা সাবস্ট্যান্স ফেলে নকল আঙুলের সারফেস তৈরি করে ফেলে। এবার নিজের আঙুলে সেটি আটকিয়ে নিতে পারলেই কেল্লা ফতে! বস্তির এক তুখোড় চোরের কাছে এই লেসন নেওয়া তার। অতএব জন্মাষ্টমীর সন্ধেতে আর চাপ নেই লাইকার। সে দিব্যি প্রস্তুতি নেয়। রত্নার ফিঙ্গার প্রিন্ট ট্রেস করে নিয়ে নিজের আঙুলে লাগিয়ে বেশ কনফিডেন্ট লাগছে লাইকার। চন্দ্রপলিসের প্রবেশদ্বারের হ্যাপা নেই আপাতত আর।
কিন্তু প্ল্যান ছকে ফেলেই মনে হয়, ভুল হচ্ছে কিছু একটা। রত্না না হয় বিউটিশিয়ান হিসেবে যাবে না। কিন্তু অন্য কোনও কাজে তাকেও তো থাকতেই হবে ভিতরে। রত্না আবাসনের অন্দরের সবকিছু এতদিনে চিনে গিয়েছে। তা হলে?
লাইকা যাবে লীনা সেজে। বিউটিশিয়ান হিসেবে, গুপ্তাজির বউয়ের কাছে। অফিশিয়ালি লাইকা সেখানে গেলে রত্নার ফিঙ্গারপ্রিন্টের পর্ব মুলতুবি হয়ে যাবে। লাইকা নিজেই বায়োমেট্রিক চেকিং করে ঢুকে পড়বে আর সকলের মতোই। রত্না থাকবে আশেপাশের কোনও এক ফ্ল্যাটেই। কতরকমের অড জব থাকে বাবুদের বউদের, সে সব সামাল দেবে। কোঅর্ডিনেশন থাকবে ফোনে। সকলের ইয়ার ফোন লাগানো। ‘লাইকা’স লিপস্টিকস’ নামে টিম প্রস্তুতি নেয়।

জন্মাষ্টমীর সন্ধে। ঝমঝম করে বৃষ্টি হয়েছে কিছু আগেই। সার সার

নিয়ন আলোয় চন্দ্রপলিস যেন অন্য মাত্রা পায়। পিচঢালা রাস্তায় চকচক করছে জলের আলপনা। রাজকীয়তা আরও বেড়েছে জন্মাষ্টমীর কারণে। উৎসবের সাজোসাজো রব চন্দ্রপলিস জুড়ে। গুপ্তাজির শ্রীধর মাধবের অনারে সকলে প্রসাদ পাবে। তার আগে গুপ্তাজির একমাত্র আদরের বউয়ের সাজুগুজু। শ্লা! পয়সা থাকলে ভূতের বাপেরও ছেরাদ্দ করে ছাড়ে বাবুরা।

লাইকা বলে ওঠে, “মারহাব্বা!” চড়িয়ে নেয় এক পাতা। সঙ্গে দু’চারটে সিগারেট। এসব কাজে টেনশন থাকেই। তা কমাতে ড্রাগ আর টোব্যাকোর জুড়ি নেই। লাল জল পেটে পড়লে মুশকিল এ সময়। তবে খানিকটা ধোঁয়া খেয়ে কিছুটা না ছাড়তে পারলে লাইকার আবার মাথাটা ঠিক খোলতাই হয় না।

পরক্ষণেই বলে ওঠে, “শ্লা! সব বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। দেখাচ্ছি তোদের যন্ত্রজাল পেতে রাখার মজা!”

সন্ধের প্রগাঢ় অন্ধকারেই ঘনীভূত হয় রহস্য। কী হবে এবার তবে? সব প্ল্যানমাফিকই হবে আশা করছে লাইকা। আগে তো ছুঁচ হয়ে ঢোকা গুপ্তাজির খাস বেডরুমে। তাঁর বউয়ের মাথায় বিলি কেটে, কায়দার চুল বেঁধে দিতে হবে। তারপর নখরঞ্জনিতে নকশা করে দিতে হবে। আর ঠিক কী কী করতে হবে বেগমসাহেবা? আমি আজ আপনার খাস আজ্ঞাবহ দাসী কাম বিউটিশিয়ান জাহাঁপনা। একটু বেশিই না হয় সময় দেব আপনার রত্নার চেয়ে। আমি লীনা।

মধ্যরাতে বাকি প্ল্যানের এগজ়িকিউশন। লাইকা প্ল্যান করেছে অনেক আটঘাট বেঁধে। চন্দ্রপলিসের ভিতরে গাঁটছড়া বেঁধে ফিট করা আছে তার টিমকে। ‘লাইকা’স লিপস্টিকস’। মোটরসাইকেল শোরুমের মেকানিক প্রসাদের উপর ভার পড়েছে ম্যানেজার শিবরামকে পটানোর। নিতান্তই গোবেচারা শিবরাম। আছে তার ‘থিক প্যাল’ রত্না আর ইলেকট্রিশিয়ান রঞ্জু। তাকে পটিয়েছে রত্না। মেন্স হয়েছে বলে অবাঙালি বাবুদের অন্দরমহলে ঢুকতে মানা। তো কী? বাঙালিরাও তো আছে সেখানে। একজনের গুচ্ছের জামাকাপড় ইস্ত্রির কাজ পেন্ডিং অনেকদিন ধরে। সেটাই সেদিন করবে রত্না। শালা! সব কাজ কি আর যন্ত্র দিয়ে হয় রে! কী ভাগ্যিস এই বাঙালিটার ইস্ত্রি করার রোবট জোটেনি এখনও। সব্যোতা! বাবুদের হাইটেক সিটি চন্দ্রপলিস না টেকনোপলিস! নিকুচি করেছে!

মহারানি গুপ্তা ম্যাডামের শৃঙ্গার-ভৃঙ্গার পর্ব মিটে যাবে সন্ধের মধ্যেই। তারপর? নাহ্! তা হলে সেই পর্বকে আরও টানতে হবে কিছুটা তাকে। কারণ মাঝরাতের আগে তো আর গুপ্তাজি বেরবেন না মূর্তি কাঁধে করে। কেষ্ট নাকি মাঝরাতেই জন্মেছিলেন। যতসব দেখনদারি এদের। ভগবানের চান হবে লোক দেখিয়ে, ঢাক পিটিয়ে, সব্বোমাটি মাড়িয়ে।

“মেরা ভি দর্শন হোগা না ম্যাম?” গুপ্তা ম্যাডামকে জিগ্যেস করে লাইকা ওরফে লীনা।

“অফ কোর্স। অভি মত যাও লীনা। প্রসাদ লেকে জানা,” ম্যাডাম বলেন।

“জরুর ম্যাম,” লাইকা বলে।

“বহুত বড়িয়া হেয়ার এক্সপার্ট হো তুম। নেল আর্ট কিধারসে সিখা তুমনে?”

“জি ম্যাম, ইয়ে মেরা প্যাশন হ্যায়,” লাইকা আরও বিনয়ের সঙ্গে বলে।

টাইম পাস করে এভাবেই। তার মধ্যেই চোখ রাখে গুপ্তাজির উপর। রেডি হচ্ছেন তিনি। সবকিছু হবে তো ঠিকমতো? রত্না মেসেজে জানায়, আর বেশি বাকি নেই। তার বাঙালি ভাবি বলেছে, এবার কাজ ফিনিশ করো। তারাও গুপ্তাজির পোঁ ধরে পিছু পিছু যাবে কিনা শ্রীধর মাধবের সিনানযাত্রায়, মোসায়েবি করতে।

তার মধ্যেই চোখ রাখে গুপ্তাজির উপর। রেডি হচ্ছেন তিনি। সবকিছু হবে তো ঠিকমতো? রত্না মেসেজে জানায়, আর বেশি বাকি নেই। তার বাঙালি ভাবি বলেছে, এবার কাজ ফিনিশ করো।



‘লাইকা’স লিপস্টিকস’ টিমের উত্তেজনার পারদ চড়তেই থাকে। রাত বারোটা।

বাইরে নিয়ন আলো চুঁইয়ে পড়ে আরও যেন মোহময় করে তোলে ঝাঁ-চকচকে চন্দ্রপলিসকে।

চন্দ্রপলিসের বাইরের গেটে দু’জন সিকিউরিটি, ইলেকট্রিশিয়ান রঞ্জু, মেড রত্না, শোরুমের ম্যানেজার শিবরাম আর মেকানিক প্রসাদ। লাইকার গুপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্টকে জানানো আছে সকলের নম্বর। সকলের ভয়েস অ্যাকটিভেটেড ফোনকল এন্যাবল্‌ড।

সকলের কানে লাগানো ফোন।

জন্মাষ্টমীর রাত। কিছুক্ষণ আগেই একটা স্মার্ট শাওয়ারের পর ভেজা ভাদ্রের ঝিম ধরা ভাব। কিন্তু রাস্তায় লোকের অভাব নেই। রহস্যময়তায় ঘেরা নিয়ন আলোর ঝিকিমিকির ভিতরে দু’একটা অটোনোমাস গাড়ি যাত্রী বা মাল নিয়ে নিজে নিজে যে যার কাজের জন্য চলে বেড়াচ্ছে ভিতরে। ওদিকে গুপ্তার বাড়িতে আজ বেশ টানটান উত্তেজনা। ঠিক বারোটার আগে মিস্টার গুপ্তা তাঁর সত্তর তলার পেন্টহাউস থেকে তাঁর প্রাণের অষ্টাধাতুর শ্রীধর মাধবের মূর্তি— যেটা চন্দ্রকেতুগড় থেকে বহুদিন আগে উনি চুরি করে এনেছিলেন— সেটি মাথায় করে লিফ্টে চড়ে নামবেন। তারপর প্ল্যানমাফিক সেই মূর্তি নিয়ে গাড়ি চড়ে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে তাঁকে স্নান করাবেন। লীনা তার মেমসাহেবকে আজ খুব ভাল করে সাজিয়ে দিয়েছে। চুলের সেটিং থেকে নখশিল্প সবই স্পেশ্যাল। কিন্তু সে আজ একটু টেন্সড। কানে লাগানো ইয়ারফোনটা আর খোলা হয়ে ওঠেনি।

ওদিকে বাঙালিবাবু সান্যালের বাড়িতে ইস্ত্রির কাজ এতক্ষণে শেষ করে ফেলেছে রত্না।

গুপ্তার বহুতলের কিছুদূরে একফালি সার্ভিস রোডের অন্ধকারে, রত্নার সিগন্যাল পাওয়ামাত্রই উপর থেকে নেমে গিয়ে, একটা বিরাট মোটরবাইকে লাইকা অপেক্ষা করছিল নিস্তব্ধ অন্ধকারে। তার কানে যথারীতি ইয়ারফোন, ঠোঁটে সিগারেট। বিকেলবেলা সে বিউটি এক্সপার্ট হয়ে চন্দ্রপলিসে ঢুকেছিল। বেরিয়ে এসে মোটরবাইক শোরুমে ঢুকেছে। ওয়াশরুমে গিয়ে সাজগোজ বদলেছে। আপাতত প্রসাদের ছোট্ট ডরমিটারিতে মধ্যরাত অবধি গা ঢাকা দিয়ে বসে থাকতেই হবে তাকে। তাই নিজের প্যান্টশার্ট পাল্টে একটা শিফন শাড়ি আর ছোট্ট স্লিভলেস ব্লাউজ় পরেছে। লাস্যময়ী লাইকা এবার হাজির হয় বাইক ডিলারশিপের ম্যানেজার শিবরামের বাড়িতে। প্রসাদ শিবরামের ডিলারশিপেই কাজ করে। তাই সে-ই দেখিয়ে দেয় শিবরামের বাড়ি। লাইকার সঙ্গে শিবরামের সন্ধেটা বেশ ভালই কাটতে থাকে। সময় ও দম থাকলে লাইকা হয়তো তাকে আরও কিছু খেল দেখাত, কিন্তু কাজ আছে! শেষে বেশ কিছুটা সিঙ্গল মল্ট খাইয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে লাইকা যখন রাত এগারোটার সময় সেখান থেকে বেরোল, তখন তার হাতের মুঠোয় মোটরবাইকের হাইটেক শোরুমের ডোর ওপেনিং ডিভাইসের

সবকটাই মজুত।

ওদিকে সাঁই সাঁই করে লিফ্‌ট থেকে নামছে রত্না। বুকের ভিতরে ধুকপুকুনি। লিফ্‌টে চড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে কানে লাগানো মাইক্রোফোনে লাইকাকে একটা সিগনাল পাঠাল।
'ফ্ল্যাট থেকে এগজ়িট'।
চন্দ্রপলিসের মধ্যেই দূরের গলিতে মোটরবাইকে অপেক্ষমান লাইকা সিগারেটের প্যাকেট ফুরিয়ে ফেলে। প্রচণ্ড টেনশনে আছে সে এই মুহূর্তে। হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে, আলতো করে বাইকটাকে একটু নাড়িয়ে নিল। সত্তর তলা থেকে নামতে রত্নার প্রায় নব্বই সেকেন্ড লাগবে। ঠিক নব্বই সেকেন্ডের মাথায় বাইকের ইগনিশন বাটনটা চাপতেই ইঞ্জিনটা হালকা গলা ঝেড়ে উঠল। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস গুপ্তা তখন লিফ্ট থেকে বেরিয়ে সবেমাত্র লবিতে। বেশ কিছু তাঁবেদার আর সিকিউরিটি গার্ড তাঁদের ঘিরে ধরেছে। তাদের ঠেলে গুপ্তা দরজার দিকে এগোচ্ছে।
"দরজার দিকে যাচ্ছে।"
কান থেকে ঝুলতে থাকা মাইক্রোফোনে রত্না ফিসফিস করে লাইকাকে জানায় কথাটা। তখনও লাইকার বাইক চুপচাপ গলির মুখে। সেখান থেকে গুপ্তার বাড়ির লবির বিরাট দরজা দেখা যায়।
শ্রীধর মাধবের মূর্তিটি মাথায় নিয়ে গুপ্তাজির বেরিয়ে পড়ার সময় আসন্ন।
গুপ্তাজি জন্মাষ্টমীর মধ্যরাতে বেরবেন দোলা-ছাতা সমন্বয়ে। প্রতি বছরেই এমন মহাস্নানে যান তিনি।
তারপর যা ঘটল, তা ঘটতে লাগল মাত্র কয়েক সেকেন্ড। কিন্তু সকলের বুঝে উঠতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগে গেল। এতক্ষণ যেন সিনেমার দৃশ্যপট স্লো-মোশনে এগোচ্ছিল, হঠাৎ করেই তা গতিময় হল। দেখা গেল, ঝড়ের বেগে বিরাট এক বাইক ছুটে আসছে। হুটারে প্রবল শব্দ সেই মোটরবাইকের। বিকট আওয়াজে অস্থির জনতা। একেই সকলের চোখ তখন জন্মাষ্টমীর মহাস্নানের দিকে। গুপ্তাজি যাবেন স্বয়ং।
কিন্তু আচমকা দুটো ঘটনা একসঙ্গে ঘটে গেল। লাইকা একটা স্টান বম্ব ফাটাল। জোর আওয়াজ, আলোর ফ্ল্যাশ আর প্রচুর কালো ধোঁয়ায় চারিদিক ছেয়ে গেল। কারওর কোনও ক্ষতি হল না, কিন্তু ঠিক তার মধ্যেই রত্না লাইকার কথামতো গুপ্তাকে সজোরে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে। ফলে গুপ্তার মাথা থেকে শ্রীধর মাধবের মূর্তিটি মাটিতে পড়ে গিয়েছে। আর কেউ কিছু বোঝার আগেই রত্না সেটা তুলে তার বুকের কাছে বাঁধা ব্যাকপ্যাকে পুরে নিয়েছে।
ইতিমধ্যেই লাইকা তার বিশাল বাইক নিয়ে গুপ্তার বাড়ির ফুটপাথের একেবারে মাঝখানে উঠে পড়েছে। যা কথা ছিল, তাই কাজ হয়েছে। ভয়ংকর গোলমালের মধ্যে রত্না লাইকার পিছনে বাইকে উঠে পড়ল এবং আর একটা স্টান বম্ব ফাটিয়ে দু'জন মিলে মোটরসাইকেল নিয়ে দোর্দণ্ড গতিতে বেরিয়ে গেল। লাইকা আরও কয়েকটা এলোপাথাড়ি গুলি ছোড়ে শূন্যে।

গুপ্তার সিকিউরিটি টিম ততক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। দু'জন গার্ড গুপ্তার গাড়িতেই উঠে ড্রাইভারকে হুকুম করে, "চেজ় দ্য বাইক", "পিছে ভাগো শালা।"
কিন্তু গাড়ি ততক্ষণে দশ ফুট এগিয়েই হঠাৎ করেই থেমে গেল। গাড়ির ড্যাশবোর্ডে টকটকে লাল রক্তের মতো মেসেজ জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠল।
"গাইডেন্স সিস্টেম নট অ্যাকসেসিব্‌ল।"
লাইকার সংকেত তার আরও এক 'লিপস্টিক' রঞ্জুর কাছে পৌঁছে গিয়েছে তারই মধ্যে। চন্দ্রপলিসের কম্পিউটার কন্ট্রোলড ইলেকট্রিক সিস্টেম ম্যানেজ করার চাবিকাঠি যার হাতে, সেই রঞ্জু প্ল্যানমাফিক সারা চন্দ্রপলিসের অটোনোমাস ভেহিকল গাইডেন্স সিস্টেম বন্ধ করে দিয়েছে।
মধ্যরাতের অন্ধকারে ভুতুড়ে রাস্তায় চন্দ্রপলিসের মধ্যে এখানে-ওখানে গাড়ি, ট্রাক, বাস সব চুপচাপ নিথর দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে দিয়ে বিরাট বাইকে চড়ে লাইকা আর রত্না। ঊর্ধ্বশ্বাসে তারা ছুটে চলেছে ইস্ট গেটের দিকে। রত্না ভাবছিল যে নর্থ গেট কাছে হত, কিন্তু লাইকাকে এখন অত কথা বলার সময় নেই। আর বললেও সে শুনবে না। কোনও কারণ আছে নিশ্চয়ই।
হঠাৎ সামনে দেখা গেল কয়েকজন সিকিউরিটি গার্ডকে। তারা একটা রেলিংগার্ড ঠেলে এনে রোড ব্লক করার চেষ্টা করছে। নিশ্চয় রেডিওতে খবর পেয়ে গিয়েছে। গাড়ি ঘোরানোর কোনও জায়গা নেই।
"স্টান বম্ব ছোড় শালা!"
লাইকার হুকুমে রত্না আগে থেকেই হাতে একটা বোমা রেখে দিয়েছিল। সেটা ছুড়ে দিতেই আবার সেই বিকট আওয়াজ আর ধোঁয়া! আর তারই ফাঁকে লাইকার দৃঢ় হাতে চালিত মোটরবাইকটা হুটার বাজিয়ে রোড ব্লক ভেঙে রুদ্ধশ্বাসে বেরিয়ে গেল।

এবার সামনের গেট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু গেট তো বন্ধ।
"তেজি, গেট খোল।"
লাইকার আবার মাইক্রোফোনে হুকুম। দেখা গেল বাইক গেটের কাছে আসতেই, পাশের ছোট সাইড গেট, যেটা দিয়ে লোক যাওয়া-আসা করে, সেটা খুলে দিল একজন গার্ড। লাইকা দক্ষ হাতে, সুনিপুণভাবে বাইকটা সেখানে গিয়ে দাঁড় করায়। আর একজন তরুণ গার্ড, তেজিন্দর সিং, টুক করে বাইকের সিটের উপর রত্নার পিছনে উঠে পড়ে। তারা তিনজনে মিলে চন্দ্রপলিসের বাইরের গভীর অন্ধকারের ভিতরে মিলিয়ে যায়।
পরদিন চন্দ্রপলিসের মিডিয়া হাউসে এই খবর বিশদে বেরিয়েছে। যে খবরের শিরোনাম হল এমন।
'চন্দ্রকেতুগড়ের চুরি হওয়া মহামূল্য কৃষ্ণ মূর্তি আবারও চুরি চন্দ্রপলিসের মধ্যে থেকে'।
গুপ্তাজির মতে, চন্দ্রপলিসের প্রাণভোমরা ছিলেন এই শ্রীধর মাধব। সেই থেকেই নিজের শখের এই হাইটেক নগরীর নাম দিয়েছেন চন্দ্রপলিস।

জন্মাষ্টমীর পরদিন ভোরে...
চিত্রা সুব্রহ্মণ্যম, মিস্টার সান্যাল আর গুপ্তাজি বসে আছেন গঙ্গার ধারে বানানো তাঁদের স্পেশ্যাল কাচের তৈরি বোর্ডরুমে। ঘর থেকেই গঙ্গা চোখে পড়ে। অন্যদিনের মতো এই নিরিবিলিতে বসায় কোনও প্রশান্তির চিহ্নমাত্র নেই। বরং অশান্তিই রয়েছে বেশি। গতরাতের ঘটনায় সবাই স্তম্ভিত। গুপ্তাজির মাথায় হাত। শ্রীধর মাধবের মূর্তিটি আটকে রেখেছে লাইকা আর তার লিপস্টিক গ্যাং। তারা বসতে চায় চন্দ্রপলিসের এই তিন মহারথীর সঙ্গে। সমঝোতায় না এলে মূর্তি ফেরত পাবে না গুপ্তাজি। কুছ খোয়া তো কুছ পায়া।
নেগোসিয়েশন? নদীর ধারের ঝুপড়ি এনক্রোচিং নিয়ে? নাহ্‌! ঝুপড়িবাসীর রিহ্যাবিলিটেশন চাই। কিংবা বিনিময়ে ন্যায্য অংকের কমপেনসেশন। ততক্ষণ শ্রীধর মাধবকে ভুখা রাখা হবে না ঠিকই, কিন্তু গুপ্তাজির হাতে তাঁকে ফেরত দেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই।

শেষমেশ চিত্রা সুব্রহ্মণ্যম গম্ভীরভাবে লাইকার ফোনে ফোন করতে আদেশ দিলেন মিস্টার সান্যালকে।
বেশ বিরক্তি সকলের চোখেমুখে। সেই সঙ্গে উদ্বেগ।

চিত্রার মাথায় তখন দানা বেঁধেছে আর একটি বড় প্ল্যান। লাইকার মতো এমনি একজনকেই তাঁর চাই। শুধু চন্দ্রপলিসের জন্যই নয়।

অলংকরণ: বৈশালী সরকার



ভোর হল দোর খোলো...

রজতশুভ্র মজুমদার

"এ কী, শিবেনদা তুমি!" দরজা খুলেই প্রায় আঁতকে উঠল তিতিসা।
"হ্যাঁ মানে এই..."
"এসো এসো, ভেতরে এসো," তিতিসা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি শিবেনদা কিছুমাত্র না জানিয়ে এইভাবে এসে হাজির হতে পারে, "সব ঠিক তো?"
"হ্যাঁ বউদিমণি, সব ঠিক আছে," শিবেন মুর্মু বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল।
"তোমার শরীর ঠিক আছে?"
"আমি একদম ঠিক আছি," জুতো জোড়া খুলতে খুলতেই তিতিসাকে পরখ করে নিল শিবেন মুর্মু। তিতিসা সদ্য স্নানঘর থেকে ফিরেছে। ভিজে চুলগুলো জড়ানো আছে গোলাপি টাওয়েলে। কপালে একটা ছোট্ট টিপ। পরনে সুতির নাইটির উপর হলদে ডোরাকাটা হাউসকোট। "এসো এসো," তিতিসা ফের বলল।
"হ্যাঁ মাঝে বাবার অবস্থা ডেটোরিয়েট করেছিল খুব, এখন অনেকটা ভাল," তিতিসা হাঁক দিল, "বাবা...ও বাবা..." ততক্ষণে বাবা বেরিয়ে এসেছেন ঘর থেকে, "কী হল রে, কে এসেছে?"
"মেসোমশাই, আপনাকে দেখতে এলাম," শিবেন মুর্মু টুক করে একটা প্রণাম ঠুকে দিল তিতিসার বাবার পায়ে।
"কিছু মনে কোরো না, ঠিক চিনতে পারলাম না," তিতিসার বাবার গলা খাদে।
"চেনার কথা নয়, সেই কবেকার দেখা," চকচকে টাকে হাত বোলাতে লাগল শিবেন মুর্মু।
"বাবা, আবিরের শিবেনদা গো," তিতিসা স্ট্রেস দিয়ে বলল, "ও বাড়ির শিবেন মুর্মু, তুমি চিনতে পারছ না?"
"ওহো তাই বল, এইবার বুঝেছি," তিতিসার বাবা ব্যাকুল হয়ে

প্রশ্ন করলেন, "আবির, আমাদের আবির কেমন আছে? কত দিন দেখিনি তাকে..."
"দাদাবাবু ভাল আছে গো," শিবেনদার মুখে চওড়া হাসি।
"আমার শরীর খারাপ বলে মেয়ে দশ দিনের ছুটি নিয়ে এসেছে। ওর ছুটি পেতে খুব অসুবিধে হচ্ছিল। কোনও রকমে ব্যবস্থা করে এসেছে।"
ততক্ষণে তিতিসার মা নেমে এসেছেন দোতলা থেকে, "বোসো বাবা শিবেন, কত পথ পেরিয়ে এসেছ। জল খাবে?"
"না না মাসিমা, আমি ঠিক আছি," শিবেন মুর্মু তিতিসার মাকেও প্রণাম করতে ভুলল না।
"বেঁচে থাকো বাবা, বেঁচে থাকো," শিবেন মুর্মুর মাথায় হাত দিলেন তিতিসার মা, "তা বাবা, আবির এল না? এলে কত ভাল লাগত।"
"কী করে আসবে মাসিমা, দাদাবাবুর কি ছুটি আছে?"
"বেচারি মেয়েটা বাবাকে দেখতে এখানে চলে এল। কত করে বললাম, বাবার কিছু হবে না, তুই বরং বেঙ্গালুরু থেকে ঘুরে আয় দু'দিন। কথা কানেই নিল না। আমার কথা শোনে? কোনও দিন শুনেছে আমার কথা?" বিড়বিড় করতে করতে রান্নাঘরের দিকে এগোলেন তিতিসার মা।
"দশ দিনের ছুটি সবে তো তিন দিন হয়েছে, যা না বেঙ্গালুরুতে বাকি ক'টা দিন কাটিয়ে ওখান থেকেই মুম্বই চলে যা। আমি তো ভাল আছি এখন," জড়ানো গলায় তিতিসার বাবা বললেন, "মনটা ভাল হবে তোর, আবিরেরও কত ভাল লাগবে বল তো?"
"তোমাদের কাছে থাকতে পেলেই আমার মন ভাল হয়ে যায় বাবা," তিতিসার গলায় অভিমানের স্বর, "বেঙ্গালুরু আবার পরের বার যাবখন।"
"চলো না বউদিমণি, কাকাবাবু তো ভালই আছেন," শিবেন মুর্মু অনুনয় করতে লাগল, "আমি তো তোমাকে নিয়ে যাব বলেই এসেছি গো।"
"তুমি যে ঠিক কী জন্য এসেছ সে ভগবান জানে," তিতিসা সরাসরি সন্দেহ প্রকাশ করল, "একবার বলছ বাবাকে দেখতে এসেছ, একবার বলছ আমায় নিতে, একটু পরে আবার হয়তো বলবে, বউদিমণি, দাদাবাবুই তো আমায় পাঠালে গো তোমায় নিয়ে আসার জন্যে। সেটাও বিশ্বাস করতে হবে আমায়! বলো?"

শিবেন মুর্মু খুব ভাল করেই জানে, এতটা গুল মারা ঠিক হবে না মোটেও। দাদাবাবু যে ধরনের জেদি আর একগুঁয়ে ছেলে, তাতে কিছুতেই যে সে তিতিসাকে আনতে শিবেনদাকে পাঠাবে না, এটা বিলক্ষণ অনুমান করতে পারবে বউদিমণি। তিতিসাকে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার জন্য আকারে ইঙ্গিতে তো কম বোঝায়নি আবির! দেশের দু'প্রান্তে দু'জন পড়ে থাকবে, এ কীসের দাম্পত্য? এইভাবে কি সম্পর্ক টিকে থাকে নাকি? টিকে হয়তো থাকে, কিন্তু সে সম্পর্কের বুনিয়াদ কতটা শক্তিশালী হয় সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

না, তিতিসা চাকরি ছাড়বে না কিছুতেই। আবির তাকে যতই বোঝাক, "আমার ইনকামেই আমাদের ভালভাবে খেয়ে-পরে কেটে যাবে জীবন," যতই আশ্বস্ত করুক, "তোমার যা ট্যালেন্ট, তুমি বেঙ্গালুরুতে চলে এলে এখানেই যা হোক একটা কাজ জুটিয়ে ফেলবে ছ'মাসে," কিংবা যতই অসহায়তার কথা বলুক, "আমার একা একা একদম ভাল লাগে না গো।" তিতিসা চাকরি ছাড়তে নারাজ। বিয়ের আগে-আগেই সে খুব পরিষ্কার করে আবিরকে জানিয়ে দিয়েছিল,"আমি কিন্তু কাজটা কন্টিনিউ করতে চাই আবির, অ্যাট এনি কস্ট।"
"সেটা তোমার সিদ্ধান্ত, অ্যাবসলিউটলি তোমার।"
"একজন ওয়েস্ট, একজন সাউথ। আর আমাদের মিটিং পয়েন্ট ইস্ট! হাউ ফ্যান্টাস্টিক, না?"
"তা কেন, আমি ছুটি পেলে উড়ে যাব মুম্বই, তুমি পেলে উড়ে আসবে বেঙ্গালুরু! এই তো জীবন কালীদা!"
"একঘেয়েমি আমার একদম ভাল্লাগে না। রোমাঞ্চ না থাকলে, বৈচিত্র না থাকলে আবার জীবন কীসের?"
"জীবনটা তো নিজের মতো করে উপভোগ করার জন্যই।"
"একদম আবির, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ," তিতিসা মিহি গলায় বলেছিল, "কিন্তু সকলে তো তোমার মতো করে বোঝে না। আই অ্যাম প্রাউড দ্যাট তোমার মতো একজন জীবনসঙ্গী খুঁজে পেয়েছি!"

বিয়ের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই অবশ্য তিতিসার ভুল ভেঙে গিয়েছে। আর পাঁচটা গড়পড়তা বাঙালি হাজ়বেন্ডের মতোই আবিরকেও তার স্বার্থপর, অবুঝ, একরোখা, পুরুষতান্ত্রিক সংস্কৃতির দাসানুদাস বলেই মনে হয়েছে। না হলে যে নাচকে তিতিসা এতখানি গুরুত্ব দেয় জীবনে— নাচের জন্য সে জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত— সেই নাচের কোনও মূল্যই নেই আবিরের কাছে? মুম্বইয়ের বাঙালি আবাসনের যে ফ্ল্যাটটায় ভাড়া থাকে তিতিসা, তার আশেপাশে নাচের এত ভাল একটা পরিমণ্ডল আছে যে, যে কোনও নৃত্যশিল্পীর কাছেই তা প্রায় স্বপ্নের মতো! বলিউডের খ্যাতিমান কোরিয়োগ্রাফার থেকে শুরু করে ডান্স মুম্বই ডান্সের সেলিব্রিটি জাজ... কে নেই সেখানে? অথচ আবির কিনা চায় সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে তিতিসা বেঙ্গালুরু চলে আসুক? শিল্পের কোনও মর্যাদাই নেই তার কাছে? শিল্পীর কোনও সম্মানই নেই? এই আবিরকে সে ভালবেসেছিল? এই আবিরই কি তাকে একদিন বলেছিল, "ভালবাসা মুক্ত বিহঙ্গের মতো তিতি, তাকে বন্দি করেছ যত, তত সে ডানাভারী চলচ্ছক্তিহীন জড়ভরতে পরিণত হয়।"

শেষবার বেঙ্গালুরু গিয়ে একদম ভাল লাগেনি তিতিসার। পাঁচ দিনের ছুটি পেয়ে কত আনন্দ করে উড়ে গিয়েছিল মেয়েটা। ফিরেছে কাঁদতে কাঁদতে। আবিরকে তার ভীষণ অচেনা ঠেকেছিল। জুহুতে নাচের অমন পারফরম্যান্সের ছবিগুলো দেখে তার শীতল প্রতিক্রিয়ায় যারপরনাই অপমানিত হয়েছিল তিতিসা, "আমি আর আসব না এখানে, কোনও দিন আসব না।"
"ঠিকই তো, ভাল না লাগলে আসবে কেন?"
"সত্যি আমার এ জায়গাটা কেমন প্রাণহীন শুষ্ক মরুভূমির মতো লাগে। বিশ্বাস করো, দম বন্ধ হয়ে আসছে আমার।"
এর পর থেকে দু'জনের সোশ্যাল মিডিয়ায় চ্যাটিংও কমে এসেছে বিস্তর। কাজের পর রাত্রে ঘরে ফিরে দু'-চারটে ফরমাল কথাবার্তা। ব্যস।

সম্পর্কের এই শীতলতা দ্রুতই অনুধাবন করতে পারেন তিতিসার বাবা-মা। মেয়ের এই দূরে-দূরে থাকাটা তাঁরাও যে খুব ভাল চোখে দেখেন এমন নয়, বরং ঠারেঠোরে তাঁরাও তিতিসাকে এটাই বুঝিয়ে দিতে সচেষ্ট থাকেন যে, মেয়ের উচিত চাকরিবাকরি ছেড়ে আবিরের কাছে চলে যাওয়া। অন্তত এই মুহূর্তে না হলেও, অদূর ভবিষ্যতে তো অবশ্যই। এইভাবে তো আর চিরটা কাল কাটতে পারে না। একটা ভবিষ্যৎ প্ল্যানিং থাকবে তো জীবনে! বাচ্চাকাচ্চা আসবে। তার ভবিষ্যৎটাও তো ভাবতে হবে তিতিসা-আবিরকেই। কত দিন আর উড়ে উড়ে বেড়ালে চলবে?
অবশ্য মা-বাবার কথাকে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়ার মেয়ে তিতিসা নয়। সে নিজে যেটা ভাল মনে করবে, সেটাই করবে। ছোট থেকে সেভাবেই মানুষ হয়েছে সে।

"জল খাও, বাবা," তিতিসার মা কাচের গ্লাস ভর্তি শরবত বাড়িয়ে দিলেন শিবেন মুর্মুর দিকে। "মেয়ের কাছে শুনেছি তুমি খুব ভাল রান্না করো।"
"বউদিমণি আর ক'দিন খেলেন আমার রান্না!" শিবেন মুর্মুর গলায় আক্ষেপের সুর।
"তোমার হাতে মাছের মাথা দিয়ে লাউয়ের কারি খেয়েছিলাম। ওহো, সুপার্ব। জাস্ট ভোলা যায় না," তিতিসা কথাটা বলতে বলতে বাবাকে নিয়ে ঘরের দিকে গেল।
"বউদিমণির বুঝি মনে আছে এখনও?" শিবেন মুর্মু লজ্জা-লজ্জা মুখ করে শরবতে চুমুক দিল।
"তা হয়ে যাক না আর একবার। পুটুর মা পাকা কাতলা এনেছে বাজার

থেকে, লাউও আছে ফ্রিজে। আজ বরং তুমিই রান্নাটা করো, আমি ওকে বেরিয়ে আসতে বলি। পুটুর মা, ও পুটুর মা...” তিতিসার মা আবার রান্না ঘরের দিকে এগোলেন। পিছন-পিছন শিবেন মুর্মু।

শিবেন মুর্মু জমিয়ে রান্না শুরু করেছে। তাকে সমস্তটা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন তিতিসার মা। দু'জনের গল্পও জমে উঠেছে বেশ। শিবেন মুর্মুর স্বভাবটা এমনই যে, সে কয়েক মিনিটেই মানুষের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে। তিতিসার মা অনেকক্ষণ এ কথা সে কথার পর আসল কথায় ঢুকলেন, “আচ্ছা বাবা শিবেন, আমাদের আবির কেমন আছে? তিতিসার কথা বলে-টলে তো? ওদের তো অনেক দিন দেখাসাক্ষাৎ নেই ! কোনও ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট হয়নি তো বাবা?”
“না মাসিমা, তা হয়নি, তবে...” শিবেন মুর্মু আমতা-আমতা করতে শুরু করল।
“তবে?”
“না, আসলে...”
“তুমি কিন্তু কিছু লুকিয়ো না আমায়।”
“দাদাবাবুকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি। বাপ-মা মরা এই অনাথ শিবেনকে কাকাবাবু আশ্রয় না দিলে শেয়াল কুকুরে খেয়ে ফেলত, মাসিমা...”
“হ্যাঁ শুনেছি সে কথা। আবিরের বাবা-মা-ই তোমাকে বিপদের দিনে আশ্রয় দিয়েছিলেন।”
“কাকাবাবু যখন চলে যান তখন আবির দাদাবাবু স্কুলের গণ্ডিই পেরোতে পারেনি। আজ সে অত বড় একটা চাকরি করছে!” শিবেন মুর্মুর চোখের কোণে জল চিকচিক করে উঠল, “সারাটা জীবন শুধু ওর ভালটাই চেয়ে এসেছি মাসিমা। আমি শুধু ওর রান্নার লোক নই, যত দিন বেঁচে থাকব ওর সব দায়িত্বই আমার। আমি যে কাকাবাবুর নুন খেয়েছি।”
“তিতিসা বলে, শিবেনদা আবিরকে নিজের ছেলের মতো ভালবাসে।”
“দাদাবাবুর উপর মায়ের টান ছিল সবচেয়ে বেশি। কাকিমা চলে যাওয়ার পর দাদাবাবুকে সুস্থ করতেই দুটো বছর লেগে গিয়েছিল, জানেন?”
“সে কথাও শুনেছি। তিতিসা বলেছে, আবির অসম্ভব ভালবাসত মাকে।”
“বাপ-মরা ছেলে তো! মা-ই ছিল ওর সব। কিন্তু ভগবানের এমনই লীলা, মাকেও তুলে নিলে অসময়ে।”
“কী হয়েছিল মায়ের?”
“কী আবার, ক্যানসার!”
“আহা!”
“জানেন মাসিমা, দাদাবাবু মাকে প্রায়ই স্বপ্ন দ্যাখে। এই কিছু দিন আগেও ঘুমের মধ্যে ‘মা...মা’ করে চিৎকার করে উঠেছিল। শুনতে পেয়ে আমি পাশের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি ছুটে আসি,” শিবেন মুর্মু মিয়নো গলায় বলল, “দাদাবাবু ভাল নেই গো মাসিমা, দাদাবাবু ভাল নেই।”
“সে তো আমিও বুঝতে পারি বাবা।”
“দাদাবাবু খুবই একা। কাছের মানুষ যদি দূরে থাকে...” শিবেন মুর্মুর কথা শেষ হতে না হতেই তিতিসা ঢুকে পড়েছে এ ঘরে। সে শিবেনদার কথা শুনতে পেয়ে বেশ রাগত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, “মাকে একা পেয়ে এখন মায়ের কান ভাঙানো হচ্ছে? আহা, দাদাবাবু খুবই একা— ন্যাকা কোথাকার!”
শিবেন মুর্মু কোনও কথা বলে না। মায়ের চোখে চোখ রেখে তিতিসা ফের বলে, “জানো মা, আমি ওখানে গেলে পর্যন্ত সারা দিন আমায় একা একা কাটাতে হয়, বাবু অফিস থেকে ফেরেন রাত্রি দশটার পর!”

শিবেন মুর্মু দেখল এই সুযোগ, বউদিমণিকে যেমন করে হোক বোঝাতেই হবে দাদাবাবুর অবস্থাটা। তিতিসার অভিমান ভাঙিয়ে তাকে যে কোনও উপায়ে বেঙ্গালুরুতে নিয়ে যাওয়াটাই এখন লক্ষ্য তার।



“দাদাবাবুর আপিসে সত্যিই খুব চাপ বউদিমণি,” শিবেন মুর্মু খুব নিচু স্বরে আবিরকে প্রটেক্ট করতে চেষ্টা করল।
“তবেই বোঝো। ছেলেটার কত্ত প্রেশার বল তো! অতিব্যস্ত জীবনে সারা দিনের খাটাখাটনির পর মানুষ ঘরে ফিরে এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে, তখন একটু কাছের মানুষের সান্নিধ্য চায়— কেউ একটু কপালে হাত রাখুক, পাশে এসে দুটো মনের কথা বলুক... বুঝেছিস?” মেয়েকে বোঝানোর চেষ্টায় কোনও খামতি নেই তিতিসার মায়ের।
“একদম ঠিক বলেছেন মাসিমা। আমি তো দাদাবাবুকে ছোট থেকে চিনি। দাদাবাবু ভীষণ একাকিত্বে ভোগে। কিন্তু অভিমানী খুব, মুখ ফুটে কিচ্ছুটি বলবে না,” ফুলটস বল পেয়ে শিবেন মুর্মু হাত খুলে পেটাতে শুরু করল। ঠিক এই মুহূর্তে তিতিসার মা নিজেকে দৃশ্য থেকে সরিয়ে নেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করে, একটা পানসে অজুহাত খাড়া করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

শিবেন মুর্মু দেখল এই সুযোগ, বউদিমণিকে যেমন করে হোক বোঝাতেই হবে দাদাবাবুর অবস্থাটা। তিতিসার অভিমান ভাঙিয়ে তাকে যে কোনও উপায়ে বেঙ্গালুরুতে নিয়ে যাওয়াটাই এখন লক্ষ্য তার। সে জন্যই তার কলকাতা আগমন। এই পরিকল্পনা একান্তভাবেই তার নিজের। তার জন্য দাদাবাবুর কাছে মিথ্যে অজুহাতে ছুটি নিয়ে আসতে হয়েছে তাকে। মাছের মুড়োতে হলুদ মাখাতে মাখাতে বুকে সাহস সঞ্চয় করে সে বলেই ফেলল কথাটা, “বউদিমণি, একা থেকে থেকে দাদাবাবুর স্বভাব খারাপ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু! আমি তোমাকে সাবধান করে দিলাম, হ্যাঁ!”
“বেশি মদ-টদ খাচ্ছে বুঝি?” তিতিসা মুচকি হাসল।
“দাদাবাবু কোনও দিনই বেশি মদ খায় না।”
“তবে? জুয়ো খেলা ধরেছে?”
“তুমি বিশ্বাস করছ না তো, বুঝতে পারছি।”
“আরে বাবা, বলবে তো কী খারাপ স্বভাব গ্রো করেছে মহামানবের?” তিতিসা গোল-গোল চোখ করে তাকাল, “না বললে বুঝব কী করে বলো তো!”
“এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে...” শিবেন মুর্মু তোতলাতে শুরু করল, “আমি তোমায় কী করে যে বলি...”
“হোয়াট ননসেন্স! কী আজেবাজে বকছ তখন থেকে?”
“বউদিমণি, ব্যস্ততার জন্য মানুষ আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে আত্মীয়স্বজনের থেকে। তার মনে ভিড় করছে একাকিত্ব, হতাশা। আসছে অবসাদ। এ কথা তুমি মানবে তো?”
“নিকুচি করেছে ওই হতাশা, একাকিত্ব, অবসাদের,” তিতিসার উদ্বেগের পারদ চড়ছে ক্রমশ, “আমি এ সব শুনতে চাই না।”
“ঠিক আছে আর বলব না, আমার ঘাট হয়েছে।”
“বলবে না মানে? ইয়ার্কি পেয়েছ? বলো কী হয়েছে? কে ওই ভদ্রমহিলা? তার সঙ্গে কী হয়েছে তোমার দাদাবাবুর?”
“হয়নি কিছুই,” শিবেন মুর্মু চারপাশটা দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বলল, “ঘন ঘন যাওয়া আসা চলছে এখন!”
“মানে? কে যাচ্ছে? কে আসছে? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।”
“না, মানে দাদাবাবু যায়নি, ভদ্রমহিলাই বারদুয়েক এসেছেন দাদাবাবুর কাছে, এই আর কী!”
“আর তুমি আসতে দিলে?” কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিতিসা গম্ভীর গলায় বলল, “দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।” তারপর আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

শিবেন মুর্মু ভাবল, ওষুধ ধরেছে তা হলে। সে মনে মনে অপার আনন্দ

অনুভব করল। কিন্তু এই আনন্দ তার স্থায়ী হল না মোটেও। মুহূর্তখানেকের মধ্যেই তার মনে হল, যতটুকু কাল্পনিক স্বভাব খারাপের কথা সে বউদিমণিকে বলেছে, তার চেয়েও অনেক বেশি সত্যিকারের স্বভাব খারাপের ইঙ্গিত সে পেয়েছে দাদাবাবুর মধ্যে, যা বউদিমণিকে বলা কোনও দিন সম্ভব নয় তার পক্ষে। কোনও ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার দাদাবাবুর প্রেমের সম্পর্ক যে গড়ে ওঠেনি এ যেমন সত্যি, তেমনই সত্যি সে নিজের চোখে দেখেছে দাদাবাবুকে দেহোপজীবিনীর সঙ্গে রাত্রিযাপন করতে। প্রথমে সে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারেনি, পরে সেই চোখ উপড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়েছে ঘৃণায়, লজ্জায়, অনুকম্পায়...

বেঙ্গালুরুতে এসকর্ট সার্ভিসের রমরমা ব্যবসার কথা শিবেন মুর্মুর অজানা নয়। তাকে লুকিয়ে প্রথমবার যখন আবির দাদাবাবু হোটেলে রাত কাটাতে গেল, সন্দেহ তখনই দানা বেঁধেছিল শিবেন মুর্মুর মনে। দ্বিতীয় তথা শেষবার শিবেনদা ফলো করল তাকে, রীতিমতো ঝানু গোয়েন্দার ঢঙে। ছদ্মবেশে গ্রাউন্ড ফ্লোরের ডরমিটরিতে বেড ভাড়া নিয়ে, রাতভর চারতলা পর্যন্ত ওঠানামা করে, শেষে ভোররাতের আলো-আঁধারিতে আবিরের ঘর থেকে যে ভদ্রমহিলাকে বেরিয়ে এসে ক্যাব ধরতে দেখল, তাকে চিনে রাখা সম্ভব না হলেও, আপাদমস্তক পরখ করে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল শিবেন মুর্মু। রীতিমতো বয়স্ক ভদ্রমহিলার চামড়া কুঁচকে যাওয়া মুখ দেখে তার প্রথম অনুভূতি ছিল নিজের প্রতি অবিশ্বাস। পরে অনুতাপ, লজ্জা, ঘেন্না! আজন্ম অকৃতদার মানুষটি এরপরই সিদ্ধান্ত নেয়, যেভাবে হোক বউদিমণিকে দাদাবাবুর কাছে নিয়ে আসতে হবে। পরিস্থিতির আরও অবনতি হওয়ায় আগে এ কাজটুকু তাকে অন্তত করতেই হবে। তার মেধা ও মানসিকতায় সে এটুকুই উপলব্ধি করেছিল, স্বামী-স্ত্রীর ঝামেলা মিটে গেলে এবং পরস্পর একসঙ্গে থাকতে শুরু করলে, দাদাবাবুর তথাকথিত খারাপ স্বভাব অচিরেই সংশোধিত হয়ে যাবে... হয়তো বা!

সোনামুগ ডাল, মাছের মাথা দিয়ে লাউ, কুমড়ো ফুলের বড়া, মুরগির ঝোল, টোম্যাটোর চাটনি...তবু খাওয়াদাওয়া সেভাবে জমল না! তিতিসার মনে এই যে এক রাশ উৎকণ্ঠা ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে শিবেন মুর্মু, এখানেই তার প্রথম রাউন্ড জেতা হয়ে গিয়েছে। পরদিন ভোরের ফ্লাইটেই তিতিসা বেঙ্গালুরু যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। ফেললে কী হবে, দিনভর কোনও টিকিট না-পেয়ে শেষমেশ অনেক বেশি দাম দিয়ে মাঝরাতের দু'খানা এয়ার টিকিট জোগাড় করল কোনও রকমে। মা-বাবা তো আনন্দে আত্মহারা, "সাবধানে যাস মা, দুগ্গা দুগ্গা!"

"জানি না আবার কবে দেখা হবে, তোমরা খুব সাবধানে থেকো।"

"একদম চিন্তা করিস না, তুই ভাল থাকলেই আমরা ভাল থাকব।"

"ওষুধটা ঠিক মতো খেয়ো বাবা, আর মাকে একদম টেনশন দেবে না।"

"এয়ারপোর্টে নেমেই হোয়াটস্অ্যাপ করবি, কেমন?"

বেঙ্গালুরুর দু'কামরার ছোট্ট ভাড়া বাড়ির আকাশে তখন ভোর তিনটের চাঁদ টলটল করছে। অনতিদূরে গাড়ি থেকে নামতে নামতেই তিতিসা আর শিবেন মুর্মু অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করল, আবিরের ঘর থেকে কোনও এক মহিলা বেরিয়ে এসে বড় রাস্তায় পা রাখল। স্পষ্ট শোনা গেল আবিরের দরজা বন্ধ করার আওয়াজ। তিতিসার মাথা বনবন করে ঘুরছে। সারা গায়ে একটা ঘিনঘিনে অনুভূতি। মৌহূর্তিক বিপন্নতা সামলে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে সে সিদ্ধান্ত নিল মহিলার মুখোমুখি হওয়ার।

একটু এগোতেই তিতিসা দেখল, মহিলাও তাকে লক্ষ করছে। পরনে ছাই রঙের শাড়ি, ম্যাট ফিনিশ, হাইনেক ফুলস্লিভ ব্লাউজ, চুল খোঁপা করে বাঁধা, কানে বেলকুঁড়ি, হাতে লোহা বাউটি, বাঙালি। আরও এগোতে স্পষ্ট হল, বয়স অনেকখানি। হাতের চেটোয়, গালে ও কপালের চামড়ায় সে ইঙ্গিত স্পষ্ট। পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে যেন গুলি ছুড়ল তিতিসা, "বেশ্যা?" তারপর আক্রান্তকে কিছুমাত্র প্রতিরোধের সুযোগ না-দিয়েই আঙুল উঁচিয়ে বলে উঠল, "এসকর্ট সার্ভিস আজকাল এই ক্যাটেগরির বুড়ি দিয়েও বিজনেস গেন করছে?"

"মাফ করবেন, আমি এসকর্ট সার্ভিসের সঙ্গে যুক্ত নই," বিনীতভাবে মহিলা উত্তর দিল।

"তবে কোন সার্ভিসে রাতের অন্ধকারে এমন গা ঢাকা দিয়ে বেরতে হয়?"

"ম্যাম, আমি একজন কাডলার। যেহেতু প্রফেশনালি কাজ করি, তাই আপনার কোনও প্রশ্নেরই উত্তর না দিয়ে চলে যেতে পারতাম, কিন্তু যাব না তার কারণ..."

তিতিসার মতো মুম্বই-কলকাতা-বেঙ্গালুরু করা মেয়ের কাডলিং সার্ভিসের কথা একেবারে অজানা হওয়ার কথা নয়। সে জানে, পশ্চিমের দেশগুলোতে পেশাদার কাডলার ভাড়া নেওয়া খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। এই পরিষেবার সুফল এবং জনপ্রিয়তা ইদানীং এতটাই ঊর্ধ্বমুখী যে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতেও সম্প্রতি আমদানি হতে শুরু করেছে এই পেশা। কাডলিং সার্ভিস বলতে সে বোঝে, কিছু মানুষকে অর্থের বিনিময়ে ভাড়া করে আনা, যে কি না ক্লায়েন্টকে জড়িয়ে ধরে বসে বা শুয়ে থাকবে, কপালে হাত বুলিয়ে দেবে, চুলে বিলি কেটে দেবে। এই সব স্পর্শগুলো বা আদরগুলোর সঙ্গে যৌনতার কোনও সম্পর্ক থাকবে না। বেশিরভাগ কাডলারই হন মহিলা, এবং মহিলারাও নাকি মহিলা কাডলার নিয়ে থাকেন অনেক সময়ে। কিছু দিন আগে একটা মেয়েদের ম্যাগাজ়িনে তিতিসা পড়েছিল, মানুষের একাকিত্ব ও অবসাদ ঘোচানোর এ এক আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। কাডলারদের কাজই হল জড়িয়ে ধরে থাকা— রীতিমতো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কোর্স করে এই কাডলিং শিখতে হয়। সামনে থেকে জড়িয়ে ধরে থাকাকে বলে কাডলিং, পিছন থেকে স্পুপিং, জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকাকে স্নুগলিং... এই রকম সব নাম আছে কত! মনস্তত্ত্ববিদরা বলেন, আলিঙ্গন নাকি মানুষের মনখারাপ বা একাকিত্ব ঘোচানোর সবচেয়ে দ্রুত ফলদায়ক ওষুধ। তিতিসা কিঞ্চিৎ গলা নামিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, "কী কারণ?"

"কারণ আপনার হাজ়ব্যান্ড ভীষণ একা। বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকেই উনি রুগি হয়ে গিয়েছেন। ওঁকে সুস্থ করে তোলার দায় আপনার।"

তিতিসা শিবেন মুর্মুর দিকে তাকাল। তার মনে পড়ে গেল শিবেন মুর্মুর কথাগুলো। সত্যিই তো, শিবেনদা পইপই করে বলছিল আবিরের একাকিত্বের যন্ত্রণায় ছটফট করার কথা, হতাশা ও মানসিক অবসাদজনিত অসহায়তার কথা। সেই একই কথার প্রতিধ্বনি তো এই মহিলার গলাতেও! তবে কি সত্যিই সে কোনও নোংরা সম্পর্কে জড়ায়নি?

"আপনি সুস্থ করতে পারলেন না তা হলে?" তিতিসা ভাঙে কিন্তু মচকায় না।

"আমাদের কাজ সুস্থ করা নয় ম্যাম, সাময়িকভাবে একাকিত্ব ও মনখারাপ দূর করা। ক্লায়েন্টরা আমাদের ওয়েবসাইটে যোগাযোগ করেন বলেই আমরা পরিষেবা দিতে পৌঁছই," মহিলা তিতিসার কাঁধে হাত রাখল, "আপনি কি জানেন আপনার হাজ়ব্যান্ড তাঁর মাকে কতটা মিস করেন? মৃত মাকে একটু কাছে পাওয়ার নেশায় তিনি এই বৃদ্ধার পরিষেবা নিয়েছেন। একটা না-ঘুমোনো মানুষ বিগত কয়েক ঘণ্টা আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়েছেন, আর আমি মাথায় হাত বুলিয়ে গিয়েছি টানা। মাথায় হাত রাখলে, চুলে বিলি কেটে দিলে উনি মায়ের স্পর্শ পান, নিরাপত্তা পান, ঘুমোতে পারেন।" মহিলা ধীরে ধীরে হাত নামিয়ে নিল তিতিসার কাঁধ থেকে, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, "ভোর হয়ে আসছে, এইবার যাই? আমাদের সংস্থার লোক সামনেই অপেক্ষা করছে গাড়ি নিয়ে। এত কথা বলছি জানতে পারলে ওরা রিপোর্ট করে দেবে আমার নামে।"

তিতিসার রিভলভারের প্রত্যুত্তরে সে যেন মিসাইল ছুড়ে দিয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। হতভম্ব তিতিসা দেখল, সেই অপস্রিয়মাণ অন্ধকার থেকেই আচম্বিতে সাদা ধবধবে ভোরের আলো এসে পড়েছে ভাড়া বাড়ির বন্ধ দরজার কপাটে।

অলংকরণ: রৌদ্র মিত্র



রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ

প্রশাসনে মহিলারা

নেতৃত্বে যখন নারী

রাজা-রানির যুগ শেষ। নারী এখন নেতৃত্ব দিচ্ছে নির্বাচনে জিতে। গড়ে তুলছে নতুন ইতিহাস। অর্ধেক আকাশ ছাড়িয়ে ডানা মেলছে বাকি অর্ধেকের দিকেও। তেমনই কয়েকজন নেত্রীকে নিয়ে লিখেছেন সিজার বাগচী।



টানা ৭০ বছর ২১৪ দিন 'রাজত্ব' করেছেন রানি এলিজ়াবেথ আলেকজান্দ্রা মেরি। সাধারণ মানুষ যাঁকে চেনেন রানি দ্বিতীয় এলিজ়াবেথ হিসেবে। এত দীর্ঘদিন ধরে রাজত্ব ইতিহাসে দ্বিতীয় কোনও রানি কখনও করতে পারেননি। একমাত্র ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই ছাড়া বিশ্বের আর কোনও রাজারও খোঁজ পাওয়া যায়নি, যিনি এত দীর্ঘদিন ধরে মসনদে বসে থাকতে পেরেছেন। চতুর্দশ লুই রাজত্ব করেছিলেন ৭২ বছর ১১০ দিন। দীর্ঘ এই সময়কাল পেরিয়েও, এমনকী নিজের শেষদিনের গণ্ডি অতিক্রম করেও দ্বিতীয় এলিজ়াবেথ সমান প্রাসঙ্গিক। প্রশাসক হিসেবে তিনি কতটা দক্ষ ছিলেন, ভারতের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক সম্পর্ক— এসবের বিচার করবে ইতিহাস। তবে যে সময় মহিলারা তুলনামূলকভাবে 'দ্বিতীয় সারির নাগরিক' হয়েই জীবন কাটাচ্ছিলেন, সেই সময় বিশ্ব-প্রশাসনের ইতিহাসে তার উপস্থিতি যে কতটা জাজ্জ্বল্যমান, তা তো সকলেরই জানা! নিশ্চিত ভাবে এলিজ়াবেথের এই রেকর্ড আগামিদিনে ভাঙার মতো কেউ আসবেন না। কারণ, রাজা-রানির দিন শেষ। যে কয়েকজন রাজা-রানি এখনও বিশ্বের নানা প্রান্তে টিমটিম করে টিকে আছেন, তাঁদের অবস্থা ভিন্টেজ গাড়ির মতো। বছরে এক-আধদিন গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। রোজ-রোজ ওই গাড়িতে চড়া যাবে না। এখন সেই জায়গায় চলে এসেছেন নতুন নেতা-নেত্রীরা। তাঁরা এখন 'রাজত্ব'

সেই কোন ছেলেবেলায় ইন্দিরা গান্ধীর জমানা দেখেছি। মা-মাসি-কাকিমাদের দেখতাম ইন্দিরা গর্বে গরগর করছেন। একজন নারী দেশ চালাচ্ছেন। ১৫ অগস্ট লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছেন। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন।



ইন্দিরা গান্ধী


শেখ হাসিনা

> শেখ হাসিনার জীবনে এত উথালপাথাল যে তাঁকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে ধারাবাহিক উপন্যাস লেখা যায়। গোটা পরিবারকে হারিয়েছেন। তবুও হতোদ্যম না হয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ...

করছেন মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে। পুরুষদের পাশাপাশি বহু নারীও তুমুল ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ছিনিয়ে নিচ্ছেন সর্বোচ্চ পদের শিরোপা। বিশ্বের সব প্রগতিশীল দেশেই এখন এই ছবি দেখা যাচ্ছে। ভারতে তো বটেই। প্রশাসনে নারীদের গুরুত্ব অর্জনের এই ধারার পুরোধা যাঁরা, দ্বিতীয় এলিজ়াবেথকে তাঁদের অন্যতম বললে অত্যুক্তি হয় না নেহাত!

সেই কোন ছেলেবেলায় ইন্দিরা গান্ধীর জমানা দেখেছি। মা-মাসি-কাকিমাদের দেখতাম ইন্দিরা গর্বে গরগর করছেন। একজন নারী দেশ চালাচ্ছেন। ১৫ অগস্ট লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছেন। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। পূর্ব পাকিস্তানে খানসেনাদের পর্যুদস্ত করে গড়ে তুলতে সাহায্য করছেন নতুন রাষ্ট্র। বাংলাদেশ। সেই কাজ করতে গিয়ে পরোয়া করছেন না আমেরিকার মতো বিগ ব্রাদারের চোখ রাঙানিরও।

এমন নারী কি ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এসেছেন? আসেননি। তাই বিরোধীরা যতই ইন্দিরার বিরুদ্ধে বিষোদগার করুন, সাধারণ মহিলাদের কাছে তিনি তখন প্রায় ‘দুর্গা’। সেই সব মহিলারা কি খুব রাজনীতি সচেতন ছিলেন? পিছন ফিরে তাকালে জোর গলায় ‘হ্যাঁ’ বলতে পারব না। তা হলে?

এখন বুঝি, সেই সব গৃহবধূদের কাছে ইন্দিরা গান্ধী শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না। ছিলেন এক স্বপ্নপূরণ। অনেকটা সেই সত্তর দশকের যুবকদের মতো। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যাদের কিছুই করার ছিল না। ক্ষোভ চেপে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া। সেই যুবকেরা যখন পর্দায় দেখত অমিতাভ বচ্চন একা হাতে দুর্নীতি দমন করছেন, তখন কোথাও সেই চরিত্রে তারা নিজেদের



বেনজির ভুট্টো



আন সান সু কি

বেনজির ভুট্টোর উত্থান এমন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে। প্রচুর ঝড় পেরিয়ে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন ১৯৮৮ সালে। পাকিস্তানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। এখনও পর্যন্ত শেষ।

খুঁজে পেত।

তবে একা ইন্দিরা গান্ধী নন, বিশ্বের নানা প্রান্তে এমন বহু নেত্রী ছিলেন এবং আছেন, যাঁরা নিজের দেশকে নতুন দিশা দেখিয়েছেন। কেউ-কেউ এখনও দেখিয়ে চলেছেন। কখনও ঘুন ধরা অর্থনীতিকে মজবুত করেছেন। কখনও নিয়ন্ত্রণ করেছেন অরাজক পরিস্থিতি। পুরনো ধারণার গেটক্র্যাশ করে সেই নেত্রীরা বদলে দিয়েছেন ইতিহাস। হয়ে উঠেছেন সাধারণ মানুষের অনুপ্রেরণা। প্রথম সারিতে থাকা তেমনই কয়েকজনকে কাছ থেকে দেখার উদ্দেশ্যে এই লেখা।

শেখ হাসিনা

১৯৭৫ সালের ১৫ অগস্ট। শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পুরো পরিবারকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হল। পরিবারের সবাই মারা গেলেও বেঁচে গেলেন মুজিবুরের দুই মেয়ে। তাঁদের একজন শেখ হাসিনা। তিনিই বড়। তিনি তখন ছিলেন স্বামীর কাছে। পশ্চিম জার্মানি। এর পর দিল্লিতে এসে রাজনৈতিক আশ্রয়। ১৯৮১ সালে ফের বাংলাদেশে ফিরে যাওয়া।

ততদিনে তিনি আওয়ামি লিগ দলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। শেখ হাসিনার জীবনে এত উথালপাথাল যে তাঁকে নিয়ে স্বচ্ছন্দে ধারাবাহিক উপন্যাস লেখা যায়। গোটা পরিবারকে হারিয়েছেন। তবুও হতোদ্যম না হয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে। বারবার গৃহবন্দি হয়েছেন। প্রতিবাদ করেছেন রাস্তায় নেমে। প্রাণের ঝুঁকি ছিল। ছিল রাজনৈতিক ভাবে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

তবু মুজিবুর রহমানের বড় মেয়ে পিছু হটেননি। প্রবল লড়াই করেছেন। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট এরশাদের গদিচ্যুত হওয়ার পিছনে তাঁর ভূমিকা ছিল বিরাট।

এর পর বিএনপি যখন ক্ষমতায় এল, তখন তিনি বিরোধী দলনেত্রী। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৬ সালে হাসিনার দল বাংলাদেশে নির্বাচনে জয়ী হয়। তিনি হন প্রধানমন্ত্রী। টানা পাঁচ বছর সফল ভাবে সেই দায়িত্বে ছিলেন। দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা থেকে প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে গঙ্গার জল বণ্টন চুক্তির মতো অনেক কাজ করেছিলেন। তবু বিরোধী জোট আবার ক্ষমতায় আসে।

এর পর নতুন করে নির্বাচনে জিতে হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হন ২০০৯ সালে। সেই থেকে বাংলাদেশের উত্থানের সূত্রপাত। তাঁর হাত ধরেই বাংলাদেশের অর্থনীতি থেকে সমাজ নতুন ভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক যে অস্থিরতা দীর্ঘদিন বাংলাদেশকে কুরে-কুরে খেয়েছে, সেটাও অনেক নির্মূল করেছেন এই নেত্রী।

ভারতীয় উপমহাদেশে শেখ হাসিনা অবশ্যই একজন প্রথম সারির রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। যাঁর উপর ১৯ বার প্রাণঘাতী আক্রমণ করা হয়েছে। প্রতিবারই তিনি বেঁচে যান। নারী হিসেবে না ভেবে শুধু যদি একজন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবেও ভাবি তা হলেও প্রশ্ন উঠবে, এই মুহূর্তে এমন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কতজন রয়েছেন সারা বিশ্বে?

বেনজির ভুট্টো

শেখ হাসিনা ১৯ বারের প্রাণঘাতী হামলা সামলাতে পারলেও বেনজির ভুট্টো পারেননি। পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডির এক রাজনৈতিক সমাবেশে তাঁকে উদ্দেশ্যে করে এক দুষ্কৃতী পরপর গুলি ছুড়েছিল। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণও ঘটিয়েছিল। তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। সেটা ছিল ২০০৭ সাল। তবু তাঁর মতো নেত্রী পাকিস্তান কমই পেয়েছে। বাবা জুলফিকর আলি ভুট্টো ছিলেন একজন বিতর্কিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁর সময় ভারতের কাছে পাকিস্তান যুদ্ধে হেরেছিল। যে হারের বিনিময়ে দেশটা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যায়। গড়ে ওঠে নতুন রাষ্ট্র। বাংলাদেশ। শুধু তাই নয়, কিছুদিন বাদে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় জুলফিকরকে। এবং ফাঁসি দেওয়া হয়।

বেনজির ভুট্টোর উত্থান এমন রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে। প্রচুর ঝড় পেরিয়ে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন ১৯৮৮ সালে। পাকিস্তানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। এখনও পর্যন্ত শেষ। সেই দেশের সরকার তখন প্রায় দেউলিয়া। বিপুল ঋণের বোঝা ঘাড়ে। তা ছাড়া দেশ জুড়ে বেকারত্ব। অরাজকতা। সেই পর্বে পাকিস্তানে মাদক উৎপাদন এবং পাচার বেড়ে গিয়েছিল সাংঘাতিক। এমন পরিস্থিতিতে দু'বছরের বেশি তিনি নিজের ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেননি।

বেনজির দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হন ১৯৯৩ সালে। সেই সময় পাকিস্তানের নারী স্বাধীনতা থেকে শুরু করে শিল্পে বেসরকারিকরণের উপর জোর দেন। ভুলে গেলে চলবে না, অক্সফোর্ডে পড়ার সময়

তিনি ছিলেন অর্থনীতির ছাত্রী। তবু ভাই মুর্তাজার মৃত্যুকে ঘিরে জটিলতা দেখা দেয় তাঁর রাজনৈতিক জীবনে। এবং অনেকটা তার



অ্যাঞ্জেলা মার্কেল

১৯৯১ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া আন সান সু কি বোধ হয় সেই মুলুকের সবচেয়ে বিতর্কিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। কেন?

জেরেই বেনজিরের সরকার ফেলে দেন পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট লেগারি।

সেখানেই ইতি। বেনজির আর কখনও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেননি। বহু দুর্নীতির অভিযোগে তিনি তখন জেরবার। সেই দোষ কাটিয়ে তিনি দেশে ফিরেছিলেন ২০০৭ সালে। উদ্দেশ্য, পরের বছর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছিল তাতে ধরে নেওয়া হচ্ছিল, বেনজির তৃতীয়বার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন। কিন্তু মৃত্যু সেই পুনরুত্থান থামিয়ে দিল।

তবু তাঁকে আলাদা করে মনে রাখতে হবে। এক রক্ষণশীল সমাজে দাঁড়িয়ে নারী স্বাধীনতার কথা বলা এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য।

আন সান সু কি

বর্মা মুলুকের কথা বাঙালি সাহিত্যিকেরা বারবার লিখেছেন। সেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে অমিতাভ ঘোষ। কিন্তু ১৯৯১ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া আন সান সু কি বোধ হয় সেই মুলুকের সবচেয়ে বিতর্কিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। কেন? যে সু কি-কে নোবেল কমিটি শান্তি পুরস্কার দিয়েছিলেন, তিনিই ক্ষমতায় এসে মায়ানমারের রোহিঙ্গাদের উপর প্রবল অত্যাচার করা শুরু করেছিলেন। তখন প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল, সু কি কি আদৌ সেই পুরস্কারের মর্যাদা রাখতে পারছেন? এমনকী একদল এমন দাবিও তুলেছিলেন, ওই পুরস্কার ফিরিয়ে নিক নোবেল কমিটি। কারণ ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর আর কখনও দেখা যায়নি এশিয়ার কোনও দেশের এত মানুষ প্রাণ বাঁচাতে প্রতিবেশী দেশে গিয়ে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় চাইছে। এই ঘটনার জেরে এক ধাক্কায় সু কি-র ভাবমূর্তি তলানিতে এসে ঠেকেছিল।



প্রথম বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে মার্কেল

অভিজাত পরিবারে জন্ম সু কি-র। তাঁর বাবা আন সান-কে মায়ানমারের জাতির জনকের মর্যাদা দেওয়া হয়। ব্রিটিশদের হাত থেকে তিনিই মায়ানমারকে মুক্ত করেন। সু কি হলেন তাঁর ছোট মেয়ে।

বাবার মতো সু কি-ও দেশের কাজে এগিয়ে আসেন। মায়ানমারে তখন সামরিক শাসন। ১৯৮৮ সালে সেই সেনা শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্রী। আন্দোলনের জেরে তিনি হয়ে ওঠেন শাসকদের প্রধান শত্রু। ১৯৮৯-২০১০ সালের মধ্যে তাঁকে পনেরো বছর গৃহবন্দি রাখা হয়। এত দীর্ঘদিন ধরে খুব কম রাজনৈতিক বন্দিকেই আটকে রাখা হয়েছে। তাই সু কি-কে নিয়ে সারা বিশ্বে হইচই পড়ে গিয়েছিল। খুব দ্রুত পশ্চিমি দেশগুলোয় তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁকে গান্ধীর সন্তান আখ্যাও দিয়েছিল টাইম ম্যাগাজিন।

কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর সেই সু কি-র আচরণে রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে যায় পশ্চিমি দেশগুলো। বিশেষ করে রোহিঙ্গাদের উপর মায়ানমার সরকারের তুমুল অত্যাচারের পরও যখন সু কি চুপ, তখন আন্তর্জাতিক মহল ধীরে-ধীরে তাঁর পাশ থেকে সরে যেতে থাকে। মায়ানমারে দেখা যাচ্ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা। সেই সুযোগে ২০২১ সালে মায়ানমারের সেনাবাহিনী ফের দেশের দখল নিল। গ্রেফতার করা হল সু কি-কেও। অভিযোগ, ২০২০ সালে যে নির্বাচন হয়েছিল তাতে নাকি গন্ডগোল ছিল। ধাপে-ধাপে আরও অভিযোগ আনা হয়েছে। সেই সব অভিযোগের জেরে তিনি আপাতত জেলবন্দি।

তবু মায়ানমারে যেটুকু গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছিল, সেটা সু কি-র ওই সংক্ষিপ্ত জমানাতেই। এবং পনেরো বছর গৃহবন্দি জীবন কাটিয়েও যে নারী উঠতে পারেন সে দেশের ক্ষমতার শীর্ষে, তিনি আগামিদিনে কী করতে পারেন, এখনই আঁচ করা যাচ্ছে না।

অ্যাঞ্জেলা মার্কেল

কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রিতে পিএইচ ডি করেছেন। দীর্ঘদিন গবেষণার কাজে যুক্তি ছিলেন। বিজ্ঞানের উপর বিভিন্ন গবেষণাপত্রও আছে। সেই সব দিনে কি কেউ ভাবতে পেরেছিল কার্ল মার্ক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিজ্ঞানের ছাত্রী একদিন জার্মানির চ্যান্সেলর হবেন? এবং ২০০৫-২০২১ সাল পর্যন্ত অটুট থাকবেন ওই সর্বোচ্চ পদে! শুধু কি তাই? ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রধান নেত্রী হিসেবেও উঠে আসবেন। ২০১৬ সালের পর তাঁকে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর নারী হিসেবে মেনে নেবে দুই গোলার্ধ!

অ্যাঞ্জেলা মার্কেলের কেরিয়ারগ্রাফ এমনই চমকে দেওয়ার মতো। বার্লিনের প্রাচীন যখন ভেঙে দুই জার্মানিকে মিলিয়ে দিল, তখন অ্যাঞ্জেলাও বিজ্ঞানের প্রাচীর ভেঙে এসে পড়লেন রাজনীতিতে। ঠিক সেই সময় নয়। মাসখানেক বাদে। তবে দুই জার্মান মিলনের সূত্র ধরেই যে তাঁর রাজনীতিতে আসা এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

সাম্প্রতিক কালের বিশ্ব রাজনীতিতে অ্যাঞ্জেলা এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রধান হিসেবে তিনি ২০০৭-০৮ সালের বিশ্ব অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে সামলেছিলেন। ২০১০ সালে যখন শরণার্থী সমস্যায় ইউরোপ নাজেহাল, তখনও পথ দেখিয়েছিলেন। ২০১৯ সালে কোভিড এসে আছড়ে পড়ল জার্মানিতে। সেই

সময়ও দক্ষতার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন। এছাড়াও জার্মানির অর্থনীতি এবং পরিবেশ নিয়ে করা তাঁর কাজ বাকি দেশের কাছে শিক্ষণীয়। জার্মানির প্রথম মহিলা চ্যান্সেলর কিন্তু নিজের থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। চারবার নির্বাচনে জেতার পর পঞ্চমবার তিনি আর সেই পদের জন্য লড়তে চাননি। বরং জানিয়েছেন, এবার অবসর নিতে চান। এই ব্যাপারেও অ্যাঞ্জেলা মার্কেল অনেকের কাছে উদাহরণ হিসেবে থেকে যেতে পারেন।


মার্গারেট থ্যাচার

মার্গারেট থ্যাচার

দ্য আয়রন লেডি। ব্রিটেনের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে এই মন্তব্য এক রুশ সাংবাদিকের। সেই মন্তব্যই যেন মার্গারেট থ্যাচারের যথার্থ মূল্যায়ন। কড়া ভাবে তিনি দেশ শাসন করেছিলেন। কোন সময়ে? ১৯৭৯-৯০ সাল পর্যন্ত। যে সময়ে ব্রিটিশ সূর্য শুধু পশ্চিমে হেলেই পড়েনি, কোনওদিন যে আবার পূর্ব দিকে উঠবে তেমন সম্ভাবনাও ছিল ক্ষীণ। ব্রিটেনের অবস্থা ছিল অনেকটা 'জলসাঘর' ছবির বিশ্বম্ভর রায়ের মতো। অতীতের প্রবল গৌরব। কিন্তু ভাঁড়ার ফুরিয়ে আসছে।

মার্গারেট যখন নির্বাচিত হলেন, তখন ব্রিটেনে মুদ্রাস্ফীতি ভয়ঙ্কর আকার নিচ্ছে। বেকারত্ব চরমে। ওদিকে আর্জেন্তিনার সঙ্গে ফকল্যান্ড নিয়ে ঝামেলা বেধেছে। জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়নও মাথা চাড়া দিয়েছে। সমস্যা আরও ছিল। মার্গারেট শক্ত হাতে একে-একে সমস্যা মিটিয়েছেন।

আর্জেন্তিনার সঙ্গে যুদ্ধে জয় তো ব্রিটেনে তাঁকে আরও জনপ্রিয় করেছিল। পাশাপাশি ঝিমিয়ে পড়া ব্রিটিশ অর্থনীতিও গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছিল।

মার্গারেট থ্যাচারকে ব্রিটেন মনে রাখবে মুখ্যত অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য। বহু সরকারি প্রতিষ্ঠানের বেসরকারিকরণ ছাড়াও তিনি ট্রেড ইউনিয়নের দাপাদাপি অনেকটাই কমিয়ে দিতে পেরেছিলেন। ব্রিটেনকে এক মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে গিয়েছিলেন দ্য আয়রন লেডি।

কমলা পিরসাদ-বিসিসার

ত্রিনিদাদ দেশটার কথা শুনলেই মনে পড়ে যায় এক খিটখিটে সাহিত্যিককে। বিদ্যাধর সুরজপ্রসাদ নাইপল। ২০০১ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর ত্রিনিদাদ চলে এসেছে বিশ্ব সাহিত্যের মানচিত্রে।

কিন্তু গ্লোবে চোখ রাখলে দেখা যাবে রিপাবলিক অফ ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো হল ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের একেবারে দক্ষিণপ্রান্তের শেষ দেশ। আসলে মানচিত্রের উপর একটা ছোট্ট বিন্দু। কিন্তু বিন্দু হলেও সেই দেশে বিশ্বের প্রায় সব প্রান্তের লোকজনেরা থাকেন। ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা আছেন। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মানুষজনেরা আছেন। আছেন দক্ষিণ এশিয়ার দেশের লোকেরাও। আর আছে প্রবল দারিদ্র্য। খুনোখুনি। অরাজকতা। ২০১০ সালে ষষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কমলা পিরসাদ-বিসিসার যখন নির্বাচিত হলেন, তখন দেশটা এমনই নানা সমস্যার কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। কমলার সামনে ছিল বিরাট চ্যালেঞ্জ।

এখানে একটা কথা জানিয়ে রাখা দরকার। ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে কমলা প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহিলা যিনি কোনও দেশের রাষ্ট্র প্রধান হয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি কমনওয়েলথ-চেয়ার-ইন অফিস পদেও ছিলেন। মাত্র পাঁচ বছর তিনি ক্ষমতায় ছিলেন। সেই পাঁচ বছরে কমলা বিরাট অদলবদল কিছু না করলেও ওই ছোট্ট দেশে থাকা বিভিন্ন ধরনের মানুষজনদের মধ্যে মিলমিশ বজায় রাখতে পেরেছিলেন। এবং দেশের নড়বড়ে অর্থনীতিকে খানিক হলেও সোজা করেছিলেন।

ইন্দিরা গান্ধী

ভারতের একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী। ১৯৯৯ সালে বিবিসি-র বিচারে 'উয়োম্যান অফ দ্য মিলেনিয়াম'। জওহরলাল নেহরুর মেয়ে হিসেবে ইন্দিরা গান্ধী অনেক কিছুই দেখেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের অনেক ঘটনা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কীভাবে নেহরু এমন বিরাট বিপর্যস্ত দেশকে নতুন ভাবে গড়ে তুলেছেন। বাবার সঙ্গে বহু বিদেশ সফর করেছিলেন তিনি। সেই সব অভিজ্ঞতাই তাঁকে করে তুলেছিল ভবিষ্যতের নেত্রী।

নেহরুর মৃত্যুর পর ইন্দিরা সরাসরি প্রধানমন্ত্রী হতে পারেননি। মাঝখানে ছিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। তিনি হন ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী। সেই মন্ত্রিসভায় স্রেফ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর অতর্কিত মৃত্যুর পর মোরারজি দেশাইকে হারিয়ে ইন্দিরা হন দেশের প্রধানমন্ত্রী। সেটা ১৯৬৬ সালের কথা। সেই সময় থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত তিনি দেশ চালিয়েছেন। মাঝে তিন বছর বাদ। এর পর ১৯৮০ সালে আবার প্রধানমন্ত্রীর আসনে। তবে দ্বিতীয় দফায় বেশিদিন থাকতে পারেননি। ১৮৮৪ সালে দেহরক্ষীর গুলিতে মারা যান।

ইন্দিরা গান্ধী যে সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন, তখন স্বাধীন ভারতের বয়স ১৯ বছর। এক জটিল আবর্তের মধ্যে দিয়ে দেশ এগিয়ে চলছিল। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অশিক্ষার মতো বহু সংকটে তখন ভারত ভুগছে। তাই ইন্দিরা এক মোক্ষম স্লোগান তুলেছিলেন।


কমলা পিরসাদ-বিসিসার

'গরিবি হটাও'। এবং সত্যি নানা ধরনের প্রকল্প নিয়েছিলেন, যার জেরে দেশের পিছিয়ে পড়া বিরাট জনগোষ্ঠী সামনের সারিতে এগিয়ে আসতে পেরেছিল। ইন্দিরা গান্ধীর আর-একটা বড় অবদান, পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়ানো। এবং পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জয়। নিশ্চিত ভাবে ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব আর আসেননি। এক দিকে গরিমাময় উপস্থিতি, অন্য দিকে দৃঢ় সংকল্প। সেই সঙ্গে ক্ষুরধার রাজনৈতিক বিচক্ষণতা। ইন্দিরা গান্ধী শুধু ভারতের নয়। সারা বিশ্বের প্রথম সারির নেত্রীদের মধ্যে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন।

শুধু এই কয়েকজনই নন। বিশ্ব রাজনীতিতে আরও বহু নেত্রী অসামান্য কাজ করেছেন। করছেনও। আগামিদিনেও করবেন। এই ইতিহাস শেষ হওয়ার নয়। বরং যত দিন যাবে, এই ইতিহাসও প্রসারিত হবে নতুন দিগন্তে। নারী শুধু রাজনীতির অর্ধেক আকাশ জুড়েই থাকবে না। ছড়িয়ে পড়বে বাকি আকাশেও।


আকবরি মুর্গ

পুজোয় হাউস পার্টি করার মজাই আলাদা! অতিথিদের জন্য মুখরোচক খাবারও বানানো যায় সহজেই। রেসিপি বললেন দি অ্যাস্টর'এর এগ্‌জ়িকিউটিভ শেফ সঞ্জীব সাহু।

পুজোর পাঁচদিন হুল্লোড় অফুরান তো হবেই! তবে ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখতে সকলে পছন্দ করেন না। হাউস পার্টিই তাঁদের কাছে সেরা অপশন। যাঁরা কারও বাড়িতে যান, তাঁরা তো ঝাড়া হাত-পা! কিন্তু হোস্টদের তো খেটে, ঘেমে, সসেমিরা অবস্থা হয়ে যায় অতিথি আসার আগেই। তারপর তাঁরা আর কতটাই বা মজা করবেন? এ সব ভেবেই নিজের বাড়িতে হাউস পার্টির আয়োজন করতে পিছিয়ে যাচ্ছেন বুঝি? নো পরোয়া, আমরা তো আছি! এমন সব পদ সাজিয়ে দিলাম, যা জিভে জল-আনা তো বটেই, বানানোতেও ঝামেলা নেই।


মুর্গ চকোরি কাবাব

আকবরি মুর্গ

উপকরণ: দেশি ঘি ২০ গ্রাম, রিফাইন্ড অয়েল ৫০ মিলি, বাসমতি চাল ৫০ গ্রাম, গোটা চিকেন ১টা (৬০০ গ্রাম ওজনের), স্লাইস করা পেঁয়াজ ৩০ গ্রাম, মাখন ২০ গ্রাম, ক্রিম ২০ গ্রাম, খোয়া ২০ গ্রাম, জল-ঝরানো টক দই ৩০ গ্রাম, বেসন ৫০ গ্রাম, গাজর ৫০ গ্রাম, ফুলকপি ৫০ গ্রাম, টোম্যাটোকুচি ২০ গ্রাম, ধনেপাতা ২০ গ্রাম, ডিম ১টা, পেঁয়াজ-টোম্যাটোর গ্রেভি ৮০ গ্রাম, কাবাব মশলা ১০ গ্রাম, নুন ১০ গ্রাম, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো ৫ গ্রাম, আদা-রসুনবাটা ৫০ গ্রাম, কাঁচালঙ্কাবাটা ৫০ গ্রাম।



প্রণালী: ডিম সেদ্ধ করে রাখুন। মুরগি ৪ টুকরো করে কেটে একটা পাত্রে নিন। এতে মেশান নুন, জল-ঝরানো টক দই, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো, লেবুর রস, আদা-রসুনবাটা আর কাবাব মশলা। ভাল করে মিশিয়ে নিয়ে, ১৫ মিনিট রাখুন। তারপর শিকে গেঁথে, তন্দুরে রেঁধে নিন ১৫ মিনিট। প্যানে ঘি গরম করে, তাতে কাঁচালঙ্কা আর পেঁয়াজের স্লাইস দিন। স্বচ্ছ না হওয়া অবধি নাড়াচাড়া করতে থাকুন। তারপর আদা-রসুনবাটা আর টোম্যাটোকুচি মেশান। নুন দিন আন্দাজমতো, তা হলে টোম্যাটো তাড়াতাড়ি রান্না হবে। তারপর চিকেন এবং বাকি সব মশলা দিয়ে দিন। রাঁধতে থাকুন, যতক্ষণ না সবদিক ভালভাবে রান্না হয়। দই দিয়ে, ঢাকা দিয়ে দিন। মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে, পেঁয়াজ-টোম্যাটোর পেস্ট, কিছুটা ধনেপাতাকুচি আর ১/২ কাপ জল মেশান। সবজিগুলো অল্প তেলে ভেজে নিন,

কাঁচালঙ্কাবাটা আর বাকি ধনেপাতাকুচি দিয়ে। সার্ভিং ডিশে পরপর চিকেন, সবজি আর ভাত সাজিয়ে দিন। সবকিছুর উপরে সেদ্ধ ডিম রেখে পরিবেশন করুন।

মুর্গ চকোরি কাবাব

উপকরণ: বেসন ১০ গ্রাম, নুন ৫ গ্রাম, রিফাইন্ড অয়েল ১০ মিলি, কসুরি মেথি ১০ গ্রাম, বোনলেস চিকেন লেগ ২০০ গ্রাম, মাখন ২০ গ্রাম, জল-ঝরানো দই ২০ গ্রাম, কাঁচালঙ্কা ৫ গ্রাম, ধনেপাতা ৫ গ্রাম, লেবু ১টা, পুদিনাপাতা ২৫ গ্রাম, রসুন ২৫ গ্রাম, কাবাব মশলা ৫ গ্রাম, পুদিনার চাটনি ৫০ গ্রাম, তন্দুরি স্যালাড ৩০ গ্রাম।

প্রণালী: মিক্সার গ্রাইন্ডারে ধনেপাতা, পুদিনাপাতা, লঙ্কা আর বেসন মিশিয়ে পেস্টের মতো করে নিন। একটা পাত্রে এই পেস্ট নিয়ে, তার সঙ্গে দই, নুন, কাবাব মশলা, কসুরি মেথি, তেল, লেবুর রস, রসুনবাটা দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। এতে চিকেন লেগ দিয়ে, মিশিয়ে নিন ভালমতো। তন্দুরি শিকে গেঁথে, তন্দুরে রাখুন ১০ মিনিট। উপরটায় পোড়া-পোড়া রং ধরলে, গলানো মাখন ব্রাশ করে নিন। সার্ভিং প্লেটে সাজিয়ে দিন, সঙ্গে দিন পুদিনার চাটনি ও তন্দুরি স্যালাড।



মাশরুম মোতি টিক্কি

মাশরুম মোতি টিক্কি

উপকরণ: কাজুবাদাম ২০ গ্রাম, মাখন ৩০ গ্রাম, প্রসেস্ড চিজ় ৫০ গ্রাম, ঘন ক্রিম ৫০ গ্রাম, খোয়া ৩০ গ্রাম, সবুজ ক্যাপসিকাম ৫ গ্রাম, কাঁচালঙ্কা ৫ গ্রাম, আদা ৫ গ্রাম, লাল ক্যাপসিকাম ২০ গ্রাম, হলুদ ক্যাপসিকাম ৩০ গ্রাম, তাজা মাশরুম ২০০ গ্রাম, ছোট এলাচ ২ গ্রাম, নুন ১০ গ্রাম, পুদিনার চাটনি ৫০ গ্রাম, দইয়ের ডিপ ৫০ গ্রাম, তন্দুরি স্যালাড ৩০ গ্রাম।

প্রণালী: কাজু বেটে নিয়ে, একটা পাত্রে দইয়ের সঙ্গে মেশান। এতে কাঁচালঙ্কাকুচি, খোয়া, চিজ়, ক্রিম, আদাকুচি দিন। ভাল করে মিশিয়ে, মাশরুম আর ক্যাপসিকাম দিন এতে। শিকে গেঁথে, তন্দুরে রাখুন ১০ মিনিট। দইয়ের ডিপ, পুদিনার চাটনি আর তন্দুরি স্যালাডের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

রক চিলি শ্রিম্প

উপকরণ: কর্নফ্লাওয়ার ৩০ গ্রাম, ময়দা ৫০ গ্রাম, রিফাইন্ড অয়েল ৩০ মিলি, নুন ১০ গ্রাম, গোলমরিচ ১০ গ্রাম, ডার্ক সয়া সস ৫ মিলি, লাইট সয়া সস ৬ মিলি, টাটকা কুচোচিংড়ি ২০০ গ্রাম, সবুজ ক্যাপসিকাম ২০ গ্রাম, কাঁচালঙ্কা ৩ গ্রাম, পেঁয়াজ ১৫ গ্রাম, স্প্রিং অনিয়ন ১০ গ্রাম, আদা ৫ গ্রাম, রসুন ৫ গ্রাম, ডিম ১টা, লেবু ১টা, লঙ্কাবাটা ১০ গ্রাম।



রক চিলি শ্রিম্প

প্রণালী: একটা পাত্রে চিংড়ি নিন। তাতে নুন, গোলমরিচ, লেবুর রস আর ডিম ভেঙে মেশান। কয়েক মিনিট রেখে তারপর ময়দা আর কর্নফ্লাওয়ার মেশান। পুরোটা ভাল করে মিশে গেলে, তেল গরম করে সোনালি করে ভেজে নিন। আবার তেল গরম করে, আদা, রসুন, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, কাঁচালঙ্কা, দু'রকমের সয়া সস, লঙ্কাবাটা, নুন, গোলমরিচ দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। তারপর ভাজা চিংড়ি মিশিয়ে মিনিটখানেক টস করে নিন। স্প্রিং অনিয়ন ছড়িয়ে সার্ভ করুন।

পুজোয় জমজমাট হাউসপার্টির আয়োজন যে কম খাটুনিতেও হয়ে যায়, দেখলেন তো?

যোগাযোগ: ২২৮২৯৯৫০/৫৭/৫৮/৫৯

নানা ধরনের ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ ভরা ডিমে। 'গুড কোলেস্টেরল'এর মাত্রা বাড়ানো থেকে হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমানো, ডিমের জুড়ি মেলা ভার!





শিক্ষক দিবসে বিশেষ উদযাপন

পুজোয় মুক্তি পাচ্ছে 'কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন'। তারই প্রচার অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে ছবির কলাকুশলীরা বাচ্চাদের সঙ্গে উদযাপন করলেন শিক্ষক দিবসের দিনটি। নব নালন্দা, রাজা রামমোহন মিশন, টাকি বয়েজ়-সহ একাধিক স্কুলে স্কুলে ঘুরলেন তাঁরা। সময় কাটালেন ছোটদের সঙ্গে। আবির চট্টোপাধ্যায় ও ছবির পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় বাচ্চাদের নানা প্রশ্নের উত্তরও দিলেন। হাজির ছিলেন ছবির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুই চরিত্র অর্জুন চক্রবর্তী ও ইশা সাহা। বাচ্চাদের জন্য ছবির ট্রেলারও দেখানো হল স্কুলগুলোতে। স্বভাবতই এতজন প্রিয় অভিনেতাকে একসঙ্গে পেয়ে খুশি খুদেরা।

পোশাক বিপণির উদ্যোগ

সম্প্রতি এক জনপ্রিয় ফ্যাশন ব্র্যান্ডের উদ্যোগে আয়োজিত হল এক বিশেষ অনুষ্ঠান। পুজো উপলক্ষে ২০ জনেরও বেশি প্রান্তিক মহিলা ও শিশুদের বস্ত্র



বিতরণ করা হল শহরের এক জনপ্রিয় শপিং মলে। এ ছাড়াও এই উপলক্ষে একাধিক এনজিওর সঙ্গে মিলে কাজ করছে এই পোশাক বিপণি ব্র্যান্ড। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তী ও ইশা সাহা। একইসঙ্গে একটি ফ্যাশন শো-ও অনুষ্ঠিত হয় সেদিন।



গানে গানে পুজো

প্রবাসের দুর্গাপুজোর মধ্যে ইউএসএ-র নাম আলাদা করে উল্লেখ করতেই হয়। এখানে বসবাসকারী বাঙালি বেশ জাঁকজমকপূর্ণ দুর্গোৎসবের আয়োজন করেন প্রতিবার। এবারেও তার ব্যতিক্রম নয়। ইমন চক্রবর্তী, সোমলতা আচার্য, শোভন গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্র-সৌম্যজিৎ-এর মতো শিল্পীরা এবারে পারফর্ম করলেন আমেরিকার মাটিতে। আয়োজনে জোনাই সিং। তাঁরই তত্ত্বাবধানে কলকাতায় ইমন চক্রবর্তী, শোভন গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন আগমনী গানও মুক্তি পেল পুজোর প্রাক্কালে। সবমিলিয়ে গানে গানে পুজো কাটুক...

কেকে-কে স্মরণ

সম্প্রতি শহরের এক অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল এক গানের অনুষ্ঠান যার মাধ্যমে স্মরণ করা হল সঙ্গীতশিল্পী কেকে-কে। শুধু তা-ই নয়, এই অনুষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় করা হবে দুঃস্থ বাচ্চাদের হার্ট সার্জারিতে। গান গাইলেন ঊষা উত্থুপ, সপ্তক ভট্টাচার্য, দেবজিৎ সাহা, দুর্নিবার সাহা, গৌরব সরকার, শোভন গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীরা।





কনটেন্ট-উৎসব

কনটেন্ট ক্রিয়েশন বিষয়ক তিন দিন ব্যাপী এক কনটেন্ট ফেস্ট অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সম্প্রতি। বিভিন্ন সেমিনারে হাজির ছিলেন ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বরা। সৌম্যজিৎ মজুমদার ও 'শেরনি'র পরিচালক অমিত মাসুরকরের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় আলোচনাসভা। হাজির ছিলেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য, ঋদ্ধি সেন, ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিজ়াইনার অভিষেক রায়-সহ নানা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।



পটচিত্রশিল্পীকে সম্মান

বিশিষ্ট পটচিত্র শিল্পী কল্পনা চিত্রকরকে সম্মান জানানো হল সম্প্রতি। পটশিল্পে তাঁর অবদানের জন্য জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন কল্পনা। দেব-দেবীদের ছবি ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনযাপনের নানা ছবি ফুটে ওঠে তাঁর শিল্পে। আর এ ব্যাপারে বরাবর কল্পনা পাশে পেয়েছেন তাঁর স্বামী নুরুদ্দিন চিত্রকরকে। করোনা অতিমারি নিয়ে সচেতনতামূলক পটচিত্রও বানিয়েছিলেন তিনি। তাঁর আশা, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানা মাধ্যমে পটচিত্রের ব্যবহার ও জনপ্রিয়তা আরও বাড়বে। সেভাবেই প্রসার পাবে এই শিল্প।

পুজো-স্পেশ্যাল মেনু লঞ্চ

‘কিচেন 165’ নিয়ে এল তাদের পুজোর মেনু। শহরেরই এক অভিজাত হোটেলে হয়ে গেল মেনু লঞ্চের অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন রিচা শর্মা, উষসী সেনগুপ্ত, অভিনেতা রাজীব বোস, অভিনেত্রী তিয়াশা রায়, ডিজ়াইনার ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায় সহ একঝাঁক তারকা। ষষ্ঠী থেকেই শুরু হচ্ছে এই আয়োজন, যেখানে থাকছে গন্ধরাজ চিকেন, দই-কাতলা, মাটন বিরিয়ানি ইত্যাদি। মনোরঞ্জনের জন্য থাকছে লাইভ ব্যান্ড, ডিজে মিউজ়িক। কথা প্রসঙ্গে উষসী সেনগুপ্ত বলেন,“আমার মতো প্রবাসী বাঙালিদের কাছে পুজোর আনন্দ মানেই পেটপুজো ও নবমীর মাংস-ভাত।”





শানের পুজোর গান

পুজোর আগে সংগীতশিল্পী শান নিয়ে এলেন তাঁর নতুন গান ‘কদম তলায় কে?’ এই উপলক্ষে শহরে উপস্থিত ছিলেন শিল্পী। ছিলেন গায়িকা জুন বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিনেত্রী তৃণা সাহা প্রমুখ। শানের কথায়, “ভিডিও ও গানটি পুজোর আগে আমার তরফ থেকে উপহার। পুরোপুরি এন্টারটেনিং ডান্স সং এটি। এর ছন্দ আর কোরাস শ্রোতারা উপভোগ করবেনই। আশা করছি মা দুর্গার আশীর্বাদে গানটিও সুপারহিট হবে।”



রিমি নায়কের নতুন স্টোর

সম্প্রতি ফ্যাশন ডিজ়াইনার রিমি নায়ক উদ্বোধন করলেন তাঁর প্রথম ফ্ল্যাগশিপ স্টোর। এতদিন তার ওর্য়কশপে লোকজন আসত কিন্তু এবার থাকছে নতুন স্টোর। উজ্জ্বল পপআপ কালার ও প্রিন্ট রিমির পোশাকের ইউএসপি। নতুন স্টোর সাজিয়েছেন দুধ সাদা রঙের ছোঁয়ায়। স্টোরের বাইরে আছে সবুজ প্রকৃতির আমেজে আড্ডার ব্যবস্থাও।

রুপো কথা

সম্প্রতি লঞ্চ হল ডিজ়াইনার কাস্টমাইজ়ড সিলভার জুয়েলারির অভিনব সম্ভার ইদনানা (Idnana)। এই কালেকশনে রয়েছে পারিজাত, জবা, গাঁদা ফুলের আদলে নতুন নতুন নানা ডিজ়াইনের রুপোর গয়না। রোজনামচা হোক কিংবা উৎসব-পার্বণ, এদের জুয়েলারি মানানসই সবেতেই। প্রেশাস ও সেমিপ্রেশাস রত্নের সঙ্গে ব্যবহৃত হয় ৯২.৫% হলমার্কের রুপো। এ ছাড়া বেশ কিছু নিখাদ রুপোর গয়নায় থাকে ২২ ক্যারেটের সোনার জলকাজও। এই ব্র্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা ও জুয়েলারি ডিজ়াইনার আনন্দী ভট্টাচার্য পুজোর মরশুমে আশাবাদী তাঁর নতুন কালেকশন নিয়ে। সাইটে গয়না দেখতে তো পাবেনই, সঙ্গে অনলাইনে কেনাকাটাও করতে পারবেন সহজেই। স্বভাবতই, গয়নাপ্রেমী বাঙালির কাছে পুজোর আগে এ এক সুখবর। কালেকশন দেখতে পারেন www.idnanacreations.com -এ।







ডেঙ্গু: লক্ষণ, চিকিৎসা ও সতর্কতা

ডেঙ্গু নিয়ে অযথা ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। খালি মাথায় রাখতে হবে কয়েকটি জরুরি বিষয়। বলে দিলেন সিনিয়র কনসালট্যান্ট, ইন্টারনাল মেডিসিন, ডা. অমিতাভ সাহা। লিখছেন সংবেত্তা চক্রবর্তী।

ডেঙ্গু। কোভিডের মতো নতুন অসুখ নয়, জানাশোনা রোগই। মার্চ-এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, বছরের এই সময় যে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ে, তা-ও জানা কথাই। কিন্তু এ বছর ডেঙ্গু নিয়ে আতঙ্কে ভুগছেন অনেক মানুষই। গত দু'বছর কোভিডের বাড়বাড়ন্তের সময় ডেঙ্গু বা ম্যালেরিয়া, এই অসুখগুলোর উৎপাত তুলনায় কম ছিল। এ বছর প্রকোপ বেড়েছে আবার। তা বলে আতঙ্কিত হবেন না। ডেঙ্গু নিয়ে কয়েকটা জরুরি বিষয় খালি মনে রাখুন এবং তেমন পরিস্থিতিতে পড়লে, মেনে চলুন। তা হলেই রোগের সঙ্গে লড়াইটা আর তত ভয়ানক হবে না।

জমা জলেই মশা বাড়ে...

এ ব্যাপারে আমরা জানি, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আর একবার মনে করে নেওয়া দরকার। ডেঙ্গুর মশার প্রজনন হয় পরিষ্কার জমা জলে। নালা-নর্দমায় অনেক মশা দেখা যায় ঠিকই, কিন্তু কোনওটাই ডেঙ্গুর মশা নয়। আর 'ফ্লোয়িং ওয়াটার', অর্থাৎ জল যেখানে বয়ে যাচ্ছে, সেখানেও ডেঙ্গুর মশা জন্মাবে না। ফলে বর্ষাকালে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ে। বাড়িতে যাতে জল না জমে, সে বিষয়ে তাই সচেতন থাকতে হবে। অনেকের বাড়িতে ছাদে ভাঙা টব থেকে যায়, বৃষ্টি হলে তাতে জল জমে। কোথাও আবার হয়তো পাখির জন্য জল দেওয়া হত, পাখি আর নেই কিন্তু জলটা ফেলে দেওয়া হয়নি। এই জিনিসগুলো সম্পর্কে নিজেরা একটু

সচেতন থাকুন। বাড়িতে কোথাও জল জমতে দেবেন না।

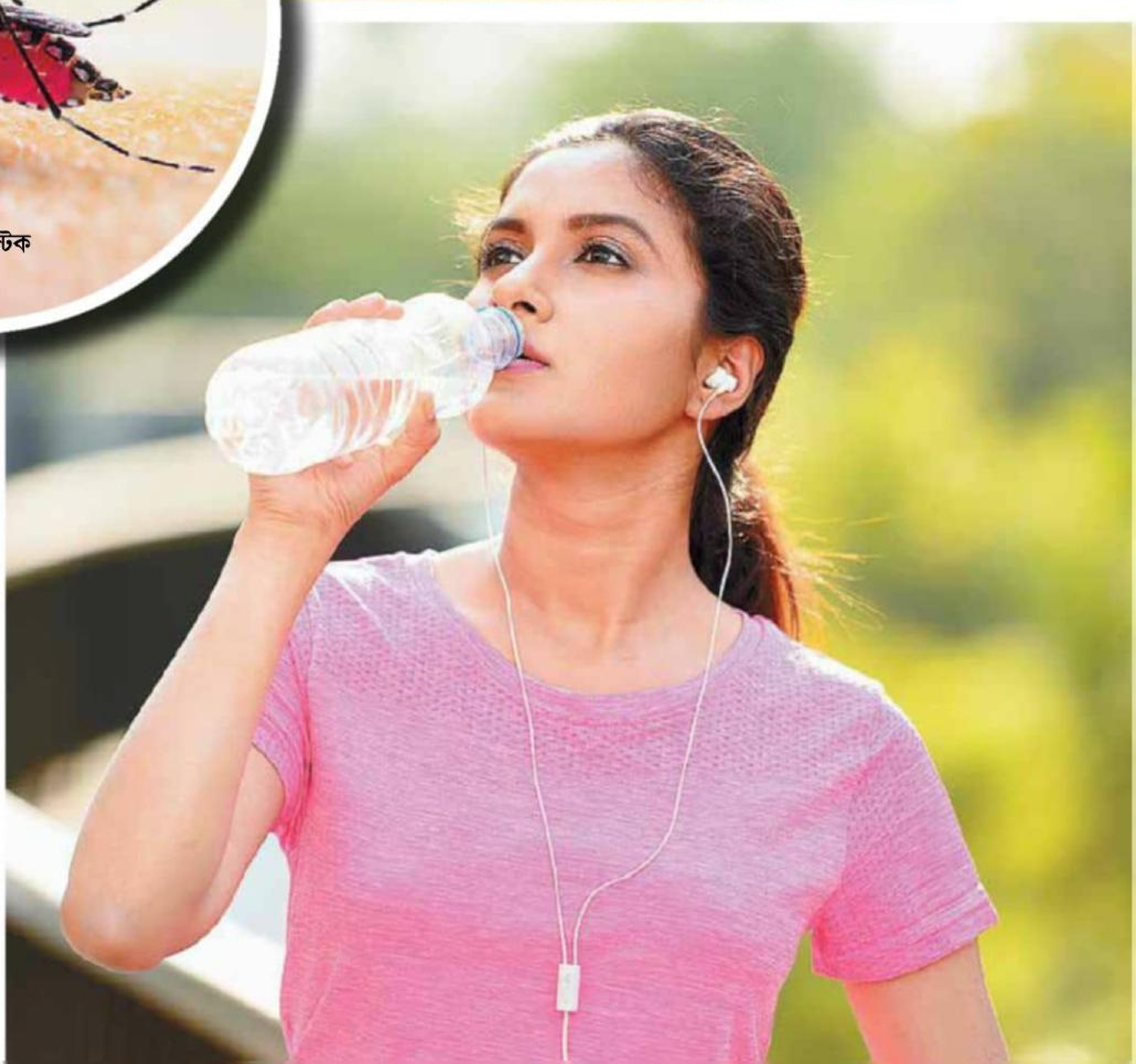
জ্বর-জ্বালা-যন্ত্রণা

ডেঙ্গুর কিছু লক্ষণ আছে, যেগুলো কারও মধ্যে দেখা দিলেই সতর্ক হতে হবে। সেগুলো হল— জ্বর, মাথাব্যথা, চোখের পিছনে ব্যথা, গায়ে-হাত-পায়ে ব্যথা। জ্বর খুব বেশিও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে ডেঙ্গু হয়েছে না ম্যালেরিয়া, সেটা বোঝা আগে দরকার। সে জন্য অসুস্থ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ তাড়াতাড়ি নিতে হবে। অনেক সময় এ ধরনের শারীরিক সমস্যায় আমরা সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখাই না। গুরুত্বই দিই না ততটা। কিন্তু মনে রাখুন, ডেঙ্গুর মশা ২০০ মিটার অবধি উড়তে পারে। ফলে বাড়িতে বা আশপাশে কারও যদি ডেঙ্গু হয়ে থাকে বলে জানেন, এবং আপনার নিজের জ্বরজারি হয়, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। তাঁকে বুঝতে হবে আপনার অসুখটা ঠিক কী। তবেই দ্রুত সঠিক চিকিৎসা করতে পারবেন তিনি। এই সময় জ্বর-জ্বালা হলে এমনিতেই সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়ে নেওয়াই ভাল। নির্দিষ্ট কোনও এজ গ্রুপের মানুষের ডেঙ্গুর আশঙ্কা বেশি, এ রকমও কোনও ব্যাপার নেই। ডেঙ্গুর মশা কামড়ালেই বিপদ। ফলে, 'আমার তো বয়স কম, আমি সামলে নিতে পারব'— এ রকম ভেবে ডাক্তারের পরামর্শ না নেওয়া কিন্তু বোকামি ছাড়া কিচ্ছু নয়। আগে যদি কারও ডেঙ্গু হয়ে যাবে, পরেরবার তাঁর কিন্তু সিভিয়রিটির আশঙ্কা বেশি। এ রকম কিছু হয়ে থাকলে সেটাও চিকিৎসককে জানাতে ভুলবেন না।





ছবি: আইস্টক



চিকিৎসকের কথা শুনুন

ডেঙ্গু যদি ধরা পড়ে, তারপর আপনার বাড়িতে থাকা উচিত নাকি ভর্তি হওয়া— এ বিষয়ে চিকিৎসক যা বলবেন, সেটাই মেনে চলুন। ডেঙ্গুর ফেজ় বা পর্যায় তিনটি। প্রথম পর্যায়ে রোগীর জ্বর আসবে এবং থাকবে তিন-চার-দিন। দ্বিতীয় পর্যায়ে জ্বর ছেড়ে যায়। কিন্তু প্লেটলেট কাউন্ট কমা, হিমোগ্লোবিন বাড়ার মতো সমস্যাগুলো দেখা দেয় এই সময়ই। রোগীর অবস্থার অবনতি হয়। তারপর সে ধীরে ধীরে সুস্থতার দিকে এগোয়। ফলে ঠিক সময়ে যদি রক্ত পরীক্ষা করে বুঝে যাওয়া যায় ডেঙ্গুই হয়েছে কি না, তা হলে পরের খারাপ সময়টার



জন্য প্রস্তুত থাকতে পারেন চিকিৎসকেরা। এই খারাপ সময়ের কিছু 'ওয়ার্নিং সাইন' রয়েছে। যেমন তাপমাত্রা ১০৪-১০৫ ডিগ্রি হয়ে যাওয়া, অত্যন্ত মাথা যন্ত্রণা, বার বার বমি হওয়া, প্রস্রাব কম হওয়া, স্কিনে র‍্যাশ হওয়া বা রক্ত জমা, মুখ থেকে রক্ত বের হওয়া, পিরিয়ড চললে প্রচুর ব্লিডিং হওয়া, ইত্যাদি। এগুলো হলে হসপিটালাইজ়েশনের প্রয়োজন হতে পারে। ফলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের নজরে আনুন বিষয়টা। সঠিক হাইড্রেশন, সঠিক চিকিৎসা হলে বড় কোনও বিপদ হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

এবার একটা বিষয় বেশি চোখে পড়ছে। তা হল, প্লেটলেট অস্বাভাবিক রকম কমে যাওয়া। অনেকের ক্ষেত্রেই এ রকম হচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কোন ধরনের রোগীকে প্লেটলেট দিতে হবে এবং কাকে দিতে হবে না, কতটা কমলেই বা প্লেটলেট দেওয়া উচিত— এ ব্যাপারে খুব স্পষ্ট রূপরেখা রয়েছে চিকিৎসকদের কাছে। ডেঙ্গুতে প্লেটলেট কমে যাওয়ার অনেক কারণ থাকতে পারে। একটা কারণ হল, রোগীর ইমিউন সিস্টেম এমনভাবে অ্যাকটিভেটেড হয়ে থাকে, যে তা প্লেটলেটকে নষ্ট করে দেয়। এবার বাইরে থেকে যদি প্লেটলেট ঢোকানো হয় শরীরে, তা হলে ইমিউন সিস্টেম আরও অ্যাকটিভেট করে, প্লেটলেট আরও নষ্ট হতে পারে। ফলে শুধু শুধু প্লেটলেট দেওয়াটাও ক্ষতিকর হতে পারে। রোগীর পরিজনদের একটু ধৈর্য রাখতে হবে এ ক্ষেত্রে। কী করা উচিত, সে ব্যাপারে চিকিৎসকই ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

খাওয়াদাওয়ার নিয়ম

সাধারণ বাড়ির রান্না খান। যতটুকু খেতে পারবেন, সেটাই ভাল। কারণ লিভারও অ্যাফেকটেড হয় ডেঙ্গুতে। তবে হাইড্রেশন হওয়া খুব জরুরি। পর্যাপ্ত পরিমাণে জল এবং বাড়িতে তৈরি অন্যান্য তরল পদার্থ খেতে থাকুন। পেঁপে পাতার মতো কিছু 'হোম রেমেডি'র কথা শোনা যায় ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে। কিন্তু সেগুলো কার ক্ষেত্রে কেমন কাজ করবে, উলটে কোনও সমস্যা হতে পারে কি না— এ বিষয়েও চিকিৎসকদের পরামর্শই মেনে চলতে হবে।

বুঝতেই পারছেন, ডেঙ্গু কোনও ভয়াল-ভয়ঙ্কর রোগ নয়। সাধারণ কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা, সময়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া এবং সেই পরামর্শগুলো অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা— এই রোগের সঙ্গে লড়ার চাবিকাঠি এটাই। ফলে ঘাবড়ে না গিয়ে, মনে সাহস রাখুন। রোগ যদি হয়ও, রোগমুক্তি ঘটবেই।

যোগাযোগ: ৯৮৩০১৭৭৭৮৪



ছবি: আইস্টক



ত্বকের বিশেষ যত্ন



রোজকার প্রাথমিক যত্ন ছাড়াও কিছু প্রডাক্ট রূপরুটিনে থাকা আবশ্যক। সেগুলো কী কী এবং তার সঠিক ব্যবহারবিধি নিয়ে আলোচনায় রূপ বিশেষজ্ঞ শেহনাজ় হুসেন।

আমার মিশ্র, সেনসিটিভ ত্বক। সাধারণত ম্যাট সানস্ক্রিন ব্যবহার করি। সম্প্রতি জানতে পেরেছি, সানস্ক্রিনের নাকি অনেক ধরন হয়। যেমন কেমিক্যাল সানস্ক্রিন, মিনারেল সানস্ক্রিন, ইত্যাদি। কোনটা ত্বকের পক্ষে বেশি ভাল এবং কেন? কোনটা কোন ধরনের সানস্ক্রিন, চেনার কোনও উপায় রয়েছে কি? যদি এমন কোনও উপকরণ থাকে, যা এড়িয়ে চলা উচিত, তা-ও জানতে চাই।

উত্তমা বসু, ই-মেল মারফত

ময়শ্চারাইজ়ারের যেমন বিভিন্ন ধরন হয়, তেমনই সানস্ক্রিনেরও নানা ধরন রয়েছে। ত্বক যদি স্বাভাবিক থেকে তৈলাক্ত প্রকৃতির হয় বা মিশ্র এবং সেনসিটিভ ত্বক হয়, তাহলে ম্যাট বা জেল সানস্ক্রিন ভাল। যাঁদের রোজ দীর্ঘক্ষণ সূর্যের আলোয় থাকতে হয়, তাঁরা সানব্লক ব্যবহার করতে পারেন। মূলত যে সানস্ক্রিনই



ব্যবহার করুন না কেন, তা যেন ভাল মানের প্রডাক্ট হয়, তা নিশ্চিত করা জরুরি। সাধারণত সানস্ক্রিনের প্রধান উপকরণ হিসেবে জ়িঙ্ক অক্সাইড বা টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড ব্যবহার করা হয়। এই মিনারেলগুলো প্রকৃতিতেই পাওয়া যায়। এগুলো ত্বকের পক্ষে ভাল। আর যা খেয়াল রাখবেন, তা হল এসপিএফ-এর পরিমাণ। সকলেই জানেন, সানস্ক্রিনের এসপিএফ-ই প্রধান ফ্যাক্টর। সুতরাং, তার প্রতি গুরুত্ব দিন। এসপিএফ ২০-২৫ একদম বেসিক, প্রায় সব ত্বকেই সুট করে। রোদের তাপে ত্বকের সংবেদনশীলতা বাড়লে, অন্তত এসপিএফ ৪০ বা ৬০ বা তার বেশি মানের সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন। সানস্ক্রিনে অনেকসময় সুগন্ধির ব্যবহার থাকে, সেগুলো এড়িয়ে চলুন। যেমন, বার্গামট যদি উপকরণে থাকে, তা এড়িয়ে চলুন, কারণ এতে সান-সেনসিটিভিটি আরও বাড়ে। প্রডাক্টের লেবেল ভাল করে পড়ে তারপর কিনুন।


রোজকার রূপরুটিনে আই ক্রিম কতটা জরুরি? আমার ডার্ক সার্কল বা পাফি আইজ়ের সমস্যা নেই। তাও কি আমার আই ক্রিম ব্যবহার করা জরুরি? তাছাড়া এর কোনও ঘরোয়া বিকল্প রয়েছে কিনা, তা-ও জানতে চাই।

প্রিয়াঞ্জলি মিত্র, বোসপুকুর

চোখের চারপাশের ত্বকের রোজ যত্ন নেওয়া জরুরি, কারণ এই অংশের ত্বক খুব পাতলা হয়। তাছাড়া এতে কোনও অয়েল গ্ল্যান্ডও থাকে না। ফলে বয়সের ছাপ, বলিরেখা সবার আগে এই অংশেই ফুটে ওঠে। চোখে চাপ পড়লে বা কিডনির সমস্যা থাকলেও চোখের চারপাশের ত্বক ফুলতে পারে। তাই রোজ কোনও ভাল মানের আন্ডার-আই ক্রিম বা জেল লাগান। ত্বক অ্যাবসর্ব করে নিলে ভিজে কটন প্যাড দিয়ে আলতো করে মুছে নিন। মুখ ধুয়েও নিতে পারেন। সারারাত আইক্রিম লাগিয়ে রাখলে চোখের ফোলাভাব বেড়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন পাঠান: sanandা@abp.in

হিমাচলের খানা-খজ়ানা



চাম্বা স্টাইল ফ্রায়েড ফিশ

চেনা উপকরণ, প্রণালী নতুন! তাতেই জন্ম নেয় হিমাচলের পাহাড়ি স্বাদের জাদু। সেই জাদুকেই হেঁসেলবন্দি করলেন কুকারি এক্সপার্ট ও কলামনিস্ট রুকমা দাক্ষী। চেখে দেখলেন সংবেত্তা চক্রবর্তী।

শুধু ভাষা, মত এবং পরিধানই নয়, এ দেশের খাদ্যসম্ভারের বৈচিত্রেরও কোনও তুলনা হয় না! নানা প্রান্তের আবহাওয়া, প্রকৃতি এবং কোথায় কী ধরনের খাদ্যসামগ্রী সহজে পাওয়া যায়, তার উপর অনেকটাই নির্ভর করে সেখানকার রান্না-খাওয়ার ধরন। বাঙালিরা স্বভাবতই খাদ্যরসিক, খাওয়াদাওয়া নিয়ে চর্চা-বিলাসীও। ফলে বিভিন্ন আঞ্চলিক কুইজ়িন আমাদের পাতে জায়গা করে নিয়েছে এবং নিচ্ছে অনেকদিন ধরেই। তবে হিমাচলি খাবারদাবার নিয়ে আলোচনাটা তুলনামূলকভাবে পরে শুরু হয়েছে। তাই এই কুইজ়িন সম্পর্কে আমাদের ধারণাও অন্য নানা রাজ্যের খাবারদাবারের চেয়ে হয়তো একটু কম। হিমাচলি খাবারকে বলা চলে, পঞ্জাবি এবং তিব্বতি রান্নার 'ব্লেন্ড'। আটা, বিভিন্ন রকম ডাল, সবজি, ঘি এবং মশলার প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় এখানকার রান্নায়। চিকেন খাওয়া হয়। মাটন সেভাবে মেলে না, ল্যাম মিটই প্রধান। এই সব উপকরণের সমন্বয়ে হিমাচলি রান্না হল, যাকে বলা যায় 'হোলসাম কুইজ়িন'— অর্থাৎ সব ধরনের পুষ্টিগুণ যে কুইজ়িনে মেলে। আর স্বাদ? সে নিয়ে আমরা কিছু বলব না। প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি, নিজেরাই রান্নাঘরে পরখ করে নিন!

চাম্বা স্টাইল ফ্রায়েড ফিশ

উপকরণ: মাঝারি সাইজ়ের ভেটকি বা তেলাপিয়া ২টো (গোটা), লেবুর রস ১ টেবলচামচ, হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, আদা ১ ইঞ্চি, রসুনের কোয়া ৬টা, কাঁচালঙ্কা ৪টে, ধনেপাতা ১ আঁটি, বেসন ২ টেবলচামচ, চালের গুঁড়ো ৩ টেবলচামচ, ভাজার জন্য সাদা তেল।

প্রণালী: রসুন, আদা, কাঁচালঙ্কা ও ধনেপাতা পিষে নিন। ছুরি দিয়ে মাছের পিঠ চিরে নিন। মাছের গায়ে নুন, হলুদ আর লঙ্কাগুঁড়ো মাখিয়ে রাখুন ১০ মিনিট। তারপর পিষে রাখা মশলা মাখিয়ে নিন। লেবুর রসও মাখিয়ে নিন ভাল করে। ঢাকা দিয়ে রাখুন ২০ মিনিট। চালের গুঁড়ো আর বেসন একটা প্লেটে ভাল করে মিশিয়ে নিন। একটা পাত্রে তেল গরম করুন। ম্যারিনেটেড মাছগুলোকে বেসন আর চালের গুঁড়োর মিশ্রণে ভালভাবে দু'পিঠ মাখিয়ে নিন। গরম তেলে মাছের দু'পিঠ সোনালি করে ভেজে নিন। লেবুর স্লাইস আর পেঁয়াজের লাচ্ছা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করবেন।

পাহাড়ি আলু কে গুটকে

উপকরণ: ডুমো করে কাটা সেদ্ধ আলু বড় ১ বাটি, গোটা জিরে ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো



পাহাড়ি আলু কে গুটকে


বাবড়ু

২ চা-চামচ, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, গোটা শুকনোলঙ্কা ৩টে, কুচনো ধনেপাতা ১ আঁটি, নুন স্বাদ অনুযায়ী, সাদা তেল ৪ টেবলচামচ, আমচুর পাউডার ১ চা-চামচ, হিং $^{১}/_{২}$ চা-চামচ।

প্রণালী: কড়াইয়ে তেল গরম করে, শুকনোলঙ্কাগুলো অর্ধেক করে ভেজে, তুলে রাখুন। ওই তেলেই হিং আর জিরে ফোড়ন দিন। এবার ডুমো করে কেটে রাখা সেদ্ধ আলু দিন। ২-৩ মিনিট মাঝারি আঁচে ভেজে নিন। এবার ভেজে রাখা শুকনোলঙ্কা ও ধনেপাতা ছাড়া বাকি সব উপকরণ দিয়ে দিন। আঁচ কমিয়ে, ৫ মিনিট রান্না করুন। মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। মশলা ও আলু যখন বেশ মাখা-মাখা আর ভাজা-ভাজা হয়ে উঠবে, তখন আঁচ বন্ধ করে দিন। উপর থেকে কুচনো ধনেপাতা ও ভাজা শুকনোলঙ্কা ছড়িয়ে, পরিবেশন করুন। পুরি অথবা চাপাটি দিয়ে খুব ভাল লাগে এই পদটি।

বাবড়ু

বাবড়ু হল এক ধরনের মালপোয়া।

উপকরণ: আটা ২ কাপ, চিনি ১ কাপ, জল ১ কাপ, আধভাঙা মৌরি ১ চা-চামচ, ছোট এলাচগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ইস্ট ১ চা-চামচ, দুধ $^{১}/_{২}$ কাপ।


টুকিয়া ভাথ



চানা মাদরা

প্রণালী: চিনি, জল, এলাচগুঁড়ো ও মৌরিগুঁড়ো একসঙ্গে ফুটিয়ে, ঠান্ডা করে রাখুন। আটার সঙ্গে ইস্ট মিশিয়ে নিন ভাল করে। এবার অল্প অল্প করে চিনির জল দিয়ে আটা মাখতে থাকুন। দেখবেন, যেন চিনির জল খুব ঠান্ডা না হয়ে যায়। দুধও অল্প অল্প করে মিশিয়ে নিন এর সঙ্গে। ভাল করে ঠেসে, আটা নরম করে মেখে নিন। আটা আঁটসাট থাকলে কিন্তু বাবড়ুও নরম হবে না। একটা পাত্রে আটা ঢাকা দিয়ে, কোনও গরম জায়গায় রেখে দিন ৭-৮ ঘণ্টা। এবার একটা বাটার পেপার নিয়ে, তাতে আটা থেকে লেচি কেটে রাখুন। আর একটা বাটার পেপার উপরে রেখে, লেচি থেকে মোটা মোটা লুচির মতো বেলে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করুন। মাঝারি আঁচে বাবড়ুগুলো সোনালি করে ভেজে নিন। এই মিষ্টি ৭-৮ দিন রেখে খাওয়া যায়।

টুকিয়া ভাথ

হিমাচলি খিচড়ি বলা যায় এই পদকে।

উপকরণ: চাল ১ কাপ, মুসুরডাল ১/২ কাপ, ডুমো করে কাটা আলু ২টো, পাতলা করে কাটা টোম্যাটো ২টো, স্লাইস করা পেঁয়াজ ২টো, তেজপাতা ১টা, ধনেপাতাকুচি ১/২ কাপ, রসুনকুচি ২ টেবলচামচ, আদাকুচি ১ টেবলচামচ, দারচিনির কাঠি ২টো, বড় এলাচ ১টা, স্টার অ্যানিস ১টা, টক দই ৩/৪ কাপ, কাঁচালঙ্কা ৬টা, লবঙ্গ ২টো, জয়িত্রী ১টা, পোস্ত ১ চা-চামচ, ঘি ৪ টেবলচামচ, লাল লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ।

প্রণালী: টোম্যাটো, আদা, রসুন, জয়িত্রী, কাঁচালঙ্কা, ধনেপাতা, বড় এলাচ, স্টার অ্যানিস এবং লাললঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে একটা পেস্ট তৈরি করুন গ্রাইন্ডারে। একটা বাটিতে এই মশলা ঢেলে নিয়ে, তার মধ্যে আলুগুলো রেখে দিন ২০ মিনিট। চাল আর ডাল ধুয়ে আলাদা করে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। প্রেশার কুকারে ঘি গরম করে তাতে লবঙ্গ, ছোট এলাচ ও তেজপাতা দিন। পেঁয়াজের স্লাইস দিয়ে, বাদামি করে ভেজে নিন। এবার আলু আর মশলার মিশ্রণটা এর মধ্যে দিয়ে রান্না করুন ২-৩ মিনিট। ডাল, চাল, দই আর নুন দিন এবার। পরিমাণমতো জল মিশিয়ে, একটা হুইস্‌ল দিয়ে নিন। টুকিয়া ভাথ তৈরি।



চানা মাদরা

মাদরা একটি ঘন দইয়ের মিশ্রণ।

উপকরণ: নুন দিয়ে সেদ্ধ করা কাবুলি ছোলা ১ কাপ, টক দই ১ কাপ, ঘি ৪ টেবলচামচ, হিং ১/২ চা-চামচ, নুন স্বাদমতো, জিরে ১ চা-চামচ, বড় এলাচ ২টো, গোটা গোলমরিচ ১৫টা, দারচিনি ২টো কাঠি, লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা-চামচ, কিশমিশ ১০টা, সাজানোর জন্য কাঁচালঙ্কা ও ধনেপাতা।

প্রণালী: একটু দারচিনি, বড় এলাচ আর গোলমরিচ থেঁতো করে নিন। কড়াইয়ে ঘি গরম করে, তাতে জিরে ও হিং ফোড়ন দিন। তারপর থেঁতো করা মশলা দিন। একটা বাটিতে দইয়ের সঙ্গে নুন, লঙ্কাগুঁড়ো, ধনেগুঁড়ো আর হলুদগুঁড়ো মিশিয়ে, ফেটিয়ে নিন। এই মশলা মেশানো দই দিন কড়াইয়ে। বেশ ভাল করে কষানো হলে, ১ কাপ জল ও সেদ্ধ কাবুলি ছোলা দিন। ভালমতো ফুটে উঠলে, স্বাদমতো কাঁচালঙ্কা ও ধনেপাতাকুচি দিন। একটু ঘি ছড়িয়ে, সার্ভ করুন। ভাত বা রুটির সঙ্গে ভাল লাগে।

পাহাড়ি চিকেন

উপকরণ: মুরগি ৫০০ গ্রাম (মাঝারি পিস), টক দই ১/২ কাপ, দুধ ১/২ কাপ, জল ১/২ কাপ, নুন স্বাদমতো,



পাহাড়ি চিকেন

চেরা কাঁচালঙ্কা ৬টা, কুচনো ধনেপাতা ১ আঁটি, হলুদগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, কাশ্মীরি লঙ্কাগুঁড়ো ১ চা-চামচ, ঘি ১ টেবলচামচ, সর্ষের তেল ১/৪ কাপ। **পেষা মশলার জন্য:** গোটা ধনে ১ চা-চামচ, ছোট এলাচ ৩টে, বড় এলাচ ১টা, তেজপাতা ২টো, দারচিনি ১টা কাঠি, লবঙ্গ ৩টে, মৌরি ১ চা-চামচ, পেঁয়াজ ২টো (কুচনো), রসুনের কোয়া ৬টা, আদা ১ টুকরো, কাঁচালঙ্কা ৪টে।

প্রণালী: মুরগি ধুয়ে, নুন মাখিয়ে রাখুন। প্যানে অর্ধেকটা তেল গরম করুন। পেষা মশলায় যে ক'টা গোটা মশলা রয়েছে, সেগুলো তেলে হালকা করে ভেজে নিন। ওই তেলেই পেঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে ভাল করে ভাজুন, যতক্ষণ না পেঁয়াজ লালচে হয়। তারপর আঁচ বন্ধ করে, মশলা একটা পাত্রে ঢেলে রাখুন। একই প্যানে বাকি তেল গরম করুন। নুন-মাখানো মুরগি দিয়ে, বেশি আঁচে ঢাকা দিয়ে রান্না করুন ৫ মিনিট। আঁচ কমিয়ে পেষা মশলা, হলুদগুঁড়ো ও লঙ্কাগুঁড়ো দিন। ভালভাবে মিশিয়ে নিয়ে, ফেটানো দই মেশান। বেশ মাখো-মাখো হলে দুধ ও জল দিয়ে নরম আঁচে মুরগি রান্না করুন। ধনেপাতা ও কাঁচালঙ্কা ছড়িয়ে দেবেন পরিবেশনের আগে।



আকটোরি

আকটোরি (ডিম ছাড়া প্যানকেক)

উপকরণ: আটা ১ কাপ, কুটু আটা (ইংরেজিতে বলে বাক্‌হুইট ফ্লাওয়ার, অনলাইনে পেয়ে যাবেন), গুঁড়ো চিনি ৩/৪ কাপ, বেকিং সোডা ১ চা-চামচ, ভাজার জন্য ঘি অথবা সাদা তেল পরিমাণমতো।

প্রণালী: দু'রকম আটা ও চিনি ভাল করে মিশিয়ে নিন চামচ দিয়ে। এতে বেকিং সোডা দিয়ে, আবার মিশিয়ে নিন। পুরোটা ভাল করে মিশে গেলে, অল্প অল্প করে দুধ মেশাতে থাকুন। তারপর সমপরিমাণ জল দিয়ে, ভাল করে মিশিয়ে নিন। ঢাকা দিয়ে রাখুন ১০ মিনিট। এরপর ননস্টিক প্যানে ঘি গরম করুন। হাতায় করে গোলা তুলে, প্যানে ছড়িয়ে দিন,



গহত কি শোরবা

মাঝারি প্যানকেকের আকারে। মাঝারি আঁচে রান্না করুন। যখন দেখবেন একদিকে সোনালি রং ধরেছে আর বুদবুদ উঠছে, তখন উলটে দিন। অন্যদিকটাও একইভাবে রান্না হয়ে গেলে, গরম গরম পরিবেশন করুন। এটা অত্যন্ত স্বাদু এবং পুষ্টিকর জলখাবার।

গহত কি শোরবা

উপকরণ: কুলত্থ কলাই (অনলাইনে পাবেন) ২০০ গ্রাম, সর্ষেদানা ১ চা-চামচ, হিং $^{১}/_{২}$ চা-চামচ, জিরে ১ চা-চামচ, পেঁয়াজ ১টা, রসুনের কোয়া ৩টে, নুন স্বাদমতো, গোটা গোলমরিচ ১০টা, সাদা তেল ১ টেবলচামচ, টোম্যাটো ১টা, গোটা ধনে ১ চা-চামচ, ধনেপাতার ডাঁটি ২ টেবলচামচ, মাখন ১ টেবলচামচ।

প্রণালী: কলাইয়ের ডাল সারারাত ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরদিন পেঁয়াজ ও রসুন কুচিয়ে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করুন। তেলে জিরে, ধনে, গোলমরিচ ও হিং ফোড়ন দিন। সুগন্ধ বেরতে শুরু করলে তাতে কুচনো পেঁয়াজ, টোম্যাটো আর রসুন দিয়ে মিনিটতিনেক রান্না করুন। এরপর স্বাদমতো নুন, ধনেপাতার ডাঁটি এবং জল সমেত কুলত্থ কলাই দিয়ে প্রেশার কুক করুন, যতক্ষণ না জলের মতো সেদ্ধ হয়ে যায়। প্রয়োজনে জল দিন। স্বাদমতো নুন এবং গোলমরিচও মেশান। গরম গরম সার্ভ করতে হবে মাখন দিয়ে। লেবু ও ধনেপাতা দিয়ে গার্নিশ করলে ভাল লাগবে। এটা এক ধরনের শোরবা বা সুপ, তাই ঘনত্ব সে রকমই হবে।

উৎসবের মরসুমে মেনুর মেকওভার শুরু হোক হিমাচলি রান্না দিয়েই? রসনার তৃপ্তি এবং শরীরের পুষ্টি, দুইই মিলবে নিশ্চিত!

যোগাযোগ: ৯৮৩০২৮১৬১৮
ছবি: শুভেন্দু চাকী





সোনামুখি সিল্ক শাড়িতে গোলাপি, কমলা ও অফ হোয়াইট কাঁথাস্টিচের কাজ। সঙ্গে স্টাইলিশ রুপোর গয়নার সাজ।

শাড়ি: সেরিনিটি বাই সৈকত

পুজোয় শাড়ি-বিলাস

পুজোর সাজে আরামের সঙ্গে সঙ্গে স্টাইল কোশেন্ট মাস্ট! নাহলে ভিড়ের মধ্যে বাকিদের চেয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র করে তুলবেন কীকরে? সিল্ক, কটন, হ্যান্ডলুম, শিবোরি...পুজোর ওয়ার্ড্রোবে থাকুক নানারঙের শাড়ি।



উজ্জ্বল লাল-সাদার যৌথতায় হাতে বোনা শিবোরি রেশম মটকা সিল্ক। সোনার গয়নায় পুজোর ট্র্যাডিশনাল লুক।

শাড়ি: টোয়াইন টেলস
ফোন: ৮৯০৬০৭৭৫৪৫
গয়না: স্টাইল অ্যাডিক্ট



কালার ডাই
করা গাছি তসর
শাড়ি, জমিজুড়ে
কাঁথাস্টিচের কাজ।
ডানদিকে অন্যজন
পরেছেন অ্যাপ্লিক
ও ব্লক প্রিন্টের
কাজ করা কটন
কোটা শাড়ি।

শাড়ি: সেরিনিটি
বাই সৈকত



চওড়া কমলা পাড়ের গোলাপি রঙের হাতে বোনা কটন শাড়ি। শাড়িজুড়ে পেজ়লি মোটিফে কাঁথাস্টিচের কাজ।

শাড়ি: সেরিনিটি
বাই সৈকত
ফোন: ৮৭৭৭৩৭১৪৪০



উজ্জ্বল সরষে-হলুদ শিবোরি রেশম মটকা সিল্ক। একরঙা শাড়ির সঙ্গে স্টাইলিশ ব্লাউজ় আর ভারী নেকপিস।

শাড়ি: টোয়াইন টেলস
গয়না: স্টাইল অ্যাডিক্ট



গোলাপি হ্যান্ডলুম শাড়িতে অলওভার সিলভার ও গোল্ডেন জ়রির কাজ। পুজোতে সন্ধ্যার সাজের জন্য পারেফেক্ট কালেকশন।

শাড়ি: ঢেউ



ম্যাজেন্টা রঙা হাতে
বোনা পিওর কটন
জামদানি। জমি
জুড়ে রুপোলি বুটি।
পুজোর সাজে রঙিন।

শাড়ি: টোয়াইন টেলস



সরু লাল পাড়ের ধূসর সুতির শাড়ি। শাড়িজুড়ে মাছ মোটিফের অ্যাপ্লিক ওর্য়ক এবং লাল পাটলিপল্লু প্যাটার্ন।

শাড়ি: ঢেউ
ফোন: ৮৪২০০৩১০০৬

মডেল: অর্পিতা, সুস্মিতা, তনুশ্রী, অঙ্কিতা
মেক-আপ ও হেয়ার (অর্পিতা, তনুশ্রী): সায়ন্ত ঢালি
ফোন: ৯০৫১৪৪৫২৫৭
স্টাইলিং (অর্পিতা, তনুশ্রী): প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী
রুপোর গয়না: করিশ্মাজ়
ফোন: ৮৬৯৭১১৩৩৬৭
শুটিং লোকেশন (অর্পিতা, তনুশ্রী): দ্য স্ট্যাডেল
ওয়েবসাইট: www.thestadel.com
বাকি লোকেশন: বুনাফিল ও টোয়াইন টেলস, হিন্দুস্তান পার্ক
ছবি (অর্পিতা, তনুশ্রী): সোমনাথ রায়

এই শুটের ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন QR কোডটি



পরিবেশজনিত ক্ষতি রুখতে

সূর্যের আলো, ব্লু লাইট, বায়ুদূষণ... পরিবেশজনিত এহেন ক্ষতির হাত থেকে ত্বককে সুরক্ষা না দিলে উৎসবের জেল্লা ফিকে হতে কতক্ষণ! ত্বক ঝলমলে রাখার পরামর্শ রইল এবারের পাতায়।

বাড়িতে থাকুন বা বাইরে, ত্বকের উপর পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাব সবসময়ই পড়ে। ইউ-ভি রশ্মি থেকে বায়ুদূষণ কিংবা হাল আমলের ব্লু লাইট, ত্বকের ক্ষতি করায় কেউই কম যায় না। কোলাজেন, যা ত্বক ভাল রাখার আবশ্যক উপাদান, তা ভেঙে ত্বককে আরও বেশি ক্ষতির সম্মুখীন করে দেয় এই ধরনের এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস। যত বেশি দূষণ বা রোদের মুখোমুখি হবেন, ততই বাড়বে ক্ষতির আশঙ্কা। আর পুজোর ক'দিন তো সেই আশঙ্কা আরওই বেশি। ফলে ত্বককে আগে থেকে প্রস্তুত না করলে, রোদে-ধুলোয় অল্প সময়েই সে কাহিল হয়ে পড়তে বাধ্য! কীভাবে ত্বককে সুরক্ষা দেবেন, কোন উপকরণ এই সব ক্ষতিতে রক্ষাকবচের মতো কাজ করবে, জেনে নিন এখনই।

ক্ষতির আশঙ্কা কোথায়?

এনভায়রনমেন্টাল ড্যামেজ বা পরিবেশজনিত ক্ষতি মাত্রেই তা ত্বকে অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের জন্ম দেয়। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে ত্বকে থাকা জরুরি অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট প্রশমিত হয়ে ক্ষতিকর ফ্রি-র‍্যাডিক্যাল তৈরি হয়। নির্জীবতা, রুক্ষতা, বলিরেখা, কালচেভাবের মতো ত্বকের একাধিক ছোট-বড় সমস্যার নেপথ্যে থাকে এই অক্সিডেটিভ স্ট্রেস। অতিরিক্ত সূর্যরশ্মির সংস্পর্শে থাকা, দূষণের সম্মুখীন হওয়া বা দীর্ঘক্ষণ ব্লু লাইট ত্বকে প্রবেশ করলে এই ধরনের অক্সিডেটিভ স্ট্রেস তৈরি হওয়ার আশঙ্কা বহুগুণ বেড়ে যায়। এমনিতেই সূর্যরশ্মি ত্বকের মেলানিন উৎপাদনের হার বাড়িয়ে ট্যানিংয়ের প্রবণতা বাড়ায়। পাশাপাশি স্কিন এজিং প্রসেস দ্রুততর হয়ে ওঠে এবং দাগছোপ দেখা দেয়। উপরন্তু যদি অক্সিডেটিভ স্ট্রেসও বাড়ে, তাহলে ত্বকের অবস্থা কী হবে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন? মোবাইল

থেকে আসা ব্লু-লাইট এবং ধুলোবালিতে ভরা বাতাসও এই একই সমস্যার দিকে ত্বককে ঠেলে দেয়। ভেবে দেখুন, রাস্তার দূষিত বাতাসে কত ধরনের ক্ষতিকর কেমিক্যাল মিশে থাকে। দীর্ঘক্ষণ ত্বক এসবের সংস্পর্শ থাকলে এবং আগে যথাযথ যত্ন না নিলে এক সময় ক্ষতিপূরণ করারও সুযোগ থাকবে না। জটিল সমস্যার হাত থেকে ত্বককে সুরক্ষা দিতে কয়েকটা বিষয়ে খেয়াল রাখুন।

সানস্ক্রিন লোশন 'মিনারেল-বেসড' হলেই ভাল

সানস্ক্রিন সাধারণত দু'ধরনের হয়, কেমিক্যাল এবং ফিজ়িক্যাল বা মিনারেল। এর মধ্যে কেমিক্যাল সানস্ক্রিন অল্প মাত্রায় হলেও আলো শোষণ করে। উল্টোদিকে মিনারেল সানস্ক্রিনের উপাদান ফিজ়িক্যাল ব্লকার হিসেবে কাজ করে বলে সূর্যরশ্মি থেকে বাড়তি সুরক্ষা দিতে পারে। সুতরাং, শুধুমাত্র সানস্ক্রিন ব্যবহার করার প্রতিই নয়, জোর দিন মিনারেল সানস্ক্রিন ব্যবহার করার উপর। আমাদের দেশের তাপমাত্রা অনুযায়ী এসপিএফ অন্তত ৪০ বা তার বেশি হওয়া জরুরি। সঙ্গে পিএ+++ হলে ভাল।

টিন্টেড সানস্ক্রিন বেছে নিন

সানস্ক্রিন লাগানো মানেই স্কিনকেয়ারে আর-একটা স্টেপ যোগ হওয়া। উপরন্তু অনেক সানস্ক্রিনে মুখ সাদা হয়ে যায়, কারওর ক্ষেত্রে সানস্ক্রিন লাগালে ত্বক কালো দেখায় বা অতিরিক্ত তেল বেরয়। এসব সমস্যা কমানোর আদর্শ উপায় হল, টিন্টেড সানস্ক্রিন ব্যবহার করা। দিনের বেলা, বিশেষ করে গরমে বেস মেক-আপ হালকা রাখতেই বলা হয়। এক্ষেত্রেও টিন্টেড সানস্ক্রিন খুব ভাল অপশন। সূর্য থেকে সুরক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্কিনটোন ইভন আউট করাও হবে। ত্বকও বাড়তি প্রডাক্টে ভারী হয়ে উঠবে না।

ব্লু লাইট থেকে বাঁচাবে রেড অ্যালগি

মোবাইল বা যে কোনও ডিজিট্যাল স্ক্রিন থেকে বেরনো ব্লু লাইট থেকে ত্বককে সুরক্ষা দিতে বেছে নিন রেড অ্যালগির নির্যাসে সমৃদ্ধ প্রডাক্ট। বিভিন্ন ধরনের সেরাম, ময়শ্চারাইজ়ার এখন সহজলভ্য, যাতে এই উপাদান থাকে। ত্বকের ধরন বুঝে বেছে নিন। সকালে দৈনন্দিন স্কিনকেয়ার রুটিনের মধ্যে সামিল করে নিন একে।

ভিটামিন ই এবং সি মাস্ট

রোজ সকালে ত্বক পরিষ্কার এবং টোন করার পর ভিটামিন ই এবং সি যুক্ত ময়শ্চারাইজ়ার বা সেরাম ব্যবহার করুন। এই দুই ভিটামিনই অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টস রূপে ত্বককে ফ্রি-র‍্যাডিক্যাল তথা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস থেকে সুরক্ষা দেবে। ফলে ত্বকের কোলাজেন এবং ইলাস্টিন (যা ত্বকের দৃঢ়তা বজায় রাখার জন্য জরুরি), দু' ধরনের প্রোটিনও সুরক্ষিত থাকবে। পাশাপাশি দিনভর নানা ধরনের এনভায়রনমেন্টাল ড্যামেজের সঙ্গে লড়াই করার শক্তি পাবে ত্বকও।

অন্য অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টও জরুরি

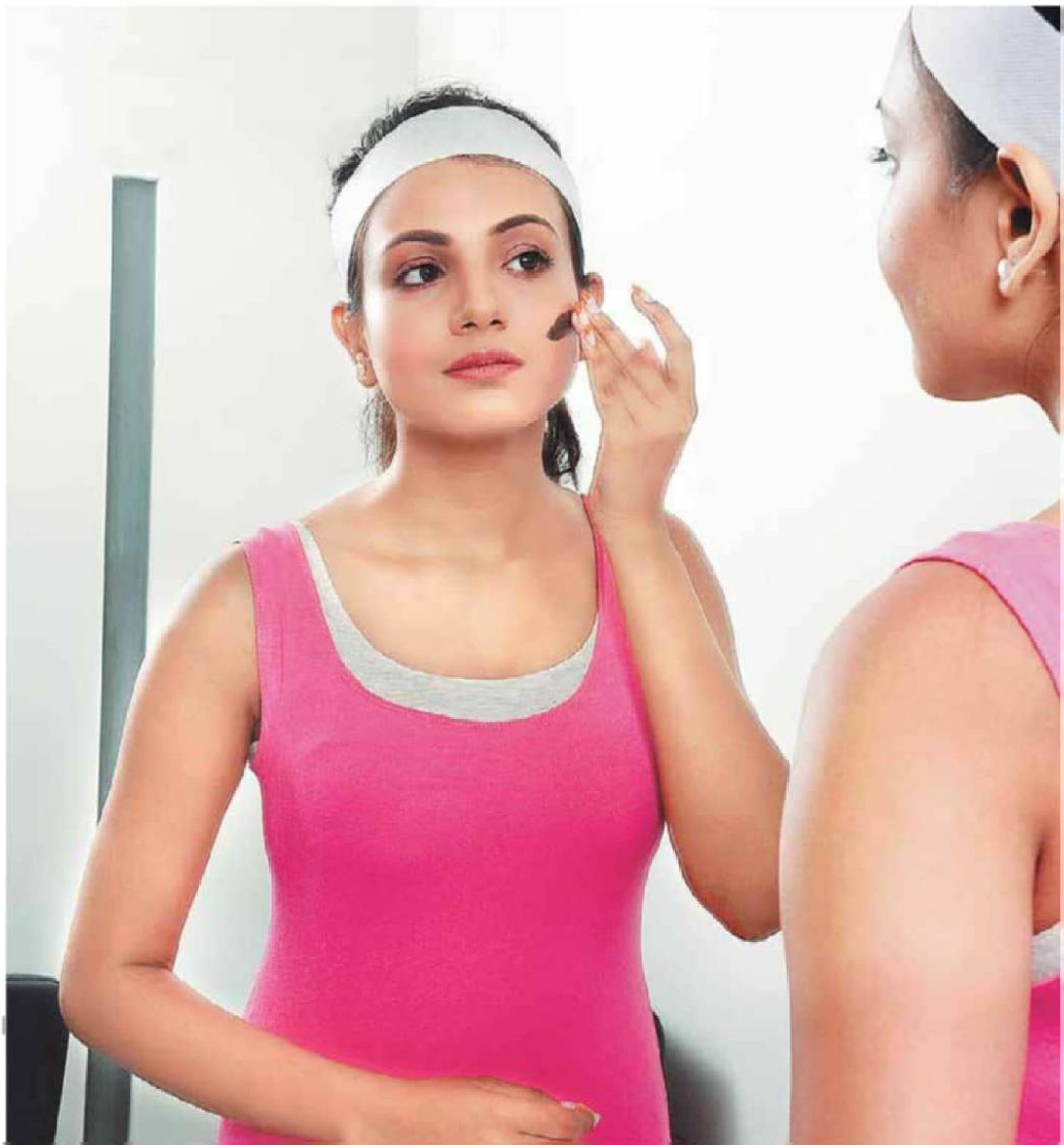
ভিটামিন ই এবং সি ছাড়াও গ্লুটাথিয়ন এবং রেসভিরাট্রল যুক্ত সেরাম এবং লোশন ব্যবহার করতে পারেন। এগুলোও ত্বকের উপকারী অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টসের মধ্যে অন্যতম। তবে এই ধরনের উপাদান দিনের বেলা নয়, বরং রাতে ব্যবহার করার পক্ষে আদর্শ। সারাদিন যেটুকু ক্ষয়-ক্ষতির মুখোমুখি হবে ত্বক, তার প্রতিকার হিসেবে কাজে দেবে এই উপাদান। এর মধ্যে রেসভিরাট্রল রেড ওয়াইনে উপস্থিত। ফলে দিনের শেষে অল্প রেড ওয়াইন মাস্ক হিসেবে মুখে লাগিয়ে রাখতে পারেন আধঘণ্টা। তারপর ধুয়ে নিন। গ্লুটাথিয়ন সাধারণত মেডিকেটেড ক্রিম এবং সাবানে থাকে, যা ত্বক পরিষ্কার করার জন্য বা নাইট টাইম ময়শ্চারাইজ়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন।

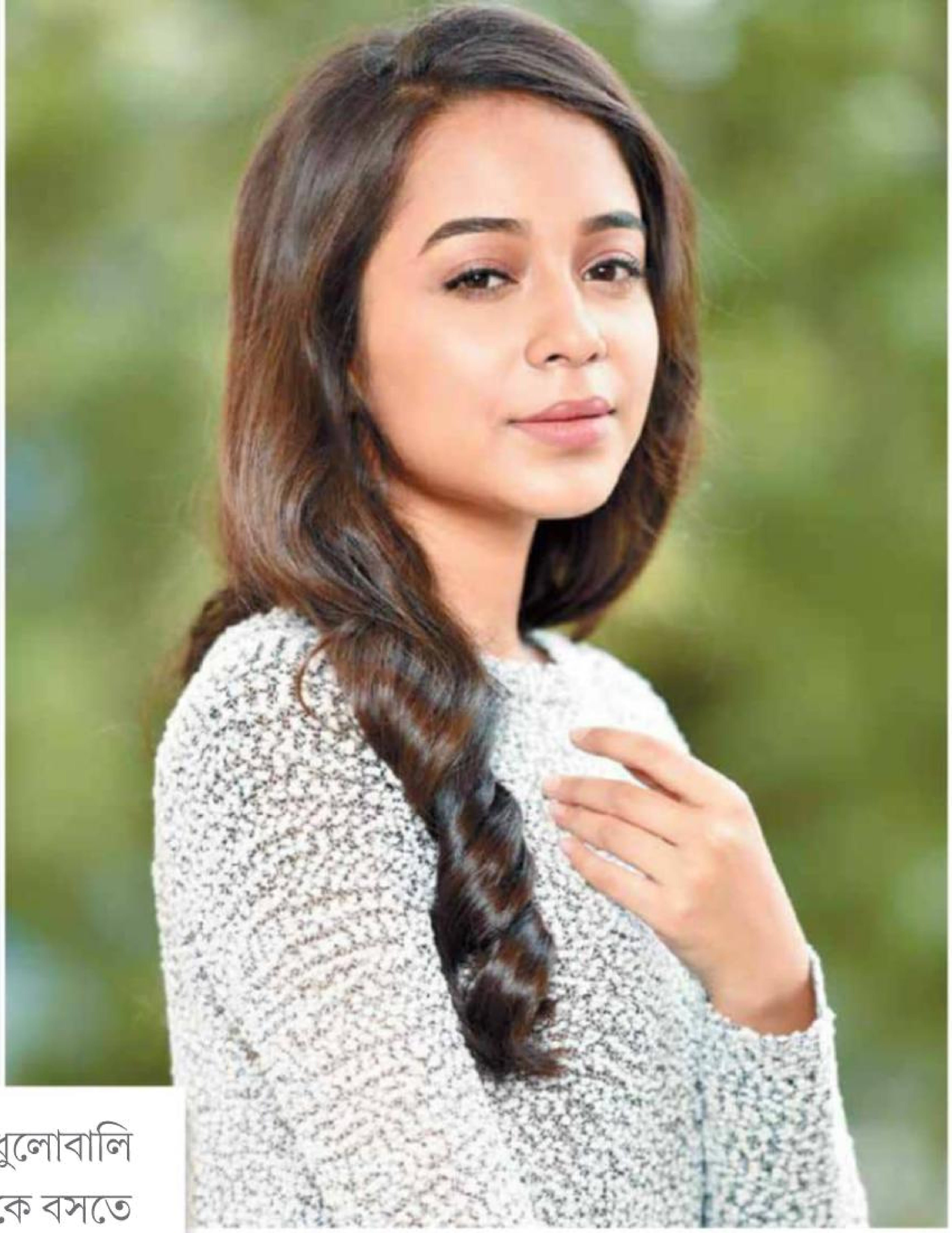
পাউডার সানস্ক্রিন সঙ্গে রাখুন

সকলেই জানেন, সকালবেলা সানস্ক্রিন লাগানোই শুধু যথেষ্ট নয়, কয়েক ঘণ্টা অন্তর তা রিঅ্যাপ্লাই করাও প্রয়োজন। কিন্তু রাস্তায় থাকলে ধুলোবালির উপর তো আর সানস্ক্রিন লাগানো সম্ভব নয়। সবসময় যে মুখ পরিষ্কার করার পরিস্থিতিও থাকে, তা নয়। পুজোর ক'দিন সেজেগুজে বাইরে বেরলে তো সানস্ক্রিন রিঅ্যাপ্লাই করা আরও সমস্যা। ব্যাগে তাই সবসময় পাউডার সানস্ক্রিন বা এসপিএফ যুক্ত কমপ্যাক্ট রাখুন। এতে যখনতখন সানস্ক্রিন

রেড ওয়াইনে থাকা রেসভিরাট্রল ত্বকের উপকারী অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টের মধ্যে অন্যতম। দিনের শেষে যদি রেড ওয়াইন মুখে মাস্ক হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন, তাহলে ত্বক কোমল এবং তরতাজা থাকবে।









> রাস্তার ধুলোবালি যাতে ত্বকে বসতে না পারে এবং রাতে যা যা যত্ন নেবেন, তা যেন ত্বকের উপর কাজ করতে পারে, তা নিশ্চিত করবে পরিষ্কার ত্বক।

টাচ-আপ করে নিতে পারবেন। উপরন্তু মেক-আপও সেট হয়ে যাবে।

দিনের শেষে ত্বক পরিষ্কার করা জরুরি

সারাদিন যা-ই করুন, যে প্রডাক্টই ব্যবহার করুন, দিনের শেষে বাড়ি ফিরে ত্বক ভালভাবে পরিষ্কার করা একান্ত জরুরি। রাস্তার ধুলোবালি, কেমিক্যাল যাতে ত্বকে বসতে না পারে এবং রাতে যা যা যত্ন নেবেন, তা যেন ত্বকের উপর কাজ করতে পারে, তা নিশ্চিত করবে পরিষ্কার ত্বক। ডাবল ক্লেনজ়িং করুন। প্রথমে মেক-আপ এবং উপরের স্তরে থাকা ধুলো-বালি তুলে নিতে মিসেলার ওয়াটার বা ক্লেনজ়িং মিল্ক ব্যবহার করে শেষে ভালভাবে ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে শুকিয়ে নিন। মাইল্ড ক্লেনজ়ার ব্যবহার করবেন, যাতে ত্বকের বাহ্যিক স্তরের বাড়তি কোনও ক্ষতি না হয়।



শোওয়ার আগে ত্বকের যত্ন

ত্বক পরিষ্কার করার পর টোন করুন অবশ্যই। এতে ত্বকের তারুণ্য দীর্ঘদিন বজায় থাকবে। এরপর সেরাম এবং শেষে নারিশিং ময়শ্চারাইজ়ার লাগান। হায়ালুরনিক অ্যাসিডে সমৃদ্ধ হাইড্রেটিং সেরাম রাতে ব্যবহার করার জন্য আদর্শ। এগুলো সারারাত ত্বককে আর্দ্রতা দেয়, এনভায়রনমেন্টার ড্যামেজ ঠিক করে এবং পিএইচ ব্যালান্সও বজায় রাখে। ফলে সকালবেলা ত্বক অনেকবেশি উজ্জ্বল এবং রিফ্রেশড দেখায়।

পুজোর ক'দিন তো বটেই, পারলে সারাবছরই এই কয়েকটা যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করুন। ত্বক ভাল রাখার কাজটা এতে অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে।



রাতে বাড়ি ফিরে জল দিয়ে ভালভাবে মুখ ধুয়ে নিতে ভুলবেন না কোনওভাবেই।



সকালে মুখ পরিষ্কার করে ভাল মানের টোনার দিয়ে মুখ মুছে নিন।



দিনের বেলা মিনারেল সানস্ক্রিন ব্যবহার করা একান্ত জরুরি।

এই শারদীয়ায় আপনার জন্য অপেক্ষা করছে নিত্য নতুন জিনিসের সম্ভার। এক ঝলকে দেখে নিন শাড়ি, মেকআপ কিট, স্কিন কেয়ারের হদিশ...

দেখুন বাছুন কিনুন

শারদীয়ায় তানেইরা নিয়ে এল সিল্ক-কটনের বুননে বাংলার লাল পাড় সাদা শাড়ি। আধুনিকতার ছোঁয়ায় এই শাড়িতে থাকছে নানা মোটিফ। থাকছে মানানসই ব্লাউজ়ও। শাড়ির দাম শুরু ৪৯৯৯ টাকা থেকে। সংগ্রহ করুন নিকটবর্তী তানেইরার স্টোর থেকে। পাবেন www.taneira.com-এও।





পুজোর মরসুমে পুরুষদের জন্য কিলস ইন্ডিয়ার একগুচ্ছ উপহার— আল্টিমেট ব্রাশলেস শেভ ক্রিম-ব্লু ইগল, পাফি আইজ় থেকে মুক্তি পেতে ফেশিয়াল ফুয়েল আই ডি-পাফার, সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে বাঁচতে ফেশিয়াল ফুয়েল এসপিএফ ১৯, অয়েল এলিমিনেটর ২৪-আওয়ার অ্যান্টি শাইন ময়শ্চারাইজ়ার (তৈলাক্ত ত্বকের জন্য), চুলের যত্নে সিল্ক গ্রুম সেরাম। দাম ১৭০০ থেকে ২১০০ টাকা।

এল কালারবারের সেক্সি টুসাম হাইলাইটার। এর লং লাস্টিং সিল্কি ফর্মুলা ত্বকে ভাল সেট হবে, সঙ্গে দেবে নিখুঁত ফিনিশ। সমস্ত কালারবার স্টোর ও কাউন্টারে পাওয়া যাবে। পাবেন www.colorbarcosmetics.com -এও। দাম মাত্র ৬৯৯ টাকা।



সানন্দা

ইভেন্ট



রোহিত গান্ধী-রাহুল খন্নার কালেকশন

গ্ল্যামার ও শৈলীর মিশেলে...

শহরের এক হেরিটেজ প্রপার্টিতে অনুষ্ঠিত হল বিশেষ ওয়েডিং শো। নতুন কালেকশন নিয়ে হাজির ছিলেন নামী ডিজ়াইনররা। শোয়ের শেষে হালকা মেজাজে সাক্ষাৎকার দিলেন ডিজ়াইনার রোহিত গান্ধীও। সাক্ষী মধুরিমা সিংহ রায়।

গ্ল্যামারের রঙিন উজ্জ্বল উপস্থিতি। সঙ্গে চোখধাঁধানো ব্রাইডালওয়্যারের পরিবেশন। সবমিলিয়ে এক শনিবাসরীয় সন্ধেতে কলকাতার এক হেরিটেজ প্রপার্টিতে বসেছিল 'ওয়েডিং ডায়েরিজ়'-এর আসর। ''এবারে আমাদের পরিকল্পনা ছিল একটু অন্যভাবে পুরো বিষয়টা উপস্থাপনা করার। ভেনুর প্রতিটি অংশই যেন ক্রেতা-দর্শকদের আলাদা আলাদা অভিজ্ঞতার সাক্ষী রাখতে পারে। ছোট ছোট আনন্দগুলোকে উপভোগ করার মধ্যে এক আলাদা তৃপ্তি আছে। সেটাই এবারে আয়োজনের মুখ্য সুর,'' জানালেন আয়োজক মধু নেওটিয়া। বিশেষ ফ্যাশন ওয়াকে মূল আকর্ষণ তিন খ্যাতনামা ডিজ়াইনারের কালেকশন। বরুণ বহেল, দ্য রোজ়রুম ও রোহিত গান্ধী ও রাহুল খন্নার জমকালো উপস্থাপনায় মঞ্চে হাঁটলেন কলকাতা ও দেশের নামী মডেলরা। দ্য রোজ়রুমের কালেকশনে প্যাস্টেল শেডের লহেঙ্গা, জুয়েল গাউনস, জমকালো সেপারেটস সবই ছিল। ঠাসা এমব্রয়ডারি আর রঙের নিখুঁত নির্বাচন... দুয়ে মিলে একদম অন্য মেজাজের ব্রাইডালওয়্যার উপহার দিলেন তিনি। ডিজ়াইনার বরুণ বহেল সশরীরে হাজির থাকতে পারেননি ঠিকই। কিন্তু তাঁর 'নিউ লিফ' কালেকশনের মূল সুর গাঁথা ছিল ফ্লোরাল রোম্যান্সে। লহেঙ্গা-ক্রপ টপ, বুস্তিয়ার-পালাজ়ো-জ্যাকেট সেট... নজর কাড়ে উজ্জ্বল লাল-গোলাপি ফ্লোরাল মোটিফের উপস্থিতি। এম্বেলিশড শাড়ি বা অকেশনাল মেনসওয়্যারেও স্বাতন্ত্রের ছাপ রেখেছেন বরুণ, বরাবরের মতো। ফ্যাশন ওয়াকের ফিনালে প্রেজ়েন্টেশন ছিল রোহিত গান্ধী-রাহুল খন্নার নতুন কালেকশন 'ফিবোনাচ্চি'-র উপস্থাপনায়। রাহুল আসতে পারেননি, দীর্ঘদিনের ক্রিয়েটিভ পার্টনারকে ছাড়া একাই কলকাতায় এসেছিলেন ডিজ়াইনার রোহিত গান্ধী। শো শেষে হালকা মুডে পাওয়া গেল তাঁকে।



''ফিবোনাচ্চি আমাদের প্রথম শো যেখানে প্রেট থেকে কুতুর-এর দিকে এগোনোর চেষ্টা করেছি আমরা। এতদিন ধরে যা বানাতাম, সবই প্রায় প্রেট কালেকশন। এই নতুন কালেকশনকে কুতুর বা সেমি কুতুর

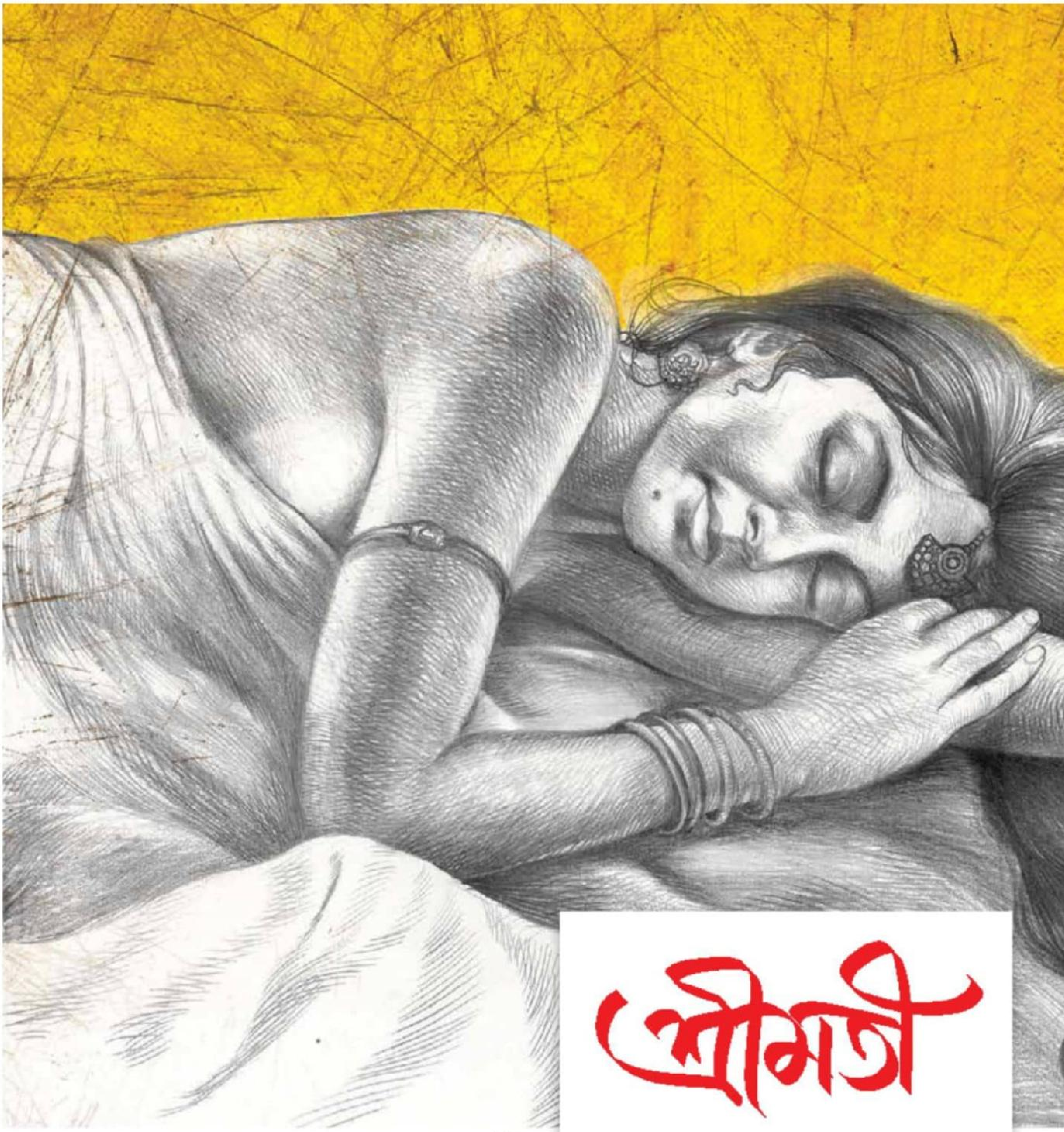
বলতে পারেন। অনেকেই এব্যাপারে আমাকে প্রশ্ন করছেন। দেখা যাক, এই গোত্রে এগোই কি না এরপর...''। কলকাতায় এর আগে অসংখ্যবার এসেছেন তাঁরা। ''আই লাভ ক্যালকাটা। প্রায় দশটা মতো শো করেছি এখানে। আমি নিজে একজন আর্ট লাভার। যোগেনদা (চৌধুরী) আমার খুব ভাল বন্ধু। জয়শ্রী চক্রবর্তী, পরেশ (মাইতি) সকলেই খুব কাছের। এবারে ওঁদের সঙ্গে দেখা করার কোনও সময় পেলাম না। একেবারে প্যাকড আপ শেডিউল! সকালে ঘুম থেকে উঠেই কলকাতায় চলে এসেছি। তারপর তো ব্যস্ততা চলছেই। সত্যি বলতে, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন জায়গা, সেখানকার মানুষরা আমাদের সৃষ্টিশীলতাকে বরাবর প্রভাবিত করেছেন। কলকাতার ক্রাফটসম্যানশিপ দুর্দান্ত। অনামিকা (খন্না) আমার ভাল বন্ধু, যদিও আমাদের সেনসিবিলিটিজ় আলাদা। কিন্তু একে অপরের কাজের প্রশংসক আমরা।'' কাজের জগতে রাহুল খন্নার সঙ্গে প্রায় ২৮ বছরের পার্টনারশিপ রোহিতের। পুরো সৃজনশীল প্রক্রিয়াতেই দু'জনের সমান অবদান থাকে। কে কোন বিভাগ সামলাবেন, এমন কোনও ভাগ করা আছে কি আপনাদের মধ্যে? উত্তরে জানালেন, ''দ্য পার্টনারশিপ গোজ় অন। আগামীর কথা বলতে পারব না, কিন্তু আজ এখনও অবধি আমাদের জুটি অটুট। আমরা সবকিছুই দু'জনে একসঙ্গে সামলাই। আমাদের আর্ট গ্যালারিও আছে। সেই গ্যালারি, ফ্যাশন সব যৌথভাবে সামলাই। আমাদের দুজনের মস্তিষ্ক একইভাবে কাজ করে আসলে। আর কখনও আমাদের মধ্যে কোনও ক্রিয়েটিভ ডিফারেন্স হয় না। আমি কিছু ভাবলে ওকে জানাই, ও কিছু ভাবলে আমাকে বলে। এভাবেই কাজ করি আমরা।


বরুণ বহেলের কালেকশন


দ্য রোজ়রুমের কালেকশন


মধু নেওটিয়া ও মিমি চক্রবর্তী

মানে, দু'জনের মধ্যে অন্তত একজন অপরের চিন্তাভাবনাকে রি অ্যাশিওর করার জন্য থাকে (হাসি)!'' আঠাশ বছর সময়টা সত্যিই দীর্ঘ। ইন্ডাস্ট্রি যেমন বদলেছে, তাঁরাও ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে সঙ্গেই বড় হয়েছেন। ''আমিই আগে শুরু করেছিলাম। আমার শুরুটা ছিল মেনসওয়্যার ব্র্যান্ড দিয়ে, প্রথম মেনসওয়্যার ব্র্যান্ড H2O। তারপর ফ্যাশন ডিজ়াইন কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করি একসঙ্গে। আই অ্যাম দ্য ফাউন্ডার মেম্বার। সেসময়ে কোনও পেজ থ্রি ছিল না, ভাগ্যিস! হ্যাঁ, মানুষ নিশ্চয়ই নতুন ট্রেন্ড, নতুন কালেকশনের কথা জানবেন। কিন্তু পেজ থ্রি সংস্কৃতি আমি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করি না। উই আর ভিক্টিম অফ দ্যাট অলসো। এখন সোশ্যাল মিডিয়া, ইনস্টাগ্রামের বাড়বাড়ন্ত। আমাকে খুব একটা বদার করে না এসব। কিন্তু অন্যদের তো করে! তাই এসবের জন্য আমাদের আলাদা টিমই আছে। আমি সদ্য জয়েন করেছি যদিও। ডিজ়াইনিং ইজ় নট সামথিং সিম্পল। প্রচুর পরিশ্রম, অধ্যাবসায়ের প্রয়োজন হয়। এমনও হয়, আমরা টানা দু'-তিনদিন রাত জেগে কাজ করি! এখন অনেক নতুন ডিজ়াইনারদের দেখি, সিরিয়াসলি বিষয়টাকে না নিয়েই এই পেশায় চলে আসে। আমার খুব খারাপ লাগে। আমি চাই ওরা আরও পরিণতমনস্ক হোক। ফ্যাশন ডিজ়াইনিং কিন্তু শুধুই পেজ থ্রি নয়,'' জানালেন তিনি। কলকাতা মার্কেট তাঁর কাছে সচেতন ক্রেতার জায়গা। ভবিষ্যতে তাঁরা চান কলকাতায় নিজেদের ব্র্যান্ডের ফ্ল্যাগশিপ আউটলেট খুলতে। কথোপকথনের পরে দেখা গেল পার্টির মুডে একে একে হাজির হচ্ছেন শহরের নামী অভিনেতা থেকে ফ্যাশন ব্যক্তিত্বরা সকলেই। বিয়ের মরশুমের আগে এমন এক সন্ধে নিশ্চয়ই ফ্যাশন সচেতন ক্রেতাদের কাছে উপরি পাওনা।



শ্রীমতী

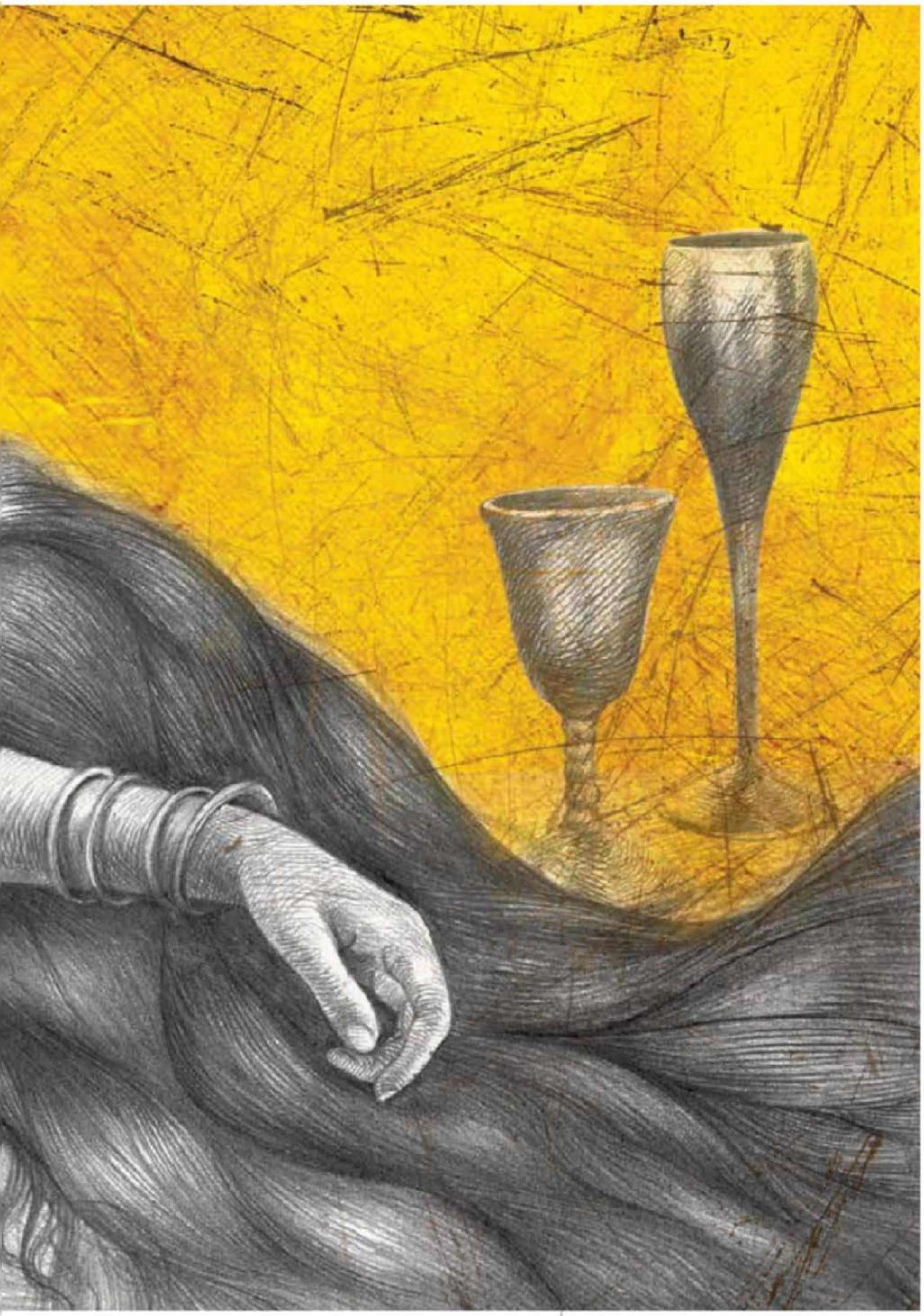
তাপস রায়

আগের ঘটনা

ছোট মেয়েকে হারিয়ে ভেঙে পড়েন রামনিধি। মহড়ায় ব্যস্ত থাকার ফলে মেয়েকে শেষ দেখাও দেখতে পারেননি তিনি। শ্রীমতী তাঁকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু মহানন্দর কথা ভেবে তার নিজের বুকের ভিতরে জমে ওঠে হাহাকার। রাজকৃষ্ণ দেবের লড়াইয়ের আসরে রামনিধির দলের কাছে হেরে গিয়ে হরু ঠাকুরকে অপমান করে বসে রাম বসু। শ্রীমতীর সঙ্গে দেখা করতে আসে মোহনচাঁদ। তারপর...

{৬}

একটা লাল বেনারসি পরেছে শ্রীমতী। বেনারসের সূক্ষ্ম কাজ ছড়িয়ে আছে শাড়িটিতে। কপালে টিকলি। হাতে কাঁকন। পায়ে আলতা। চুলে ফুলের মালা ঝুলছে। দু'চোখের সুরমা যেন ঝরে পড়বে। আজ বসে বসে একটু গৎ-এর সঙ্গে নাচ করে দেখাবে শ্রীমতী। মানে



গজ়লের এক একটি পদ গাইবার পর সে দ্রুত চোখ, মুখ, আঙুলের ব্যবহারে গানের কথার মানে ফুটিয়ে তুলবে। পায়ে ছ'গাছি করে ঘুঙুর পরেছে। কার্পেটের উপর বসে পা একবার লম্বা করতেই ঝমঝম করে তা উল্টো দিকে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসা মোহনচাঁদের বুকের ভিতর ধাক্কা মারল। একা মোহনচাঁদই শ্রোতা, দর্শক। কিন্তু তাতে কোনও কম আয়োজন রাখবে না শ্রীমতী। ওর হঠাৎ মনে হল, তবলা না হলে গৎ দেখানো যাবে না। আর লহেরা যদি করে শ্রীমতী, তাহলে ঠিকঠাক সারেঙ্গিয়া দরকার। সে আবার দাসীকে পাঠাল নীচে। ডেকে আনতে হবে ওস্তাদদের। আর মাসিকে ছুটি করে দিল।

শ্রীমতী একটা ধ্রুপদ ধরেছিল আড়ানায়। খুবই অসাধারণ কণ্ঠের চলাচল। কিন্তু মোহনচাঁদকে কেন যেন সেই গান তেমন করে ছুঁয়ে দিতে পারছে না। তার মন যে কেবল ঠুংরি ঠুংরি করছে! করছে, কারণ তার গুরুজি বলেছে যে, শ্রীমতীর ঠুংরি যে একবার শুনেছে, সে-ই পাগল হয়ে গিয়েছে।

শ্রীমতী আড়ানার পর বাহার ধরতেই মোহনচাঁদ ঠোঁট থেকে মদের গ্লাস নামিয়ে বলল, "আচ্ছা ঠুংরি একটু গাইলে হয় না!" শ্রীমতী হাত উঁচিয়ে সারেঙ্গিবাদককে থামাল। শ্রীমতীর গানের মাঝখানে কেউ কখনও এভাবে থামায়নি। মোহনচাঁদ নিশ্চিতভাবেই অন্যায় করেছে। অন্য যে কেউ হলে শ্রীমতী আর গাইতে বসত না। কিন্তু মোহনচাঁদ যে শ্রীমতীর কতটা জুড়ে বসে আছে তা শ্রীমতী নিজেও জানে না। শ্রীমতী শুধু জানে ঠুংরি গানের শরীরী যে আবেদন আছে, তার কাছে যেন খেয়ালের ধ্রুপদীয়ানা হেরে আছে। তবে মোহনচাঁদ চাইছে যখন ঠুংরিই হোক। সে ধরল, "পিয়া বিনা নহিঁ আওত চয়ন।"

বন্দিশ সবচেয়ে জোরের জায়গা শ্রীমতীর। সে এত আবেগ দিয়ে গাইল, যে সারেঙ্গিয়ার চোখ থেকে জল ঝরছিল। আর মোহনচাঁদ তো স্থাণু হয়ে গিয়েছে। তার নিজের আখড়াই গানের পারদর্শিতা ধুয়ে-মুছে সাফ! সে নিজের ভিতর কুঁকড়ে যেতে শুরু করেছে। তাদের গানের ভিতর কত কথা। তাল তাল কথা! চিতেন, মহড়া, ফুকা, এ সবে কোনও সুরের কৌশল নেই তেমন। নিজের মিঠে গলা কবিয়ালের কথার উপর বসিয়ে অশিক্ষিত শ্রোতার বাহবা আদায় করা। আর এখানে এই তানকারি, হৃদয় মথিত করে দেওয়া তালের রকমফের! সবচেয়ে মুগ্ধ করার ব্যাপার হল, শ্রীমতী কী অনায়াসে অনুভূতির প্রকাশ ঘটাচ্ছে! কোথাও জোরাজুরি নেই।

গান শেষ হতে মাঝরাত পেরিয়ে গিয়েছে। শ্রীমতী বলল, "চাঁদবাবু, রাত তো অনেক হয়েছে। যদি এখানে থাকতে অসুবিধে না হয়, তবে রাতটুকু কাটিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের হবে। শুনেছি আজকাল কলকাতার দিকেও হুগলির ডাকাতেরা চলে আসছে। ফাঁকা রাস্তায় পাবরা ছুঁড়ে পথচারীকে উপুড় করে ফেলে। তারপর টাকাপয়সা কেড়ে নিয়ে খুন করে দেয়। ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না।"

ঝুঁকি নেওয়া-না নেওয়া নয়। মোহনচাঁদ তো শ্রীমতীর বশ হয়ে গিয়েছে। আখড়াই গানের দুনিয়ায় বাঘের মতো তার বিচরণ। কিন্তু মোহনচাঁদ এখন মন্ত্রস্পৃষ্ট বাঘ। সে ভিজে বেড়াল হয়ে গিয়েছে। আগের দিন এসে সে শ্রীমতীর বাইরের রূপ দেখে অবশ হয়ে গিয়েছিল, আর আজ শ্রীমতীর শিল্পী রূপের কাছে পুরোপুরি সমর্পণ করে ফেলেছে নিজেকে। সে এখন কী আর করতে পারে! শ্রীমতীর কথায় শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে পেরেই স্বস্তি তার।

শ্রীমতী লক্ষ করেছে, ওইটুকু ছেলে দেড় বোতল মদ শেষ করে ফেলেছে। গান গাইতে গাইতেই লক্ষ করছিল মোহনচাঁদ আজ সুর আর সুরায় ডুবে যাচ্ছে। ডুবিয়ে দিতেই চেয়েছে শ্রীমতী। ওইটুকু ছেলে, তার

কীসের এত গরিমা! রাজা মহানন্দ রায়, রামনিধি, তার নিজের মরে যাওয়া স্বামীও শ্রীমতীর তাকানোকে গুরুত্ব দিয়েছে। আর এ ছেলেকে সেদিন এই বাড়িতে যখন খুশি আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছিল। তবুও পাঁচ-ছয় মাস সে শ্রীমতীর ব্যক্তিত্বের টানকে অস্বীকার করেছে। তুমি এই বাড়িতে ফিরে এসেছ মানে, এই বাড়ির প্রতি, শ্রীমতীর প্রতি তোমার টান আছে। কিন্তু নিজের অহংকার দিয়ে তুমি তাকে আড়াল করে রেখেছিলে।

শ্রীমতী বলল, "আলতাবালা, যা তো বাবুকে ধরে পিছন দিকে রাজামশায়ের ঘরে দিয়ে আয়। আর আলোর ব্যবস্থা করিস ঘরে।"

জানালা খোলা ছিল। আর রাতও তেমন অন্ধকার নয়। অনেকটা মদ খেয়ে ফেলেছে ঠিকই, কিন্তু পক্ষীর দলের সদস্যদের অত সহজে নেশা হয় না। একশো ছিলিম গাঁজা না টেনে বটতলায় পক্ষীকুলে ঠাঁই মেলে না। তো মোহনচাঁদও নেশায় চুরচুর হয়ে যায়নি। দাসী আলতাবালা দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছে কোথায় রাতে পরার জন্য ধুতি আছে। গায়ে জড়াবার জন্য অন্য আর একটি বস্ত্রও।

ঘুম আসেনি মোহনচাঁদের। আলতাবালা চলে যাওয়ার পর পালঙ্কে শুয়ে শুয়ে সে ভাবছিল, এই একটা জীবন পিতামহের দেওয়ানি করে জমানো ধনে কাটিয়ে দিচ্ছে সে। শুধুমাত্র ভাল গান করবে বলে আর কিছুই করল না। শুধু তো অশিক্ষিত শ্রোতারা নয়, গুরুদেব রামনিধিও তো তাকে এত এত তোল্লাই দেন। মল্লিকবাড়ি, জোড়াসাঁকোর সিংহরা, পাথুরিয়াঘাটার জমিদারবাড়ি, সভাবাজারের রাজবাড়ি— এমনকী কলকাতার বাইরেও লোকজন মোহনচাঁদের নাম জানে। কিন্তু এই যে রত্নটি গরানহাটায় ঘরের ভিতর বন্দি হয়ে পড়ে আছে, তার খবর তো কেউ রাখে না!

বেশ অনেকবারই মনে হয় শব্দ হয়েছে। দরজায় মৃদু কড়া নাড়ার শব্দ। ভাবনায় ডুবে থাকা মোহনচাঁদ সে শব্দ কানে নিয়েছে, মনে নেয়নি। কোনও রাতপাখির ডানার শব্দও হতে পারে ভেবেছে। কিন্তু এবার দেখল কড়ার মৃদু শব্দের সঙ্গে প্রায় ফিসফিসানির মতো একটা স্বর ভেসে আসছে— "চাঁদবাবু ঘুমিয়ে পড়েছ? দরজা খোলো।" ফিসফিস স্বর হলেও, সে ধ্বনি যেন চেনা চেনা। বিছানায় উঠে বসে মোহনচাঁদ। গায়ের কাপড় টেনেটুনে নেয়। অল্প ঠান্ডা হাওয়া এসে ঢুকছে ঘরে। এত রাতে দরজা খোলা কি ঠিক হবে! কোনও অশরীরীর ডাক নয় তো! গা ছমছম্ করে।

কিন্তু আবার সেই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। আর এবার পরিষ্কার কথা। "চাঁদবাবু, আমি। আমি শ্রীমতী। দরজা খোলো।"

হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই তো! বার বার ভুল হয়ে যাচ্ছে আজ। বাড়ির মালিককেই দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। সে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে দরজার খিল খুলে দেয়।

শ্রীমতী ঘরে ঢুকে বন্ধ দরজায় পিঠ লাগিয়ে বলে, "কি, ঘুমিয়ে পড়েছিলে চাঁদবাবু! সারারাত ধরে যদি গান শুনতে হত, তখন তো জেগে থাকতে! একটা প্রয়াগের গজ়ল ধরলে তো রাত কাবার করে দিতে পারতাম। তখন কি মজলিসেই ঘুমিয়ে পড়তে?"

শ্রীমতীর মনে কিঞ্চিৎ বিরক্তি জন্মেছে। সে খুবই চুপিচুপি এই ঘরে আসতে চেয়েছে। ডাকাডাকিতে মাসি আর আলতাবালার যদি ঘুম ভেঙে যায়, খারাপ ভাববে। সে আবার বলে, "তোমরা চাঁদবাবু যখন আখড়াই গানের লড়াই করো, শুনেছি রাত কাবার হয়ে দিনের এক প্রহরও হয়ে যায়। তখন ঘুম কোথায় যায়?"

মোহনচাঁদ উত্তর দেবে কী! সে তো জেগেই ছিল। ঘুমিয়ে পড়েনি। কিন্তু নিজে বলতেও পারছে না যে, ভেবেছিল কোনও অশরীরীর ডাক। সেটা শুনে যদি আবার এ বাড়ির মালকিন ক্ষেপে যায়!

শ্রীমতী নিজে নিজেই থামে। সে জানে কোথায় থামতে হয়। ওটুকু না বললে যে নিজের মনকে শান্ত করতে পারত না। সত্যি সত্যি নিজের বাড়িতে চোরের মতো ঘোরাঘুরি করতে হলে মনে মনে খুবই ছোট হয়ে যেতে হয়।

সে নিজেকে শান্ত করার জন্য এবার এগিয়ে এল। আর মোহনচাঁদও যে শ্রীমতীর এই রেগে যাওয়া রূপ দেখে চমকে যাবে, তা স্বাভাবিক। শ্রীমতী হাত দিয়ে মোহনচাঁদকে বিছানায় ঠেলে বসিয়ে দিয়ে নিজেও উঠে বসল। বলল, "কাল সকাল হলেই তো বাড়ি চলে যাবে চাঁদবাবু। আমি তো জানতে পারব না, আখড়াই দলের সেরা গায়ক মোহনচাঁদ বসুর আমার গান কেমন লেগেছে। তাই তো নিশুতি রাতে এসে ঘুম ভাঙাতে হল।"

মোহনচাঁদ নিজেকে এতক্ষণে গুছিয়ে নিয়েছে। সে মাটির দিকে মাথা নামিয়ে বলছে, "না, আমি ঘুমিয়ে পড়িনি। সত্যি কথাটি এই যে, আমি আপনার গান শুনে এমন অন্য ঘোরে ছিলাম যে আমার মাথা কাজ করছিল না। আমি ভাবছিলাম এই সুর, এই সুরের বিভঙ্গ তো স্বর্গের ইন্দ্রলোকের। আমার কানে তা কী করে এসে পৌঁছল!"

"ওহে দুষ্টু ছেলে! বেশ তো কথার সাগর হয়ে উঠেছ! বানিয়ে বানিয়ে বেশ তো মনোরঞ্জনের কথা কইতে শিখেছ।"

"না। আপনি বিশ্বাস করুন আপনার স্বর ও সুরের অমন সরল ত্রুটিহীন, কারুকার্যময় চলন আমাকে মুগ্ধতার চূড়োয় পৌঁছে দিয়েছে। সেখান থেকে নামতে একদম চাইছিলাম না। বা পারছিলাম না।"

শ্রীমতী আবার হাতের ঠেলায় মোহনচাঁদের হালকা শরীর বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলে, "হয়েছে হয়েছে, আর শিল্পীর সামনে তার গুণগান গাইতে হবে না। নিজেও তো কম ওজনদার গাইয়ে নয়।"

কথা বলতে বলতে শ্রীমতী মোহনচাঁদের প্রশস্ত বুকের উপর নিজের দেহভার ছেড়ে দিয়েছে। সে উপুড় হয়ে মোহনচাঁদের মুখ চুম্বন করতে লেগেছে।

পাখিদের কিচিরমিচির শব্দে ঘুম ভাঙল এবার। চোখ মেলে নিজেকে খুঁজে পেতে খানিক সময় নিল মোহনচাঁদ। কাল অনেক মদ খেয়েছিল মনে আছে। তেমন হুঁশ কি ছিল তার! ভাবে। তারপর নিজের অবিন্যস্ত ধুতি ঠিক করে বিছানায় উঠে বসতে গিয়ে দেখে পায়ের নীচে আড়াআড়ি উপুড় হয়ে শুয়ে আছে এক প্রায় নগ্ন নারী। না, তার মনে হল একটুকরো জ্যোৎস্না।

মোহনচাঁদ ঝপ করে বিছানা থেকে নেমে ধুতির কশি আটকাতে আটকাতে সেদিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল। তার বিছানায় কী করে এল শ্রীমতী! মুখের একপাশ দেখা যাচ্ছে। গোলাপের মতো রং। দিবাকর এক্ষুনি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়বে। তার সিঁদুররাঙা বেশ যেন শ্রীমতীর শরীরে। চোখে পড়ছে স্ফীত স্তনের এক অংশ। যেন রাজ হংসের পাখা মেলা।

মোহনচাঁদ ভয় পেয়ে গেল। তবে কি এই নারীর সঙ্গে সে এই বিছানায় রাত কাটিয়েছে? মোহনচাঁদ জানে সে এখনও তার কৌমার্য বিসর্জন দেয়নি। মনের ভিতর হাহাকার করে উঠল। তবে কি নিজের অজ্ঞাতেই



তুমি এই বাড়িতে ফিরে এসেছ মানে, এই বাড়ির প্রতি, শ্রীমতীর প্রতি তোমার টান আছে। কিন্তু নিজের অহংকার দিয়ে তুমি তাকে আড়াল করে রেখেছিলে।

তা ঘটে গিয়েছে? কিন্তু সে তো চেয়েছে, প্রথম সেদিন সে উপভোগ করবে তারিয়ে তারিয়ে। বাড়ি থেকে পাত্রী দেখা চলছে। যে কোনও সময় একটা সম্বন্ধ পাকা করে ফেলবে বাবামশাইরা।
মোহনচাঁদ খুব দ্রুত এবার নিজের ছেড়ে রাখা পোশাক পরে নিতে থাকে। আর বার বার পিছন ফিরে দেখতে থাকে, শ্রীমতীর সৌন্দর্য কেমন ভোরের মতো ফুটে উঠতে লেগেছে। ভাল লাগছে না যে, তা নয়। সুরের প্রকাশের মতোই তা কারুকাজ মেলছে। তার ভাঙা খোঁপার দিকে চোখ যায়। সেখানে যেন কত না-বলা কথার অন্ধকারে ঘেরা রহস্য। উরু পর্যন্ত উঠে আছে ঘিয়ে রঙের মখমলের শাড়ি। খোলা পা যেন শাড়ির রংকে ম্লান করে দিয়েছে। পোশাক পরা শেষ করে মোহনচাঁদ একবার গলাখাঁকারি দেয় অল্প করে।
"এই যে, শুনছেন?"
জানিয়ে যেতে হবে তো। না বলে চলে যাওয়াটা খুবই খারাপ। সে দু'বার গলাখাঁকারি দিতে ওই উপুড় হওয়া অবস্থাতেই শ্রীমতী চোখ মেলে। তারপর পিটপিট করা চোখের ভিতর মোহনচাঁদের গমনউদ্যত চেহারা দেখে সে আলুথালু শাড়ি ঠিক করতে করতে উঠে বসে। গায়ে কাপড় টেনে দেয়।
"চাঁদবাবু, চলে যাচ্ছ?"
মোহনচাঁদ অলঙ্কারহীন, সাজের বাহুল্যহীন এক জীবন্ত পরীকে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিহ্বল। কথা সরছে না মুখে।
শ্রীমতী বলল, "যাবেই তো চাঁদবাবু, তবে যাওয়ার আগে আমার একটা ছোট্ট কাজ করে দেবে?"
"হ্যাঁ, বলুন। নিশ্চয়ই করব।"
শ্রীমতী ঘরের এককোণে গিয়ে একটা দেরাজ খোলে। তারপর সেখান থেকে একটা ছোট্ট রুপোর কৌটোর মুখ খুলে হাত বাড়িয়ে তালু মেলে ধরে। "দাও, চাঁদবাবু, আমার সিঁথিতে লাগিয়ে দাও। তোমার হাতের সিঁদুরের ছোঁয়া পেয়ে আমার সিঁথি বর্তে যাক। কাল রাতে আমরা যে স্বামী-স্ত্রীর মতো কাটিয়েছি।"
শ্রীমতী জানে একজন বিধবার জীবনে কী অপরিসীম গ্লানি আর হতাশা এসে বাসা বাঁধে। কী শারীরিক নির্যাতনের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। এমন কি মৃত্যুও এসে সামনে দাঁড়ায়। শ্রীমতী একবার এই বৈধব্যজীবনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার স্বাদ পেয়েছে। আর সেদিকে যেতে রাজি নয়। রাজা মহানন্দর কাছে প্রথম যেদিন সে নথ উতরে দিয়েছিল, সেদিনও রাজার কাছ থেকে সিঁদুর যাঞ্চা করেছিল। রাজা পরম মমতায় তা শ্রীমতীকে দিয়েছিলেন। শ্রীমতীকে যে তিনি খুবই ভালবেসেছিলেন!
রামনিধির সঙ্গে প্রথম শারীরিক সম্পর্কের দিনেও তাই হয়েছিল। রামনিধি শ্রীমতীকে নিজের বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরে মাথায় সিঁদুর লেপে দিয়েছিলেন। শ্রীমতী জানে তাই তো রাজা মহানন্দ রায় মারা যাবার পর বাহ্যিকভাবে তেমন আঘাত লাগেনি শ্রীমতীর। সে তো জানে সে বিধবা নয়! রামনিধি তার স্বামী।
এখন মোহনচাঁদের দিকে সিঁদুরের কৌটো বাড়িয়ে ধরে শ্রীমতীর ভাবনা আরও সম্প্রসারিত হয়। রামনিধি শ্রীমতীর চেয়ে অন্তত ৩৫ বছরের বড়। তিনি যে কোনও সময়েই মারা যেতে পারেন। তিনি যদি মারা যান তো আবার শ্রীমতী বিধবা হয়ে পড়বে! যদি মোহনচাঁদ তাকে সিঁদুর পরায় তো সেই ভয় থাকছে না।
মোহনচাঁদ ভাবল, যা ভয় করছিল, তা হলে তা-ই হয়েছে! গত রাতে তার কৌমার্য গিয়েছে। সম্পর্কহীন এই কাজ তো প্রায় বারনারীগ মনের মতো! বাড়ির কাছেই সোনাগাজীতে, কম্বুলিটোলায় কত ঢলোঢলো সুন্দরীর হাতছানি। কখনও যায়নি সে। যেতে চায়ওনি। বন্ধুরা যারা সেখানে নিয়ম করে যায়, তারা সকলেই বিবাহিত। বিয়ে না করে সে সেখানে যেতে রাজি নয়।
মোহনচাঁদ ভাবল এই স্বর্গের সুন্দরীর বাড়ানো হাত সে কীভাবে অস্বীকার করবে! এমন সুন্দরী, সবচেয়ে বড় কথা এমন বিদুষী মহিলা! এমন প্রাণ আকুল করে দেওয়া কণ্ঠের মালিক, তাকে কীভাবে অস্বীকার করতে পারা যায়? সে তো নিজেই এর জন্য মরে আছে! এমন রূপে, গুণে উৎকৃষ্ট সুন্দরীর সান্নিধ্য পেতে সৌভাগ্যের অধিকারী হতে হয়। সেই ভাগ্য নিজে তার সামনে হাত বাড়িয়ে আছে।
মোহনচাঁদ সামনে দাঁড়িয়ে থাকা শ্রীমতীর হাত থেকে সিঁদুরের কৌটো নিয়ে তার সিঁথিতে খুব ঘন করে পরিয়ে দিল। তারপর নিজের দীর্ঘ শরীরের ভিতর তাকে টেনে আনল। এই কৌমার্য হরণের কালটি স্মরণীয় করে নিজে এবার সেই অভিজ্ঞতা শরীর-মনে তুলে রাখবে।
কাল রাতে যদি কিছু হয়ে থাকে, তবে তা তার নিজের ইচ্ছেয় হয়নি। এখন নিজের ইচ্ছেয় হবে। সে শ্রীমতীর মুখ চুম্বন করে শ্রীমতীর কুঞ্জফুল শাড়ি একটানে খুলে দিল। তারপর সেই নগ্নিকা দেবীকে নিয়ে ফেলল বিছানায়। আর নবীন যৌবনের পরাক্রান্তি দিয়ে শ্রীমতীকে ভরিয়ে তুলল।
শ্রীমতীর প্রতিটি রোমকূপ খুলে যাচ্ছিল আনন্দের প্লাবনে। শরীরের এই স্বাদ শ্রীমতী রাজা মহানন্দ রায় বা রামনিধি গুপ্তের কাছে পায়নি। শ্রীমতীর শরীর মোহনচাঁদের দাবানলের সামনে পুড়ে খাক হয়ে যেতে লাগল। এই পুড়ে ওঠাই তো এতদিন চেয়েছে সে!

নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী চেয়েছিল রামনিধির পরাজয়। সে এমন মুফতি শাল পেতে চায়নি। এই জোড়া শাল বাড়িতে বয়ে আনার পর আরও যেন তা খোঁচাচ্ছে। এটা যে পরাজয়ের স্মারক!
সিমলের বাড়িতে এসে দুপুরের স্নান আহারের পর পরই বেরিয়ে পড়ল রাম বসুর বাড়ির দিকে। ও-ই একমাত্র প্রতিবাদ করে নিত্যানন্দের মুখ রক্ষা করেছে। এক হাট লোকের মাঝে হরু ঠাকুরের পিন্ডি চটকে দিয়েছে। রোজ রোজ রামনিধির ছাতা ধরা! সে বলেছে,
"ঠাকুর বাঁচবেন না আর বিস্তর দিন।
তোমার চক্রে ধরেছে পোকা, স্বর্ণরেখা অতি ক্ষীণ।"
নিত্যানন্দ দাস পথ হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে, এই হরু ঠাকুর এতখানি বেইমান হতে পারে! একসময় হরুর দলেই তো ছিল সে। এতটুকু আপন পর ভাববে না! তা ছাড়া সুযোগ যখন নিয়েছিল, সে তো বলেছিল, "গাওনাটা ঠিকঠাক গা, দেখবি তোরাই পুরস্কার পাচ্ছিস!"
নিত্যানন্দ গজরায়— আমিও দেখে নেব হরু ঠাকুর, তোমাকে কে আর মধ্যস্ততা করতে ডাকে! গাওনা না গেয়েও দিব্য গাড়ু-ঘড়া, পুজো পেয়ে যাচ্ছ! তোমার মাজা ভাঙতে হবে। আর মাজা ভাঙব ওই রামনিধিরও। আমি জাত শুদ্র। জেনে রাখবে, চণ্ডালের রাগ মাথায় উঠলে আর নিস্তার নেই!
পথে হাঁটতে হাঁটতেই নিত্যানন্দ বৈরাগী ছক পেতে নেয়। রাম বসু ছাড়া আর কে কে হরুকে দেখতে পারে না! হরুর দলের দু'জন, নীলু ঠাকুর আর তার ভাই রামপ্রসাদ ঠাকুরকে তো সঙ্গে পেয়েই যাবে। আর ভবানী বেনেকেও পাবে। এরা খুবই খাপ্পা হরু ঠাকুরের প্রতি। সব ভাল ভাল গান ভোলা ময়রাকে দিয়ে দেয় হরু ঠাকুর। মনে হয়, আজকাল যা আদব হয়েছে, ভোলা ময়রা টাকাপয়সা না দিক, মিঠাই-টিঠাই দিয়ে হয়তো সুযোগ করে রেখেছে। আর আছে বাঁধনদার কৃষ্ণমোহন বাঁড়ুজ্যে। ওর সঙ্গে নীলু ঠাকুরের খুব পটে। নীলুকে দিয়েই ওকে সঙ্গে নিয়ে নিতে হবে। ভারী চমৎকার বাঁধে সে গান। নিত্যনন্দ বৈরাগী হাঁটতে হাঁটতে গুনগুন করে ধরে তার দুটো কলি।
"কও কথা বদন তোলো হও সদয় এই ভিক্ষা চাই। / রাধার অধৈর্যে, এলেম অপার্যে,

/ তোমার কংসরাজ্যে অংশলোভে আসি নাই।”

জোড়াসাঁকোয় নিজের বাড়িতে বসে রাম বসু দূর থেকেই দেখছে নিত্যানন্দ বৈরাগী আসছে। তার চলার ভিতরেই, বোঝা যাচ্ছে, কেমন একটা অন্য ভাব। কবিয়ালদের মতো হাত বাড়িয়ে দিয়ে মুখে বিড়বিড় করছে। আর চলনে কেমন উদাস করা ভাব। ভৃত্যকে হুঁকো সাজাতে বলে দিয়ে বাড়ির দেউড়ির দিকে এগিয়ে গেল রাম বসু।

এ বাড়িটা রামমোহনের পিসির বাড়ি। ছোটবেলা থেকেই এখানে আছে সে। নিজের ভূমি সেই হাওড়ার শালকেতে। সেখানে থাকলে কিছু হত! এই গানের দলের সঙ্গে যোগাযোগ হত! হত না। তার পড়াশুনো থেকে চাকরিবাকরি, সব এখান থেকেই হয়েছে। বিরাট প্রাসাদের মতো বাড়ি। তার নীচের তলা পুরোটা রামমোহনের অধিকারে। তার বাড়িতে সব কবিদের ভিড় লেগে থাকে রবিবারের সকালে। অন্যদিন তাকে পাওয়া যায় না। সে তো সাহেবদের কোম্পানিতে কেরানির চাকরি করে। এই শনিবারের সন্ধ্যা থেকে রবিবারের দুপুর পর্যন্ত তো সভাবাজারের রাজবাড়িতে গানের লড়াইতে কাটিয়েছে। সকালে অনেকে এসে ফিরে গিয়েছে হয়তো। ভবানী বেনে, নীলু ঠাকুর, মোহন সরকাররা তাদের দলের জন্য গান নিতে আসে। রাম বসুর গানের হাতটি চৌখস। তার গানে আখড়াইয়ের আসর জমে যায়। তাই তো এত কদর! আর মুফতিতে পায় বলেও লোকের ভিড়।

নিত্যানন্দ বৈরাগী এর আগে তেমন একটা এসেছে বলে মনে পড়ে না। সে তো হরুর দলে গান করত। পরে হরু ঠাকুর দল তুলে দিলে এদিক ওদিক করেছে। রাম বসু ভাবল, রাজকৃষ্ণ দেবের গানের আসরে নিজে গানের কেদ্দারি দেখাতে গেছিল নিতে বৈরাগী। রাম বসুর কাছ থেকে একটা গান নিয়ে বাকিটা নিজের চালাতে গেছিল। তাতে যা হওয়ার তাই হয়েছে। আরে বাবা, রামনিধি পাকা মাথা। কালোয়াতি গানে শিক্ষা নিয়ে এসেছে। সে শোরি মিঞার টপ্পা বাংলায় বাঙালির মতো করে ফেলে মাত করে দিয়েছে গানের জগৎ। সেয়ানের সঙ্গে টেক্কা দিতে এলিতেলি গান নিলে হবে! সমানে সমানে টেক্কা দিতে হবে। নিজে গোঁয়ার্তুমি করলে, দলকেও ডোবালে। জোড়াসাঁকোর সিংহবাবুদের মান রাখলে কোথায়, অ্যাঁ! আরে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না বাবুদের কথা! যে পয়সা ছড়াবে, সে তো কিছু ফিরে পেতে চায় নাকি!

রাম বসু নিত্যানন্দ বৈরাগীর আগমনের কারণ নিজের মনের ভিতরে তৈরি করে ফেলেছে। না, সে সিংহবাড়িতে গিয়ে নিত্যানন্দের হয়ে সওয়াল করতে পারবে না। কাল সিংহবাবু স্বয়ং বসেছিলেন রাজা রাজকৃষ্ণের পাশে। এই বাগবাজারের দল, বলা যেতে পারে রাজকৃষ্ণেরই দল। তো তার জয়ে মনে মনে অহংকার তো হবেই। আর পাশে থাকা সিংহবাবুকে দু-একটা দম্ভের কথা না কয়ে ছেড়েছে নাকি!

খোঁচা খাওয়া বাঘের মতো হয়ে আছে সিংহবাবু। তাকে উপযাচক হয়ে কিছু বলতে যাওয়া মানে সাধ করে তরোয়ালের নীচে নিজের গলা পৌঁছে দেওয়া।

“কী হল নিত্যানন্দ বাবাজি, রাস্তায় আসতে আসতে কার মুন্ডুপাত করছিলেন?”



> জোড়াসাঁকোয় নিজের বাড়িতে বসে রাম বসু দূর থেকেই দেখছে নিত্যানন্দ বৈরাগী আসছে। তার চলার ভিতরেই, বোঝা যাচ্ছে, কেমন একটা অন্য ভাব।

“আরে না না। পথে আসতে আসতে কৃষ্ণমোহন বাঁড়ুজ্যের কথা মনে পড়ল। তো তার একখানা পদ খুব প্রাণের ভিতর লেগে ছিল। তারে ভাঁজতে ভাঁজতে পথ হাঁটছিলেম। আমি দেখেছি রাস্তার দিকে খেয়াল না করে অন্য দিকে মন দিলে পথ হাঁটার ক্লান্তি আর ক্লান্তি মনে হয় না।”

“আসুন, আসুন। আপনি মনে হয় এই প্রথম আমাদের বাড়িতে এলেন?”

“না, আগে একবার নীলু ঠাকুরের সঙ্গে রবিবারের সকালবেলায় এসেছিলাম। তো তখন কী ভিড় কী ভিড়! ভায়ার সঙ্গে কথা কইতেই পারলাম না। অনেকদিন থেকে মন করছিল, একটিবার যাই। চলে এলুম।”

“বেশ করেছেন। আসবেন বইকী!”

“তা ভায়া, কাল রাতে তো রাজকৃষ্ণের গানের মজলিসে ছিলে! তা কেমন লেগেছে আমাদের গান?”

রাম বসু গিয়েছিল সিংহবাবুর অনুরোধে। তিনি রামমোহনকে পছন্দ করেন। আসরে যাওয়ার সময় তাঁর ঘোড়ার গাড়িতে তুলে নিয়ে গেলেন। তাঁর আর একটা উদ্দেশ্য ছিল, গানের বিচারের জন্য একজন খাস লোককে নিয়ে যাওয়া। তিনি রাজকৃষ্ণর মতো গানের সমজদার নন। মানুষজন ভালবাসেন, তাই দল গড়েছেন আখড়াইয়ের।

রাম বসুর ইচ্ছে করছিল মুখের উপর বলে দেয়, দল ডুবেছে আপনার জন্য। কিন্তু বাড়িতে এসেছে, কোনও কটু কথা বলা ঠিক হবে না। সে বলল, “ভালই তো, ভালই তো, আপনাদের গান তো ভালই হয়েছে।”

“হ্যাঁ ভায়া, তোমার ভাল লেগেছে তা জানি। তা না হলে তুমি হরু ঠাকুরের মুখের উপর অমন প্রতিবাদ করতে যাবে কেন! তোমাকে ধন্যি মানি ভায়া। একমাত্র তুমিই হরু ঠাকুরের একচোখোমির প্রতিবাদ করলে। আর সবই তো পোঁ ধরা পাবলিক। হরু ঠাকুর ঘুমোলে ঘুমোয়, জাগলে জাগে।”

রাম বসুর চটাতে ইচ্ছে করছিল না নিতাই বৈরাগীকে। ওই হরু ঠাকুরকে সে-ও দু'চক্ষে দেখতে পারে না। হরু ঠাকুরকে টাইট দিতে সে-ও চায়। নিতাই বৈরাগীকে দিয়েই যদি সেটা করা যায়, ভাল। আপাতত নিতাই বৈরাগী যা বলছে তা শুনে নেওয়া যাক।

রাম বসুর ভৃত্যর হাত থেকে হুঁকো নিয়ে নারকেলের মালার তেল-চকচকে খোলটি কপালে ছুঁয়ে নিয়ে নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী চোখ বুজে সেই মালার গোল ছিদ্রে মুখ রেখে গোটা কয়েক ভুড়ুক ভুড়ুক টান দিল। তারপর কিছু ধোঁয়া নাক-মুখ থেকে বের করে বলল, “বড্ড তামুকের তেষ্টা পেয়েছিল ভায়া। তুমি একেবারে মনের কথাটি ধরে নিয়ে বোষ্টমের ইচ্ছে পূরণ করলে। মহাপ্রভু তোমায় সুখী করুক।”

এই নিতে বোষ্টম বৈষ্ণব না হাতি! বাপ-ঠাকুরদা ভেক ধরে বোষ্টম হয়েছিল। রাম বসুও হুঁকোয় টান দিতে দিতে মনে মনে বলেছে, এই কবিয়ালদের জগতে কার হাঁড়ির খবর, নাড়ির খবর আমি জানি না! বয়সে ছোট বলে সব চেপে থাকি। আসরে দাঁড়িয়ে এই যে হরু ঠাকুর বা নিতাই দাস-রা বুলি ঝাড়ে,তা সব কেনা বুলি। এর তার কাছ থেকে নিয়ে আসর মাত করে আর নিজের নাম ফাটায়। নিজে নিজে গান বাঁধতে হলে অনেকের দম ফুরিয়ে যাবে। রাম বসুর রবিবারের দরবারে সকলেই আসে। সব খবর তার কানের গোড়ায় এসে জমা হয়। এই নিতাই দাসের ফুটুনি কীসের এত! কাল যেসব গান গেয়েছে তার মধ্যে ‘খেউড়’ তো সিমলের গৌর কবিরাজের লেখা। আর ‘প্রভাতী’ গান তো নবাই ঠাকুরের।

নিতাই দাস বুঝে উঠতে পারছে না কীভাবে কথাখান ফেলবে। মানে হরু আর রামনিধিকে কীভাবে প্যাঁচে ফেলবে সে। একবার ভুল যায়গায় হাত পড়লে আর দলে ভেড়ানো যাবে না। ঠিকঠাক মন পড়ে, বুঝে তবে নামতে হবে কাজে।

“জানো তো ভায়া, সেদিন হরু ঠাকুর কচ্ছিল পাথুরিয়াঘাটার এক আসর নিয়ে। কচ্ছিল, ছিঃ ছিঃ ছিঃ। আখড়াই আসরে মেয়েছেলে ঢুকে গেল যে! এ যে বাইজিবাড়ি করে ছাড়ল গানের আসরকে!”

“হ্যাঁ, তাই বলেছে বুঝি! ওর বাপের সম্পত্তি নাকি এই গাহনার আসর! ওই নবকৃষ্ণ দেব ওর মাথাটা খেয়ে রেখে গিয়েছে। হরু হরু করে তাঁর একেবারে বুকের থুতু আঁটকে যেত! আর হরুকে দিয়ে নিজের যা কিছু মনে আসছে, সেরকম গান বাঁধিয়ে নিত।”

“আমিও তাই কচ্ছিলাম ভায়া। নিজে যখন রাজা নবকৃষ্ণের মজলিসে বাইনাচ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছে, তখন তো মনে হয়নি! বলেনি তো রাজাবাবুকে, না এটা ঠিক হচ্ছে না। এখন গাহনার আসরে আমাদের ঘরের সাধারণ মেয়েরা উঠে গান করলে ওনার মাথা খারাপ হয়ে যায়! ওনার সমাজ সমাজ বাতিক ধরে!”

মোক্ষম জায়গাটি পেয়ে গিয়েছে নিতে বোষ্টম। বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিট আর গরানহাটা স্ট্রিট যেখানে চিৎপুর রোডে মিশেছে, সেই জায়গাটা বটতলা। আর সেই বটতলার নায়ক রামনিধি। তাকে তাক করতে হলে আর একটা নায়ক দরকার। রাম বসু হল সেই নায়ক। রামনিধি বাদে গানের আখড়ার প্রায় সব কীর্তিবান পুরুষরা রাম বসুর কাছে আসে গান নিতে। তাকে কব্জা করতে পারলে রামনিধির সঙ্গে হরু ঠাকুরকেও দেখে নেওয়া যাবে। এখন রাম বসুর কাছে যেতে নায়িকা যজ্ঞেশ্বরীকে হাতিয়ার করে ফল মিলেছে হাতেনাতে। নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী মনে মনে নিজের বুদ্ধির তারিফ করল। রাম বসুর মনের দরজায় সে পৌঁছে গিয়েছে। এবার কড়া নাড়ানাড়ির সময়।

নিতে বোষ্টম হাতের হুঁকো পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে নামিয়ে রেখে বলল, “যা কচ্ছিলাম ভায়া, তুমি যদি আসরে থাকতে তোমারও মাথা গরম হয়ে যেত। আসর হচ্ছে নীলু ঠাকুরের দল আর ভবানী বেনের দলের। তুমি তো জানোই নীলু আগে হরু ঠাকুরের দলে জিল দিত। এখন নিজেই নতুন দল গড়েছে। গান যে খুব ভাল গায়, তা নয়। তবে সামলে নেয় ওই মেয়েটি। সে ভাল বাঁধনদারও।”

রাম বসু গম্ভীর মুখে বলল, “সে আমি জানি। নীলু তো আমার কাছ থেকেও গান নেয়। তবে আপনি বলে দেবেন, আমি আর এমনি এমনি ওদের গান দেব না। অনেক দিয়েছি। ভবানী বেনে তো কত বছর ধরে আমার গান নিচ্ছে।”

“সে কি আমি জানি না ভায়া! তোমার রসসুধা নিয়ে কত কবিওয়ালা কল্কি পেয়ে গেল! কত লোক গলায় পুরস্কারের শাল, মালা ঝোলাল— তা কি আমি জানি না ভাবছ! আমি আজকের লোক নই হে। সেই রামজির কালের লোক।” বলতে বলতে নিত্যানন্দ কপালে হাত ছুঁয়ে গুরুজিকে স্মরণ করল।

রাম বসুর মেজাজটা চটকে আছে। কাল সোমবার তো আবার সেই স্টুয়ার্ট কোম্পানির দোরে গিয়ে পড়তে হবে। সেখানে কথায় কথায় ওই ওভারশিয়র লোকটা হাঁকাহাঁকি করে। আরে বেতন তো মাত্র দশটাকা! তার জন্য যা খাটিয়ে নেয়! আবার কথাও শোনায়। এই কেরানির কাজটা তার পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু পিসেমশাই বারানসি ঘোষ এই কাজটা জুটিয়ে দিয়েছেন। ঝট করে ছেড়ে দিলে যদি অপমানিত হন! বাবা মারা যাওয়ার পর পরিবারের দায় যে তাঁরই উপরে। তা ছাড়া সেই কবে থেকে জোড়াসাঁকোর এই পিসেমশাইয়ের বাড়িতে তার বাস। এখানে থেকেই তো পড়াশোনা শিখেছে। এখন পিসেমশাইকে চটিয়ে আর তো সেই শালকে গ্রামে ফিরে গিয়ে বাস করতে পারবে না সে! কিন্তু এত চাপ দিচ্ছে ব্রিটিশের খয়ের খাঁয়েরা, মন দুর্বল হয়ে যায়। পেট বাঁচানোর জন্য কেরানির কাজটা সে করে, কিন্তু মন বাঁচানোর উপায় গান লেখা বন্ধ হয়ে গেলে সে তো মারা যাবে!

আজকাল গানের লেখা আর সুর সরে যাচ্ছে। মেজাজ নষ্ট হচ্ছে। তারপর আজ বিকেল থেকে এই নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী সব উল্টোপাল্টা বিষয় তুলে আনছে। সে তাড়াতাড়ি বিদেয় করতে চায় নিতে বোষ্টমকে। আজ ঠাকুরদাস সিংহের দলের জন্য একখান গান লিখে রাখার কথা। অনেকদিন থেকে পীড়াপীড়ি করছে সে। রাম বসু আর সময় দিতে চায় না নিত্যানন্দকে।

“হ্যাঁ, তারপর বলুন তো বৈরাগী মশাই, কী বলছিলেন?”

“কচ্ছিলাম, সেদিন দোলপূর্ণিমার রাতে সভাবাজারে কালীশঙ্কর ঘোষের বাড়িতে গাহনা পড়েছে। তো সেখানে ভবানী বেনে আর নীলু ঠাকুরের দলের ভিতর জোর লড়াই। হরু ঠাকুর উপস্থিত মধ্যস্থতা করার জন্য।”

রাম বসু বলল, “তা ভবানীদা কেমন গাইলেন? শ্রোতারা খুশি ছিল তাঁর গানে?”

“হ্যাঁ ভায়া। ভবানী বেনের গলা তো খুব মধুর! তার গান একেবারে বুকে এসে ধাক্কা মারে। আর সে ভাল গাহনা তো দেবেই। সে যে তোমার কাছ থেকে গাহনা নেয়। তোমার গান পেলেই তো কিস্তিমাত।”

“তালে গোলটা কোথায়?”

“না তো! কোনও গোল ছিল না। ভবানী বেনের দলের গানের শেষে শ্রোতাদের হাততালি থামতেই চায় না। মেয়েরা চিকের আড়াল থেকে অহো, আহা ধ্বনিতে মুখর করে রেখেছে চারপাশ। রাত তখন মাঝামাঝি হয়েছে। লুচি আর মণ্ডা পেয়েছে সকলেই। শ্রোতারাও। খাওয়া-দাওয়ার পর আবার সাজ বাজনা দিয়ে আসর সাজিয়ে ‘ভবানী’ গীত দিয়ে শুরু করেছে নীলু ঠাকুর।”

রাম বসুর হাতের নিভে যাওয়া কলকের টিকে পাল্টে দিল চাকর। রাম বসু হুঁকোয় মুখ না দিয়ে বলল, “গোঁসাইয়ের কলকেতেও আগুন পালটে দে রাখহরি।”

“হ্যাঁ, যা কচ্ছিলাম ভায়া। কোথাও কোনও গোল নাই। কিন্তু গোল ডেকে আনা তো হরু ঠাকুরের উদ্দেশ্য। তিনি গান ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু লোকের চোখে পড়তে চাওয়ার নেশা ছাড়তে পারেননি।”

“কেমন, কেমন?”

রামমোহন বসুর দু’চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। হুঁকোর নারকেলের মালার ছিদ্র থেকে মুখ সরিয়ে এনে অল্প ধোঁয়া ফেলে দিয়ে নিতে বোষ্টমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে। নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী এই যে রাম বসুর মনোযোগ নিজের দিকে আনতে পারল, তাতে নিজেকে সাবাশি দিতেই হল তাকে। সে তার লম্বা চুলে মাথা দুলিয়ে একটা হিল্লোল তুলল। গানের আসরে ঢোল বাজাতে বাজাতে শ্রোতাদের আবেগকে মথিত করে দিতে নিত্যানন্দ এ রকম করে। এটা একটা অভ্যাসের পর্যায়ে চলে গিয়েছে।

“কচ্ছিলাম, ভবানী বেনে যতই ভাবুন, আসর কেড়ে নিয়েছেন তিনি, কিন্তু না। নীলু ঠাকুরের দলের সেরা অস্ত্র তো হাতে রয়েছে। খেউড় পর্যায়ে সেই অস্ত্র ছাড়বেন তিনি। সকলেই জানে। যারা জানে, সে সব দর্শক অপেক্ষা করতে করতে আর পারছিল না। তাদের একজন সাজবাদ্যির মধ্যে উঠে বলে ফেলল, “হ্যাদে দ্যাখ নীলু, ফ্যার ঝদি ওই কালকুকিলির প্যানপেনে গান ধল্লি তো, দো, দেলাম খাড় গা।”

(ক্রমশ)

অলংকরণ: সৌমেন দাস



ব্লমিং অনিয়নস

মাছ-মাংসের জাদু। সঙ্গে পেঁয়াজ, ব্রকোলির যুগলবন্দি। শেখাচ্ছেন অল্ট-এয়ার বুটিকের সিনিয়র সু শেফ চিরঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

পুজোর আবহে মেতে উঠুন রেস্তোরাঁ-রেডি খাবারে। পুজোয় কীভাবে আপ্যায়ন করবেন অতিথিদের? রইল তারই সুলুকসন্ধান।

ব্লমিং অনিয়নস

উপকরণ: **ডিপের জন্য:** মেয়নিজ় ৬০ গ্রাম, সাওয়ার ক্রিম ২০ গ্রাম, সস ২০ গ্রাম, ওরচেস্টারশায়ার সস ১০ গ্রাম, হর্স র‍্যাডিশ ১০ গ্রাম, প্যাপরিকা পাউডার ২ গ্রাম, গোলমরিচ ২ গ্রাম, নুন স্বাদমতো। **অনিয়ন তৈরির জন্য:** বড় পেঁয়াজ ২টো, ময়দা ২ কাপ, প্যাপরিকা পাউডার ২০ গ্রাম, ড্রায়েড থাইম ২ গ্রাম, ড্রায়েড অরিগ্যানো ২ গ্রাম, জিরেগুঁড়ো ২ গ্রাম, গোলমরিচ ২ গ্রাম, ডিম ২টো, দুধ ১ কাপ, নুন স্বাদমতো ও ফ্রাই করার জন্য কর্ন অয়েল।

প্রণালী: ডিপের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপকরণ একটি পাত্রে মেশান ও ফ্রিজে রেখে দিন। পেঁয়াজকে ফুটে থাকা ফুলের আকারে কাটুন। দ্বিতীয় পাত্রে ময়দা, প্যাপরিকা, থাইম, অরিগ্যানো, জিরেগুঁড়ো ও গোলমরিচ একসঙ্গে মেশান। অন্য একটি পাত্রে ফেটানো ডিমের সঙ্গে দুধ ও এক কাপ জল মেশান। পেঁয়াজটিকে দ্বিতীয় পাত্রের মিশ্রণে ভালভাবে ডাস্ট করুন। ফেটানো ডিমের কোট দিন এবং আবার দ্বিতীয় পাত্রের মিশ্রণে ডাস্ট করুন। ছাঁকা তেলে ভাজুন। ডিপের সঙ্গে চেখে দেখুন ব্লমিং অনিয়নস।



ফ্রায়েড চিকেন

উপকরণ: চিকেন থাই ৬টা (প্রতিটি ৩০ গ্রামের), বাটার মিল্ক ৩ কাপ, সস $^1/_2$ কাপ, গোলমরিচ ১ চা-চামচ, নুন ২ চা-চামচ। **মিশ্রণের জন্য:** ময়দা ৩ কাপ, কর্নস্টার্চ $^1/_2$ কাপ, প্যাপরিকা পাউডার ১ চা-চামচ, পেঁয়াজগুঁড়ো ২ চা-চামচ, আদাগুঁড়ো ২ চা-চামচ, ড্রায়েড অরিগ্যানো ১ চা-চামচ, ড্রায়েড বেসিল ১ চা-চামচ, সাদামরিচগুঁড়ো ১ চা-চামচ, নুন ১ চা-চামচ, তেল পরিমাণতো।



ফ্রায়েড চিকেন

প্রণালী: একটি বড় পাত্রে বাটার মিল্ক , সস, মরিচগুঁড়ো ও নুন ভালভাবে মেশান। চিকেনের পিস দিয়ে ৪ ঘণ্টার জন্য ফ্রিজে রাখুন। একটি প্যানে $^3/_4$ ভাগ তেল দিন ও ৩৫০ ডিগ্রি তাপে গরম করুন। একটি পাত্রে যথাক্রমে ময়দা, কর্নস্টার্চ, প্যাপরিকা পাউডার, পেঁয়াজগুঁড়ো, আদাগুঁড়ো, ড্রায়েড অরিগ্যানো, ড্রায়েড

বেসিল, সাদামরিচগুঁড়ো ও নুন ভাল করে মেশান। চিকেন সহযোগে এই মিশ্রণ ভালভাবে নাড়াচাড়া করুন। প্যানে তেল দিয়ে চিকেন কড়া করে ভাজুন। মনের মতো সাজিয়ে চমক দিন অতিথিদের।

মালাই ব্রকোলি

উপকরণ: মাঝারি মাপের ব্রকোলি ১টি, জল-ঝরানো দই ১০০ গ্রাম, কাজুবাটা ২০ গ্রাম, ফ্রেশক্রিম ২৫ গ্রাম, সাদাগোলমরিচগুঁড়ো ৫ গ্রাম, চিনির গুঁড়ো ৫ গ্রাম, কুরনো চিজ় ২৫ গ্রাম, এলাচগুঁড়ো ২ গ্রাম, রসুনকুচি ১০ গ্রাম, পুদিনাপাতার চাটনি ২০ গ্রাম, স্যালাড অয়েল ২৫ মিলি।
প্রণালী: ব্রকোলির টুকরোগুলি গরম জলে দিন। সবুজ রং ফিরিয়ে আনতে ঠান্ডা জলে ডুবিয়ে রাখুন। ম্যারিনেড করার জন্য দই, কাজুবাটা, ফ্রেশ ক্রিম, সাদাগোলমরিচগুঁড়ো, চিনির গুঁড়ো, কুরনো চিজ়, এলাচগুঁড়ো, রসুনকুচি ও স্যালাড অয়েল একসঙ্গে ভালভাবে মেশান। মিশ্রণে ব্রকোলির টুকরো দিন। তন্দুরে লাল করে সেঁকুন। পুদিনাপাতার চাটনির সঙ্গে মনের মতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন মালাই ব্রকোলি।


মালাই ব্রকোলি

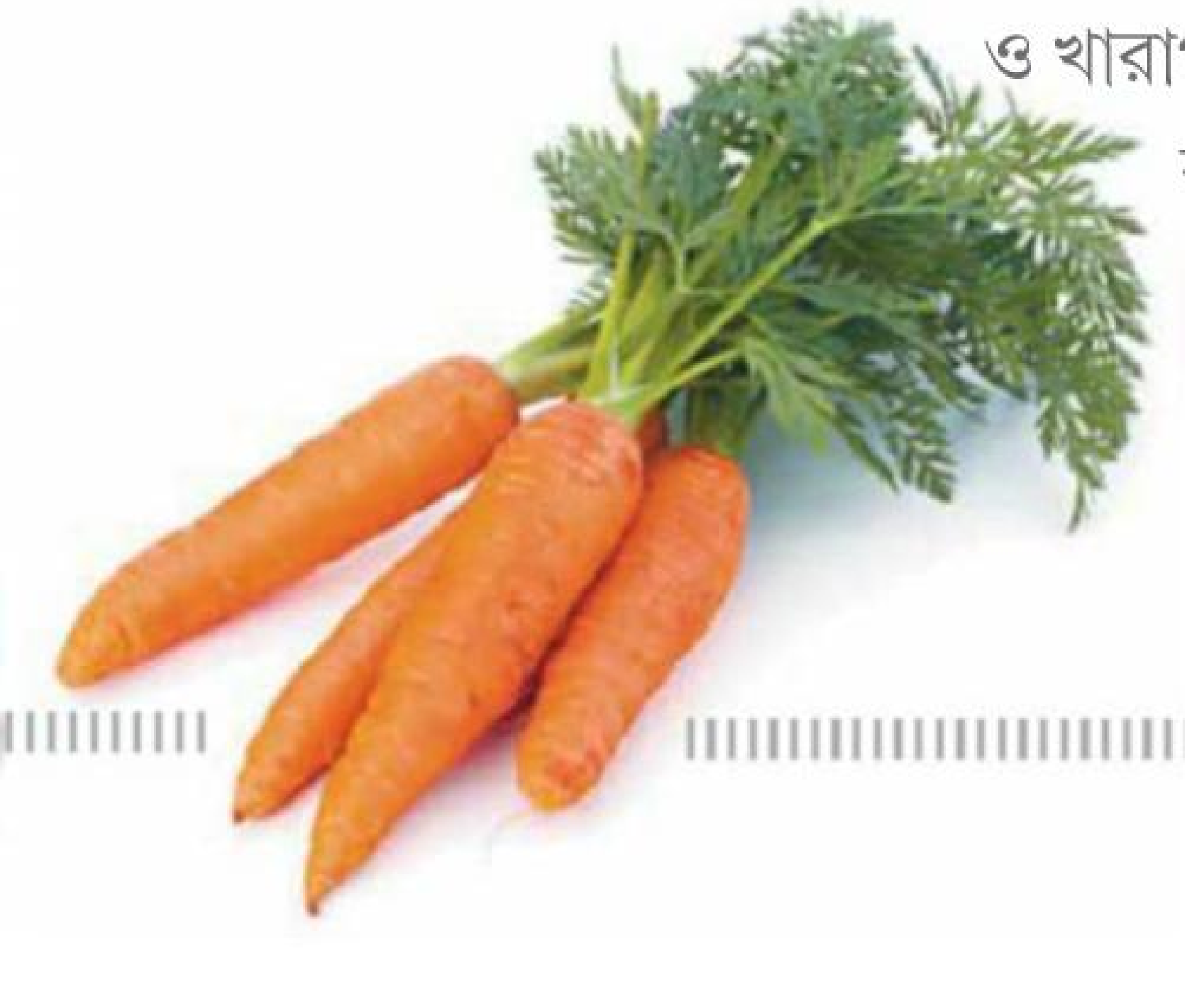
গ্রিলড ফিশ

উপকরণ: মাছের জন্য: ভেটকির ফিলে ২৫০ গ্রাম, পার্সলেপাতা ২ টেবলচামচ, আদাকুচি ১ টেবলচামচ, লেবুর রস ১/৪ কাপ। **গার্লিক বাটার তৈরির জন্য:** সল্টেড বাটার ৫০ গ্রাম, পার্সলেপাতা ১০ গ্রাম, চিকেন ব্রথ ১০০ মিলি, লবঙ্গ ৩-৪টে, চিনি ২ টেবলচামচ, গোলমরিচগুঁড়ো ৫ গ্রাম, লেবুর রস পরিমাণমতো। **স্পিনাচ তৈরির জন্য:** পালংশাক ১৫০ গ্রাম, ক্রিম ৫০ গ্রাম, দুধ পরিমাণমতো, গোলমরিচ ২ গ্রাম, পেঁয়াজ ২০ গ্রাম, আদা ১৫ গ্রাম, নুন স্বাদমতো। হার্ব রাইস তৈরির জন্য: সেদ্ধভাত ৮০ গ্রাম, পার্সলেপাতা ১০ গ্রাম, গোলমরিচ ১ চা-চামচ, পেঁয়াজ ২০ গ্রাম, আদা ১৫ গ্রাম, মাখন ৩০ গ্রাম, নুন স্বাদমতো।
প্রণালী: গ্রিল্‌ড ফিশ তৈরির জন্য একটি পাত্রে গোলমরিচগুঁড়ো, নুন, লেবুর রস সহযোগে কেটে রাখা মাছের ফিলে মাখিয়ে রাখুন। একটি প্যান গরম করে ফিলেগুলির দু'দিক লাল ও মুচমুচে করে ভাজুন। সস তৈরির জন্য একটি প্যানে কয়েকটা লবঙ্গ দিন। হালকা ভেজে মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিন। অন্য একটি প্যানে মাখন ও আদাকুচি দিয়ে, হালকা আঁচে গরম করুন। মাখন গলে এলে তাতে গুঁড়িয়ে রাখা লবঙ্গ, চিনি, গোলমরিচগুঁড়ো ও নুন দিয়ে সুগন্ধ না বেরোনো পর্যন্ত নাড়তে থাকুন। স্পিনাচ তৈরির জন্য একটি পাত্রে নুনজল গরম করে তাতে পালংশাক ১ মিনিট মতো ভিজিয়ে রাখুন। প্যানে কম আঁচে মাখন, পেঁয়াজ, আদা, গোলমরিচ ও নুন নাড়াচাড়া করুন। ক্রিম, দুধ দিন ও নাড়তে থাকুন। তৈরি হয়ে এলে সেদ্ধ করে রাখা পালংশাক দিয়ে দিন। একটি প্যানে অলিভ অয়েল গরম করুন। সেদ্ধ করে রাখা ভাত, পার্সলেপাতা ও অন্যান্য সবজি বার-দু'য়েক টস করুন। শেষে থাইম যোগ করে রান্নাটি সম্পূর্ণ করুন। সমস্ত পদ একটি প্ল্যাটারে সাজিয়ে হার্ব রাইসের সঙ্গে পরিবেশন করুন।


গ্রিলড ফিশ

পুজোয় তবে আর চিন্তা কী? সকাল হোক বা সন্ধে, ডে-আউটিং হোক বা হোলনাইট, খাবারপাতে হোক স্বাদের বিস্ফোরণ!

যোগাযোগ: ৭৩৮৪৯৮৬৩০১



গাজর রক্তচাপ কমাতে ও খারাপ কোলেস্টরল কমাতে সাহায্য করে। স্কিন ক্যানসার উপশমেও উপকারী।



ইন্দো-ওয়েস্টার্নে পুজোর সাজ

উৎসবের সাজে চাই অভিনবত্ব। ওয়েস্টার্ন পোশাকে এথ,নিক প্রিন্ট, আবার কখনও স্টাইলিশ কাটে সুতির পোশাক। এমনই কিছু ইন্দো-ওয়েস্টার্ন সাজের এক্সক্লুসিভ ফ্যাশন ফাইল রইল 'সানন্দা'-র পাতায়।



(বাঁদিকের পাতা)
লাল প্রিন্টেড কটন হাফ শার্ট, সঙ্গে ক্যাজুয়াল ট্রাউজ়ার্সে স্মার্ট লুক।

শার্ট: প্রথা
ফোন: ৯৮৩১২৬৬৬০০

পুজোয় এবার ফ্যাশন ট্রেন্ডে ইন ধুতি। সি গ্রিন রঙের ধুতির সঙ্গে নীল টপ। সঙ্গে রুপোর গয়না।

ধুতি: ওই-শে
ফোন: ৮২৪০৫১৯৮৫২
টপ: অরণ্য
ফোন: ৯৮৩১০৩৯৮২২



পুজোর সাজে ইন
ফ্যাশনেবল ইন্দো-
ওয়েস্টার্ন কটন
ড্রেস। স্টাইলিশ ও
আরামদায়ক।

পোশাক: ODE by
Oindrila
বিডি৭৮, সেক্টর ১,
সল্টলেক, **ফোন:**
৯০০২০১৫৪০৬



ছেলেদের পোশাকে এবার প্রিন্টেড প্যাটার্ন ইন। হলুদ প্রিন্টেড হাফ শার্ট। সঙ্গে কালো প্যান্টস।

পোশাক: প্রথা

মডেল: অর্পিতা, তনুশ্রী, শুভঙ্কর, শাদমন
মেক-আপ ও হেয়ার: সায়ন্ত ঢালি
ফোন: ৯০৫১৪৪৫২৫৭
স্টাইলিং: প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী
রুপোর গয়না: করিশ্মাজ়
ফোন: ৮৬৯৭১১৩৩৬৭
শুটিং লোকেশন: দ্য স্ট্যাডেল
ওয়েবসাইট: www.thestadel.com
ছবি: সোমনাথ রায়



Inclusivity+

ফ্যাশনেবল পোশাক পরতে গেলেই বুঝি ছিপছিপে কোমর আর তন্বী চেহারা হতে হবে? মোটেও না! ইনক্লুসিভ ফ্যাশনের যুগে এসব বস্তাপচা ধারণা পিছনে ফেলে আসার সময়। হ্যাঁ, প্লাস সাইজ় মানুষদের পোশাক-নিয়ম নিয়ে ট্যাবু আছে নিশ্চয়ই, তবে তা ভাঙছে দিনে দিনে।



(বাঁদিকের পাতা)
পেস্তারঙা নি লেংথ স্কার্টের সঙ্গে ফ্লোরাল প্রিন্টেড ঢিলেঢালা টপ।
পোশাক: অরণ্য,
ফোন: ৯৮৩১০৩৯৮২২

পেশায় শেফ, কিন্তু নিজের ইচ্ছেয় সাজতে-গুজতে ভালবাসেন রাহুল অরোরা। হলুদ শর্ট পাঞ্জাবি আর হলুদ পাড়ের সাদা ধুতি পুজোয় পছন্দের সাজ।



আইটি প্রফেশনাল ও অন্ত্রপ্রনর নীলাঞ্জনা বিশ্বাস করেন কমফর্ট কোশেন্টে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে লং গামছা ড্রেস, ইউনিক হেমলাইন আর পাফড স্লিভস।

পোশাক: লেবেল থ্রেডবাবা
ফোন: ৯৮৭৪৮৭৪৭৮৭



ইয়ং অ্যান্ড হ্যাপেনিং প্রজন্মের জন্য এক্সপেরিমেন্টাল প্রিন্ট। মিড লেংথ নিউজ়পেপার প্রিন্টের সঙ্গে হালকা মেক-আপ।
পোশাক: XL Lence,
ফোন: ৯৮৩১৬৬৪৩৪০



প্লে উইথ প্রিন্টস। পুজোর হালকা মুডের সঙ্গে মানানসই কোয়ার্কি প্রিন্টেড শার্ট আর ডেনিমের সিম্পল কম্বিনেশন।



টি-শার্ট আর
ডেনিমের সঙ্গে
লম্বা গামছা শ্রাগ...
স্টাইলিশ লুক
পেতে আর কী-ই
বা চাই!
পোশাক: লেবেল
গ্রেডবাবা



মাল্টিকালার্ড কুর্তা আর
ঢিলেঢালা ট্রাউজ়ার্স।
নিজের ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে
তুলতে রং নিয়ে একটু
সাহসী তো হওয়াই যায়...



গোলগাল চেহারাতেও অনায়াসে ক্যারি করতে পারেন এক্সপেরিমেন্টাল কাট। অ্যাঙ্কল লেংথ ড্রেসে ইন-বিল্ট শ্রাগ। তরুণী স্বস্তিকার স্টাইল মন্ত্র এমনই।
পোশাক: XL Lence



পুজোর জন্য মাস্ট
ট্র্যাডিশনাল সাজ।
লাল ধুতি, কালো
পাঞ্জাবি আর
লাল চাদর...সঙ্গে
এথনিক জুতো।
সাজ সম্পূর্ণ।



বোল্ড কালার আর অ্যাসিমেট্রিক প্যাটার্ন। দুয়ের জম্পেশ কম্বিনেশনে নজরকাড়া সাজ।
পোশাক: BYYB
ফোন: ৯৮২৩৯৫৮৯৪০

মেক-আপ ও হেয়ার: সায়ন্ত ঢালি
ফোন: ৯০৫১৪৪৫২৫৭
স্টাইলিং: প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী
রুপোর গয়না: করিশ্মাজ়
ফোন: ৮৬৯৭১১৩৩৬৭
শুটিং লোকেশন: দ্য স্ট্যাডেল
ওয়েবসাইট: www.thestadel.com
ছবি: সোমনাথ রায়

এই শুটের ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন QR কোডটি

সানন্দা
পুজোর মেনু



ক্লাব ভর্দে ভিস্তা

উৎসবের মরসুমে চাই ভূরিভোজের মহাআয়োজন। এমনই মহাভোজের সম্ভার নিয়ে এল ক্লাব ভর্দে ভিস্তা। পঞ্চমী থেকে দশমী প্রতিদিন দুপুর একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত থাকবে স্পেশ্যাল বাফে লাঞ্চ। ডিনার মেনু আ লা কার্ত-এও নিতে পারেন। লাঞ্চ মেনুলিস্টে স্টার্টারে থাকবে মোচা নারকেল চপ, ভুট্টার কাটলেট, বকফুলের বড়া, ফিশ ফিঙ্গার কবিরাজি, মুরগি কাঁচা আমের পাতুরি-সহ আরও অনেক কিছু। মেন কোর্সে শুক্তো থেকে শুরু করে ভুনা মাটন, ফিশ পাতুরি সবই পাবেন। শেষপাত আলো করে থাকবে শক্তিগড়ের ল্যাংচা থেকে মন্টে কার্লো। সান্ধ্য অনুষ্ঠানে থাকবে ধুনুচি নাচের আয়োজনও। লাঞ্চে প্রত্যেকের খরচ ৯৫০টাকা (ট্যাক্স ছাড়া)।

পুজোয় ভোজবাজি

পুজো আর পেটপুজো প্রায় সকলের জীবনেই সমার্থক। পুজোর মরসুমে তাই রেস্তরাঁ-হোটেল আলো করে থাকে হরেক স্বাদের স্পেশ্যাল মেনু। এবার কোথায় কী স্পেশ্যাল, সন্ধান দিল সানন্দা।

বাবু কালচার

দক্ষিণ কলকাতার এই রেস্তরাঁয় বাঙালিয়ানার স্বাদে মজতে আসেন অনেকেই। ষষ্ঠী থেকে দশমী অবধি এঁরা আয়োজন করেছেন পুজো স্পেশ্যাল মেনু। গন্ধরাজ ঘোল, স্যালাড, ফিশ ফ্রাই, ঠাকুরবাড়ির শুক্তো, মাছের মাথা দিয়ে মুগডাল, বাসন্তী পোলাও, সর্ষে নারকেল চিংড়ি, ঢাকাই সর্ষে ইলিশ, কাঁচালঙ্কা মাংস-সহ একাধিক পদ রয়েছে মেনুতে। অন্যান্য দিনগুলোয় চেখে দেখতে পারেন চিংড়ি ভুনা, ভাপা ইলিশ, মাটন কারি, কাজু কিশমিশ পোলাও, চিংড়ির মালাইকারি, পদ্মকুঁড়িবাটা ইলিশ, কালো ভুনা মাংস ইত্যাদি। ১ থেকে ৫ অক্টোবর পাবেন এই পুজো স্পেশ্যাল মেনু।





দ্য ভিলেজ, ইকো হাব

পুজোয় প্রাণভরে পেটপুজোর আয়োজন করল দ্য ভিলেজ, ইকো হাব। থাকবে ‘শারদীয়ার মহাভই’। পঞ্চমী থেকে দশমীতে থাকবে স্পেশ্যাল লাঞ্চ বাফে। বাফের সময় দুপুর ১২.৩০ থেকে দুপুর ৩.৩০ পর্যন্ত। এখানে স্টার্টার মেনুতে আছে ঠাকুরবাড়ির কাটলেট, কুমড়ো ফুলের ফুলুরি, নর্থ কলকাতার ফিশ ফিঙ্গার, মুরগির মাংসের কাটলেট, গন্ধরাজ মুরগি ইত্যাদি। মেন কোর্সে শুক্তো থেকে লেক কালীবাড়ির আলুর দম, কাঁচকলার কোপ্তা, পোস্ত মুরগি, পাবদা তেল বড়ির ঝোল ইত্যাদি। শেষপাতে ছানার জিলিপি, মন্টে কার্লো ইত্যাদি। সন্ধ্যায় থাকবে ঢাকি ও ধুনুচি নাচের আয়োজন। খরচ মাথা পিছু ৯৪৯ টাকা (ট্যাক্স ছাড়া)।



ব্ল্যাক ব্রিক কাফে

ব্ল্যাক ব্রিক কাফেতে মিলবে পুজো স্পেশ্যাল সিজ়লার মেনু। হরেক নাম ও স্বাদের আমিষ-নিরামিষ সিজ়লার, যেমন ইতালিয়ান জব, গ্রিল্ড মুর্গ বং পনির মাখনওয়ালা, দ্য মেক্সিকান, ব্যাঙ্কক অন আ উয়োক-এর মতো সিজ়লার পাবেন এখানে। রয়েছে ক্লাসিক চেলো কাবাব সিজ়লারও। দুপুর ১২টা থেকে রাত ২টোর মধ্যে যে কোনও সময় পৌঁছে যেতে পারেন পুজো স্পেশ্যাল সিজ়লার মেনুর স্বাদ নিতে।

অক্টা

এদের পুজো স্পেশ্যাল মেনুতে পাবেন স্মোকড স্যামন সুশি রোল, ক্রিস্প প্রন সুশি রোল, অ্যাসপারাগাস টেম্পুরা সুশি রোল, মিক্সড ভেজিটেবল পট স্টিকার উইথ অক্টা ভিনেগ্রেত, ব্যাঙ্কক ভেটকি ফ্রাই প্রভৃতি পদের সম্ভার। ১ অক্টোবর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত থাকছে পুজো স্পেশ্যাল মেনু।



গ্লুক দ্য স্কাই লাউঞ্জ

বাঙালি লাঞ্চ বাফে থেকে আ লা কার্ত মেনু...সব পাবেন রাজারহাটের এই ওপেন এয়ার রেস্তরাঁয়। গোলমরিচ দই শরবত, আমপান্না, কালোজিরে পনির টিক্কা, ছানা মটরশুঁটির চপ, কাসুন্দি ফিশ টিক্কা, গন্ধরাজ মুরগি ফ্রাই, পোড়া টোম্যাটো চাটনি, দই কাতলা, মরিচ মাংস, বেকড মিহিদানা, গোবিন্দভোগ চালের পায়েস ইত্যাদি বাঙালি ভোজের অন্যতম। আ লা কার্ত মেনুতে রয়েছে পেস্তো আরাঞ্চিনি, চিংড়ি মাছের সালমি, পেরি পেরি ড্রামস্টিক, ইংলিশ চিকেন টিক্কা ইত্যাদি। দু'জনের জন্য খাবারের খরচ যথাক্রমে ১৯৯৯ ও ২৫০০ (ট্যাক্স ছাড়া)।



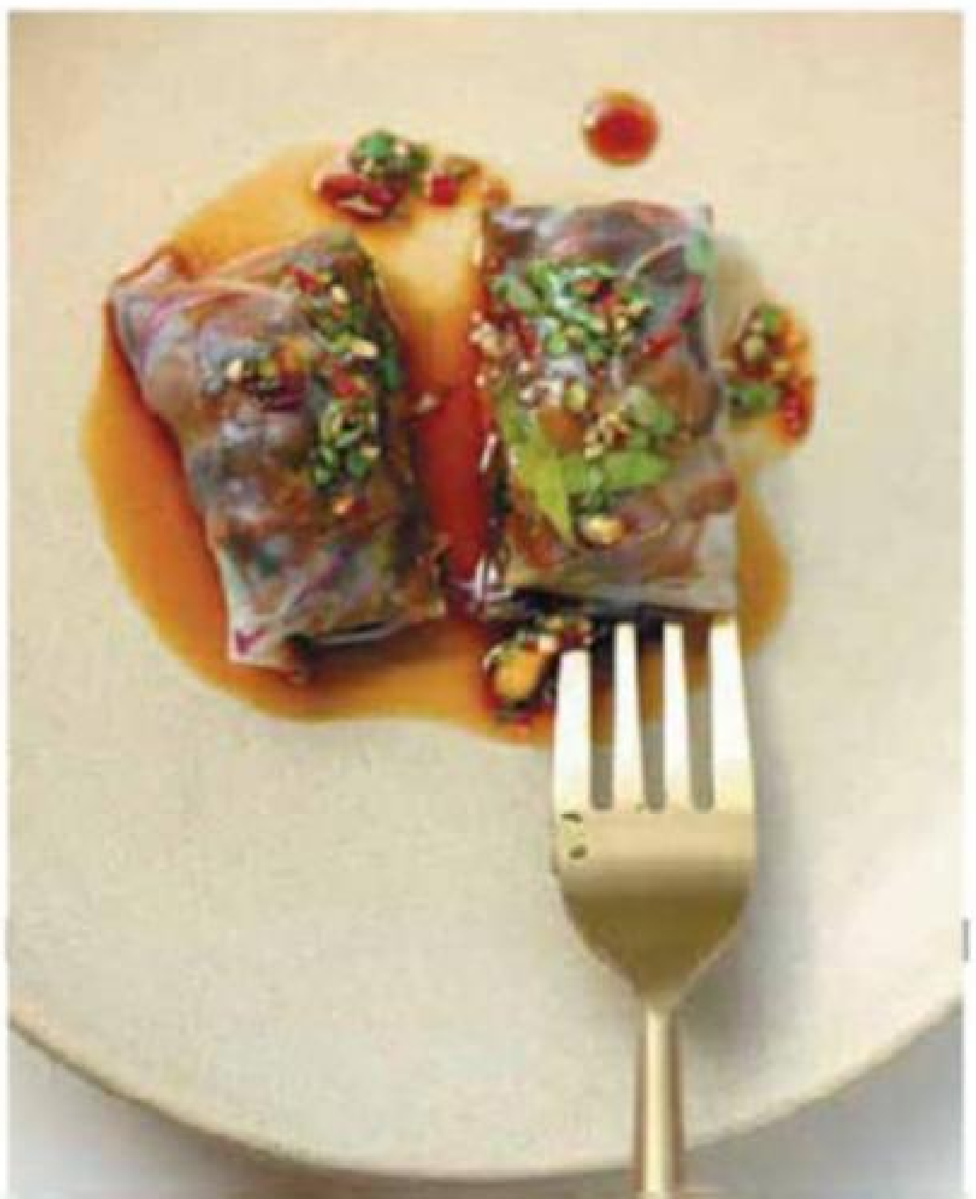
বার্মা বার্মা

পুজোয় এঁরা আয়োজন করেছেন ট্র্যাডিশনাল বার্মিজ় ভোজেরই। কাচিন ড্রায়েড মাস্টার্ড সুপ, লোটাস রুট স্যালাড, স্টিম্ড রাইস উইথ পেপার পার্সেলের মতো পদ নিরামিষ হলেও স্বাদে পাল্লা দেবে আমিষের সঙ্গে। সোম থেকে শুক্র দুপুর ১২.৩০টা থেকে বিকেল ৪টে এবং সন্ধে ৬.৩০টা থেকে রাত ১০.৩০টা পাবেন এই মেনু। সপ্তাহান্তের ভোজ শুরু দুপুর ১২টা থেকে, বাকি সময়সীমা একই।



অফবিট সিসিইউ

ওপেন এয়ার রেস্তরাঁগুলোর মধ্যে বেশ জনপ্রিয় এই রেস্তরাঁটি। পুজো স্পেশ্যাল লাঞ্চ ও ডিনার বাফেতে রয়েছে নানা স্বাদের সুখাদ্য। সপ্তমী ও অষ্টমীর স্পেশ্যাল বাফের আকর্ষণ কলকাতা ফিশ ফ্রাই, লাহোরি মুর্গ টিক্কা, রোস্টেড চিকেন স্যালাড, ঝিঙে আলু পোস্ত, কচিপাঁঠার ঝোল ইত্যাদি। সপ্তমী ও দশমীর স্পেশ্যাল বাফেতে থাকছে গুড় আর লেবুর শ রবত, প্যান ফ্রায়েড চিলি ফিশ, রাঙা আলু বেদানা চাট, ঢাকাই পোড়া মাংস ইত্যাদি।





মাঙ্কি বার

পুজো মানেই আড্ডা এবং সঙ্গে মুখ চালানোর নানা জিনিস। সেই আড্ডায় যোগ্য সঙ্গত দিতে মাঙ্কি বার নিয়ে এসেছে রকমারি মুখরুচি। থাকবে মুর্গ অ্যান্ড জোয়ার পকোড়া চাট, মোচার শিক কাবাব, মুরগির কাটলেট, রাঁধুনি মুরগি টিক্কা, কষা মাংস স্লাইডার, মালাই চিংড়ি ফুলুরি, কে অ্যান্ড পি মাছ (কাসুন্দি ও পাঁচফোড়ন দিয়ে ম্যারিনেট করা মাছ) প্রভৃতি নানা স্ন্যাকস। ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত পাবেন পুজোর এই বিশেষ মেনু। দুপুর ১২টা থেকে রাত ১২টার মধ্যে যে কোনও সময়ই চলে যেতে পারেন মাঙ্কি বারে।

স্লাই ফক্স গ্যাস্ট্রো ক্লাব

সেক্টর ফাইভের এই পাবে তরুণ প্রজন্ম ভিড় জমান বরাবর। ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর বিশেষ পুজো মেনু চেখে দেখতে পারেন। তন্দুরি ক্র্যাব, তন্দুরি ল্যাম চপস, বুরাতা মুর্গ মাখানি, বুরিতো বোলস, ফাহিতা থেকে শুরু করে বাটার চিকেন জ্যাকেট পোট্যাটো ও এঁদের সিগনেচার স্টেক খেতে পারেন। চারকোল লেমনগ্রাসের মতো ইউনিক ককটেলও পাবেন এখানে। দু'জনের খরচ মোটামুটি ১৫০০ টাকা মতো।



জে ডব্লু ম্যারিয়ট

৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর অবধি এখানে চলবে দুর্গাপুজা মহাভোজ। সপ্তমী থেকে নবমী অবধি বিশেষ আকর্ষণ গন্ধরাজ ফিশ টিক্কা, পোস্ত মুরগি, মাটন রোগান জোশের মতো পদ। জে ডব্লুউ কিচেনেও থাকছেন মেন কোর্স থেকে ডেসার্ট সব।



ক্লাউড সোশ্যাল রুফটপ লাউঞ্জ

এরা পুজো উপলক্ষে মেনু সাজিয়েছে খাঁটি বাঙালি পদে। পাবেন বাসন্তী পোলাও, গয়না বড়ি, ঝিঙে আলু পোস্ত, পটলের দোরমার পাশাপাশি সয়া চিংড়ি মালাইকারি, ভিগান মাটন কষার মতো পদও। ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবরের মধ্যে চলে যান! সোম থেকে শুক্র ২টো থেকে রাত ১টা এবং সপ্তাহান্তে দুপুর ১২টা থেকে রাত ১টা।





এফিনগাট

২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ অক্টোবর অবধি এখানে পাওয়া যাবে বিশেষ পুজোর মেনু। অন্যতম আকর্ষণ পুজো ভোগ খিচড়ি আরাঞ্চিনি, চায়না টাউন ক্র্যাব কেকস, ম্যাঙ্গো হ্যালাপিনো মুর্গ টিক্কা, হামাস অ্যান্ড শেডার পপারস, পুজো বাড়ি স্পেশ্যাল লুচি ও কষা মাংস, পর্ক রেনডাং কারি, মালয় ফিশ পার্সেল, কোকোনাট রাইস, গন্ধরাজ সেমিফ্রেডো, বেকড পাটিসাপটা ইত্যাদি। দু'জনের খরচ ২০০০টাকা মতো পড়বে।

ব্লু মুজ়

পুজোর মেনুতে থাকছে নানা স্বাদের কুইজ়িন। বাটার গার্লিক চিকেন, গন্ধরাজ ফিশ ফিঙ্গার, পাস্তা আল আলফ্রেডো, চিকেন ললিপপ, গ্রিলড ফিশ উইথ লেমন বাটার সস, বেকড দই, চকোলেট ফিরনি, গুলাব জামুন চিজ় কেক, ব্লু লেগুন-এর স্বাদ নিতে চলে আসতে পারেন মুদিয়ালির কাছে এই রেস্তঁরায়। কাসুন্দি, সরষেবাটা গন্ধরাজ লেবুর জ়েস্ট, রসুন-পার্সলেপাতায় মাখানো ফিশ ফিঙ্গার এখানকার অন্যতম স্পেশ্যালিটি। গ্রিলড ফিশে এঁরা ব্যবহার করেন বাসা, সঙ্গে লেমন বাটার সস। পুজোর দিনগুলোয় সারাদিনই পাবেন এই মেনু।



নুড্‌ল উড্‌ল

পুজোয় স্বাদ নিন ওরিয়েন্টাল খাবারের! নুড্‌ল উড্‌ল-এর পুজো মেনুতে রয়েছে দ্য ওয়াইল্ড পেপার ফিশ, নুড্‌ল উড্‌ল স্পেশ্যাল নুড্‌ল মিক্স (রাইসেও পাবেন), চিলি অয়েস্টার ফিশ, সেজ়ওয়ান পনিরের মতো রকমারি পদ। বিশেষ এই মেনু থাকে ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর, দুপুর ১২টা থেকে রাত ১২টা অবধি।



দ্য সল্ট হাউস

পুজো উপলক্ষে বিশেষ বাফে এনেছে দ্য সল্ট হাউস। থাকছে নাচোজ় অ্যান্ড ঘুগনি চাট, দই ভেটকি, কষা মাংস প্রভৃতি। ১ অক্টোবর থেকে ৫ অক্টোবর, দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৪টে এবং সন্ধে ৭টা থেকে রাত ১১.৩০টা।



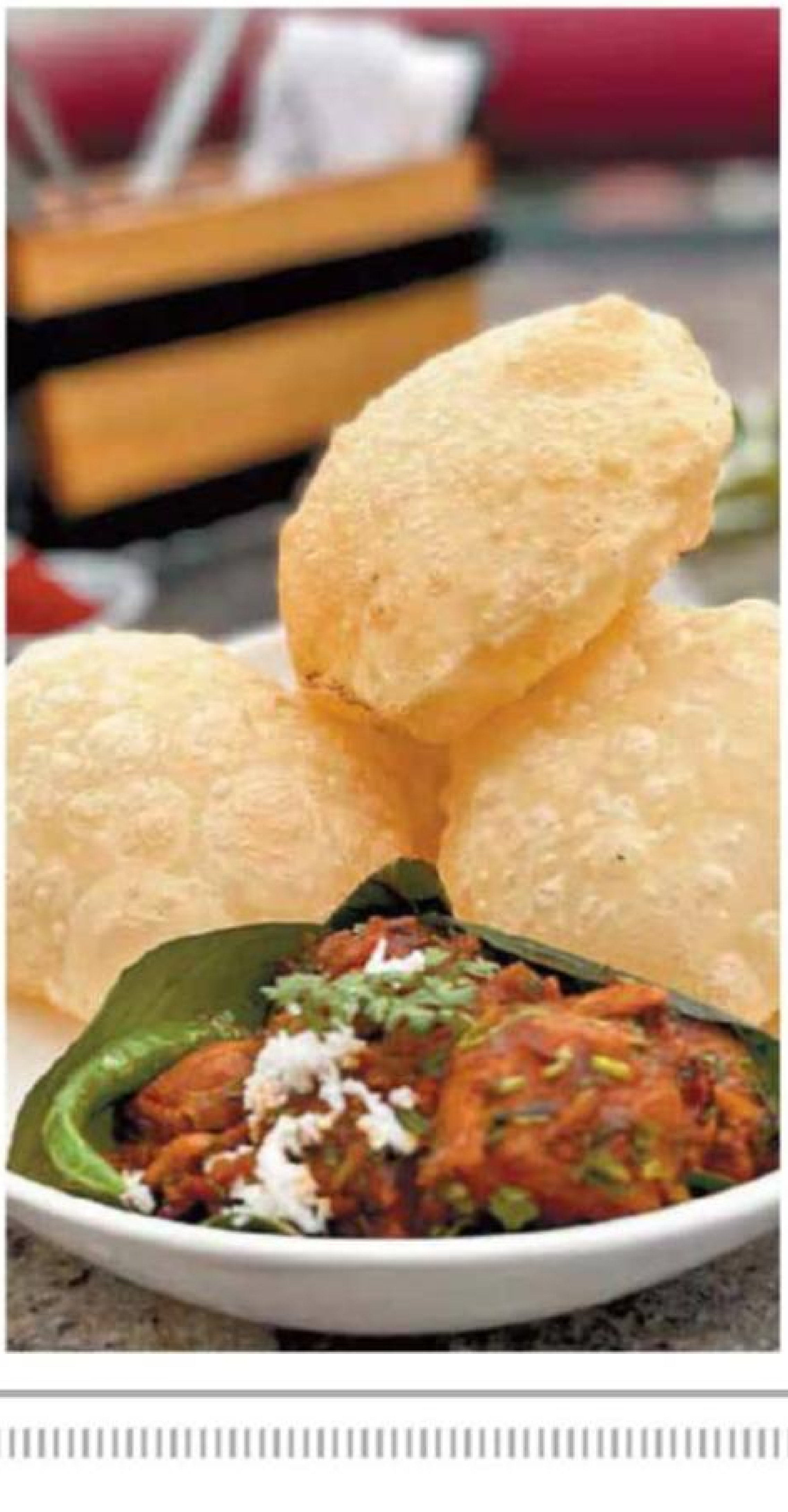
দ্য ওয়েস্টিন কলকাতা



১ থেকে ৫ অক্টোবর প্রতিদিন ১২.৩০ থেকে পাওয়া যাবে বিশেষ পুজোর মেনুর সম্ভার। কলকাতা স্ট্রিট ফুড, লাইভ কাউন্টারস, বাঙালি ভোজ সবকিছু থাকছে এখানে। পুজোর পাঁচদিন 'নোরি'-তে পাবেন এশিয়ান নানা পদ। সম টম স্যালাড, ইন্দোনেশিয়ান রেনবো বাকওয়ান, ক্রিস্পি ফিশ সল্ট অ্যান্ড পেপার ইত্যাদি। '৩২ হেলিপ্যাড লাউঞ্জ'-এ চেখে দেখতে পারেন কষা মাংস, কলকাতা স্টাইল চিকেন বিরিয়ানি, আলু পোস্ত ইত্যাদি। থাকছে টাস্কান বেকড পাস্তা ক্যাসেরোল, মাডপাইয়ের মতো কন্টিনেন্টাল পদও।

এলএমএনকিউ

পুজোয় বাঙালি ভোজের মজাই আলাদা! খাঁটি বাঙালি খাবারেই পুজো স্প্রেড সাজিয়েছে এলএমএনকিউ। থাকছে মোচার মিনি কাটলেট, ঢাকাই পরোটা, গন্ধরাজ ফ্রায়েড চিকেন, কলকাতা স্ট্রিট ফিশফ্রাই, ধনেপাতা দেওয়া কষা আলুর দম, ছানার ডালনা, মাটন ডাকবাংলো, ডাব চিংড়ি, ভাপা দই সহ নানা পদ। বিশেষ এই মেনুর স্বাদ নিতে চলে যেতে পারেন ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবরের মধ্যে যে কোনও দিন। পাবেন দুপুর ১২টা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত।



পাপরিকা গুরমে

বাঙালি প্ল্যাটার তো রয়েছেই এদের পুজো স্প্রেডে। পাশাপাশি বেশ কিছু অন্য ধরনের পদও এবার নিয়ে এসেছে তারা। যেমন বেঙ্গলি টাকো। এ ছাড়াও রয়েছে নানা স্বাদের প্ল্যাটার, পিৎজ়া অ্যান্ড ফোকাশিয়া প্ল্যাটার, স্লাইডার প্ল্যাটার, ব্রাউনি প্ল্যাটার প্রভৃতি। শেষপাতে নিন লোটাস চিজ়কেক। বিশেষ এই মেনু মিলবে ১ অক্টোবর থেকে ৫ অক্টোবর।, দুপুর ১২টা থেকে রাত ২টো অবধি।



করিম্‌স হাতিবাগান

রকমারি মোগলাই খানার সুস্বাদে পুজোর আনন্দ বেড়ে যাক কয়েকগুণ! রয়েছে চিকেন জাহাঙ্গিরি, মাটন রারা মসালা, কলকাতা বিরিয়ানি, চাঁপ, কোর্মা, কষা (চিকেন ও মাটন দুইয়েরই), চিকেন হান্ডি লজ্জিজ়, মাটন বরা প্রভৃতি। পাবেন ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর, দুপুর ১২টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত।





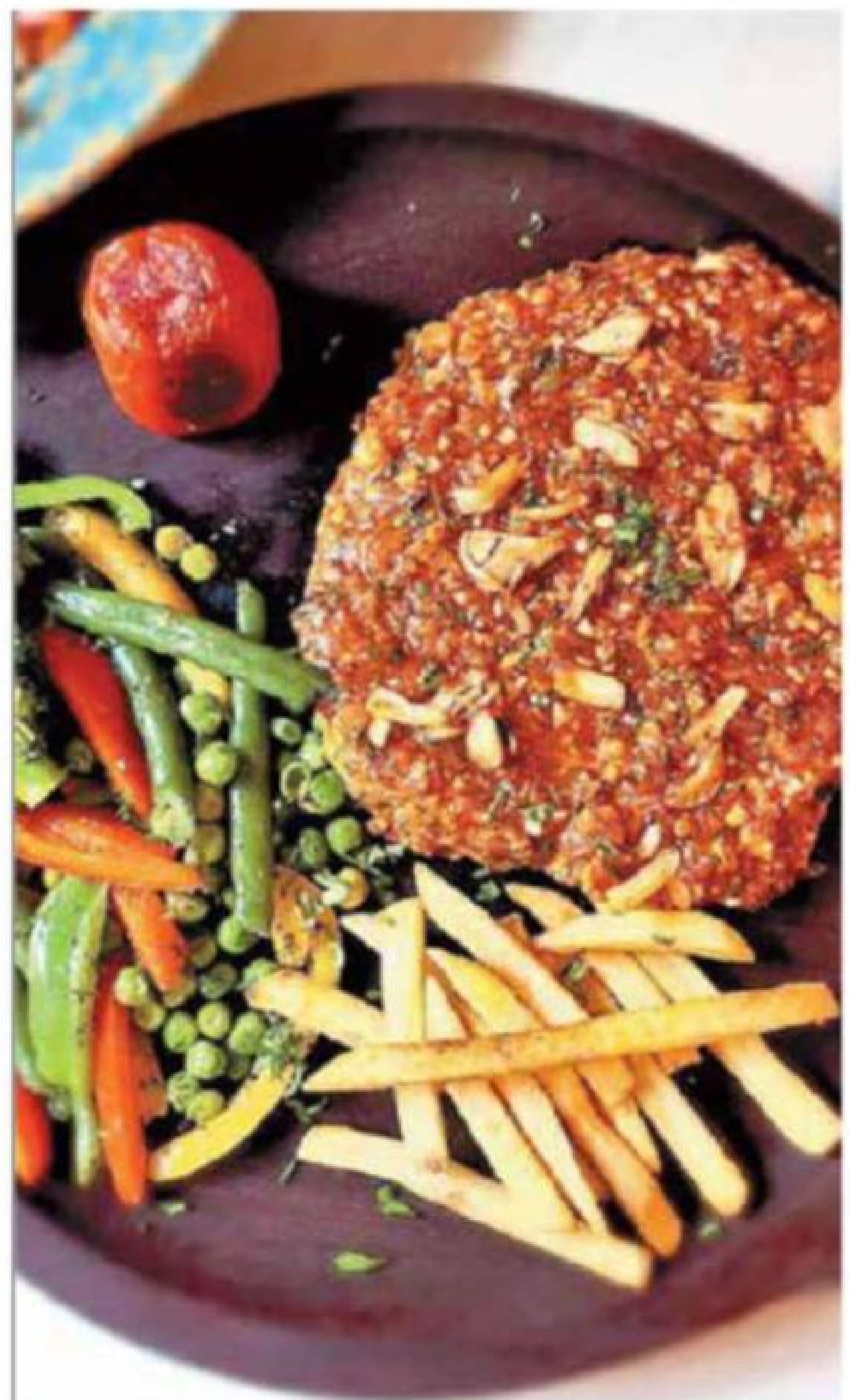
আইবিস

২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর অবধি লাঞ্চ ও ডিনার বাফেতে থাকছে বিশেষ মেনু। ১ অক্টোবর থেকে পাবেন মিডনাইট বাফেও। বাদাম দিয়ে লাল শাক, গন্ধরাজের ঘোল, চিকেন ডাকবাংলো, কষা মাংস, চিংড়ি মালাইকারি, রুই সর্ষে, মিষ্টি ইত্যাদি থাকছে মেনুতে।

ট্রাইব

ট্রাইব-এর পুজো মেনুতে রয়েছে চিকেন উইংস, চিলি লাইম পর্ক, চিকেন মিটবলস উইথ স্প্যাগেতি, গ্রিক গ্রিলড চিজ় স্যান্ডউইচ, গ্রিলড ফিশ উইথ সতেড ভেজিটেবলস প্রভৃতি। পাবেন ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর, সকাল ১১টা থেকে রাত ১০টা অবধি।





কাফে না-রু-মেগ

এদের পুজো স্পেশ্যাল মেনুতে পাবেন গার্লিক চিকেন স্টেক, ফিশ আ-লা-ডায়ানা, মেক্সিকান রাইস, ফ্রেঞ্চ গ্রিল্ড চিকেন স্যালাড ইত্যাদি নানা স্বাদের কন্টিনেন্টাল পদ। এই মেনু থাকছে এক মাস, ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবর অবধি। দুপুর ১২টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে যে কোনও সময় পৌঁছে যেতে পারেন।



হিরণ'স

বাইপাসের উপরে অবস্থিত 'হিরণ'স পাতিসেরি ও বিস্ত্রো'-তেও থাকছে জম্পেশ পুজোর মেনুর সম্ভার। অকালবোধন থালি, মহা শারদ উৎসব থালি, অন্নপূর্ণা মহাভোজ, বিজয়া দশমী থালি ইত্যাদি রয়েছে। বামুন পাড়ার শুক্তো, কষা মাংস, সিজ়লিং চিকেন নাগেটস, প্যাঙ্কো রাব প্রন ইত্যাদিও পাবেন এখানে।



হার্ড রক কাফে

পুজোয় এরা নানা সিগনেচার ডিশেই সাজিয়েছে প্ল্যাটার। থাকছে মেজ়ে প্ল্যাটার, কর্ন মালাই টিক্কি, দ্য কাসুন্দি ভেটকি ফিশ, স্পাইসি চিকেন ড্রামস্টিক, বাটার মালাই কোপ্তা কারি, চিংড়ি মালাইকারি এবং নানা ককটেল। ৩ অক্টোবর এবং ৪ অক্টোবর, রাত ৯টা থেকে পাবেন এই মেনু।



কাফে ড্রিফ্টার

কুং পাও চিকেন, জিঞ্জার অয়েস্টার ফিশ, লাট মেই কাইয়ের মতো পদ রয়েছে এদের পুজো মেনুতে। পাবেন ২৬ সেপ্টেম্ববর থেকে ৫ অক্টোবর। লেক রোড আউটলেটে সকাল ৮টা থেকে রাত ১১টা এবং বাঘাযতীন কলোনিতে সকাল ১১টা থেকে রাত ১১টা।



দি আইরিশ ব্রিউয়ারি

এই কাফের পুজো মেনুতে খাবারের পাশাপাশি পাবেন রকমারি স্বাদের পানীয়ও। রয়েছে সল্টেড ক্যারামেল আইসড লাতে, প্যাশন অ্যান্ড কিউয়ি বাজ়, সিট্রাস কোল্ড ব্রিউ, পেরি পেরি প্রন, বারবিকিউ চিকেন সসেজ, টেন্ডার ফ্রায়েড চিকেন, কাজুন স্পাইসড চিকেন, স্ট্রোগোনফ এবং আরও অনেক কিছু। এগ বেনেডিক্ট বা ইংলিশ মাফিনের মতো ব্রেকফাস্ট আইটেমও পাবেন। ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবরের মধ্যে চলে যেতে পারেন এদের নাগেরবাজার অথবা রাজা বসন্ত রায় রোডের আউটলেটে। সকাল ৭.৪০টা থেকে রাত ৩.৩০টের মধ্যে।

পঞ্চমের আড্ডায়

পুজোয় বাঙালি খানার পাশাপাশি একটু অন্য স্বাদের খাবারদাবারও ট্রাই করতে মন চায় বইকী! পঞ্চমের আড্ডায়-এর পুজো স্পেশ্যাল স্প্রেডে পাবেন শ্রিম্প টেম্পুরা, মাটন শেফার্ডস পাই, চিকেন রুলাড, বেক্‌ড ক্র্যাব, চিকেন কর্ডন ব্লিউ, হার্ব রাইস উইথ সি-ফুডের মতো কন্টিনেন্টাল পদের সম্ভার। কাছের মানুষদের সঙ্গে আড্ডা আর খাওয়াদাওয়ায় সুন্দর সময় কাটাতে চলে যেতেই পারেন! পুজোর বিশেষ মেনু পাবেন ১ অক্টোবর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত।



ট্রিঙ্কাজ়

ট্রিঙ্কাজ়-এর পুজো মেনুতে রয়েছে ক্র্যাব অ্যান্ড চিজ় ওয়ান্টন, প্যান-ফ্রায়েড বেসিল প্রন, বাটার পেপার গার্লিক চিকেন, ব্রকোলি অ্যান্ড ওয়াটার চেস্টনাট ড্রাগন স্টাইল ইত্যাদি নানা স্বাদের পদ। পুজোর ক'দিন দুপুর ১২টা থেকে রাত ১১.৩০র মধ্যে চলে যান!



ট্যামারিন্ড

ট্যামারিন্ড-এর পুজো মেনুতে পাবেন দম গোশ্‌ত বিরিয়ানি, হায়দরাবাদি গ্রিন মুর্গ কারি, মাটন চাপলি কাবাব, মাটন পেপার ফ্রাই, মালাবার প্রন এবং আরও অনেক কিছু। ১ অক্টোবর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত থাকছে বিশেষ এই মেনু।





বোহো কাফে

বোহো দ্য স্কাই কাফে এবং বোহো দ্য গ্রাউন্ড কাফের পুজো মেনুতে পাবেন হালকা, সুস্বাদু নানা ধরনের পদ। থাকছে গ্রিল্ড পোলো সিজ়ার স্যালাড, দ্য কর্ন বিন কেসাদিয়া, উইংগস অফ ফায়ার, গ্রিল্ড চিকেন পানিনি ব্রেড, বারবিকিউ চিকেন পিৎজ়া প্রভৃতি মুখরোচক খাবার। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর পর্যন্ত থাকছে পুজো-ভোজের এই আয়োজন। দুপুর ১২টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত যে কোনও সময়ে পৌঁছে যান বোহো দ্য স্কাই কাফে অথবা বোহো দ্য গ্রাউন্ড কাফেতে।

এমকিউএক্সটি

শরৎ বোস রোডের কাছের এই রেস্তরাঁয় পুজোর দিনগুলোয় পাবেন ভেটকি ক্রাম ফ্রাই, বাটারফ্লাই প্রন, প্রন বার্গার, চিকেন টিক্কা মসালা বোল, নিউইয়র্ক স্টাইল বিরিয়ানি ইত্যাদি। এছাড়াও পাবেন চিজ় অ্যান্ড হ্যালাপিনো ক্রোকে, লেবানিজ় প্ল্যাটার, রিফ্রায়েড বিনস ফাহিতা-সহ নানা স্বাদের খাবার। মোটামুটি ৪০০ টাকা থেকে শুরু ডিশের দাম।



কাফে ওয়াটারলু

২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর অবধি সারাদিনই পাবেন পুজোর বিশেষ মেনু। চিজ় কর্ন ক্রোকে, চিকেন ৬৫, সিলান্ট্রো ফিশ, চিজ়ি পনির টিক্কা, চিকেন হাক্কা নুডল, চিলি অয়েস্টার বেসিল রাইস, হট গার্লিক চিকেন, গ্রিলড সিজ়লার ইত্যাদি এঁদের স্পেশ্যালিটি। ড্রিংক ছাড়া দু'জনের খরচ ৭৫০ টাকা মতো।



বাবুমশাই

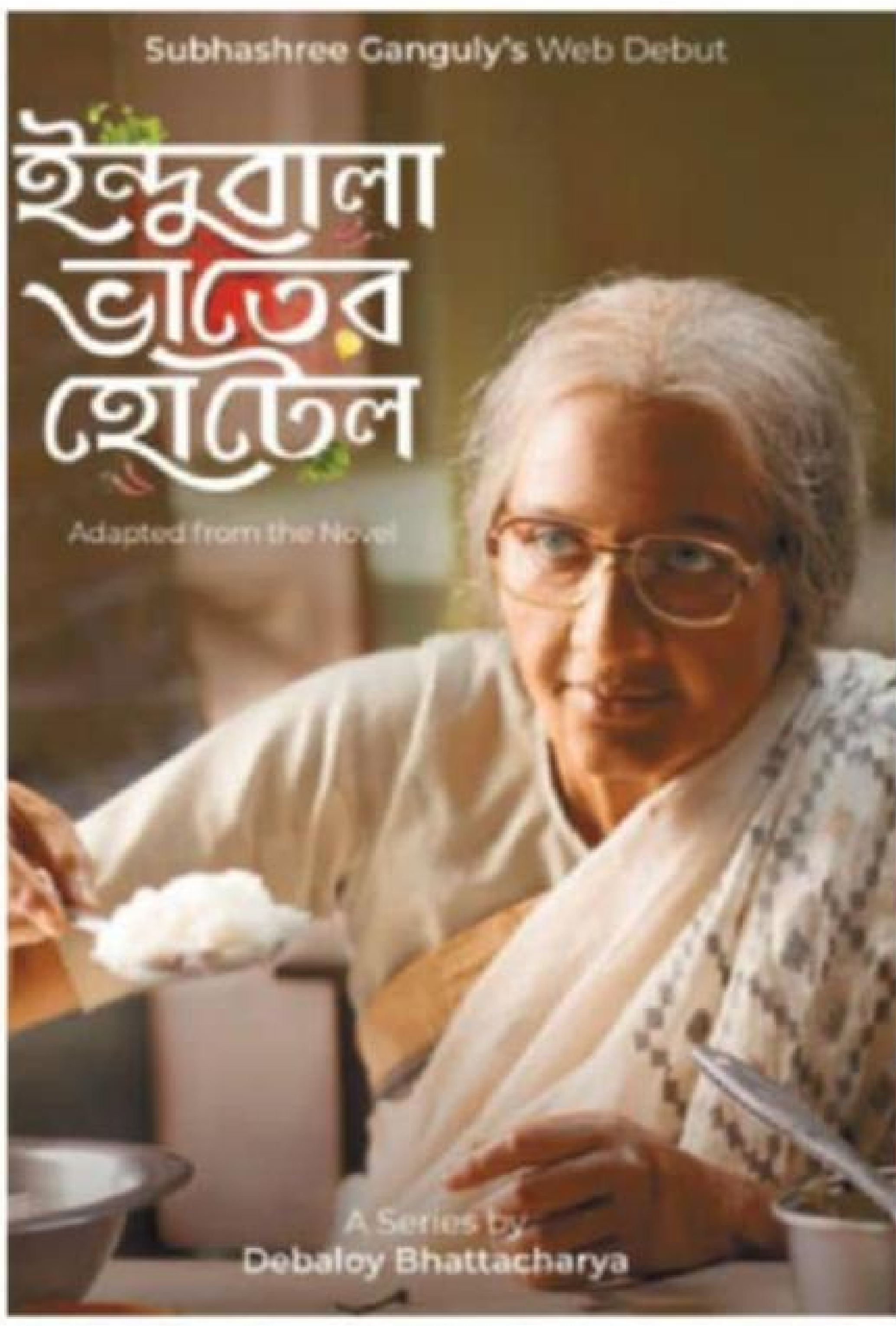
এদের পুজো মেনুতে ভরপুর বাঙালিয়ানা! থাকছে মাটন ডিমের ডেভিল, মোগলাই পরোটা, চিকেন ডাকবাংলো, চিকেন কষা রোলের মতো নস্ট্যালজিক স্বাদের পদ। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর, দুপুর ১২টা থেকে রাত ১২টা পাবেন এই মেনু।

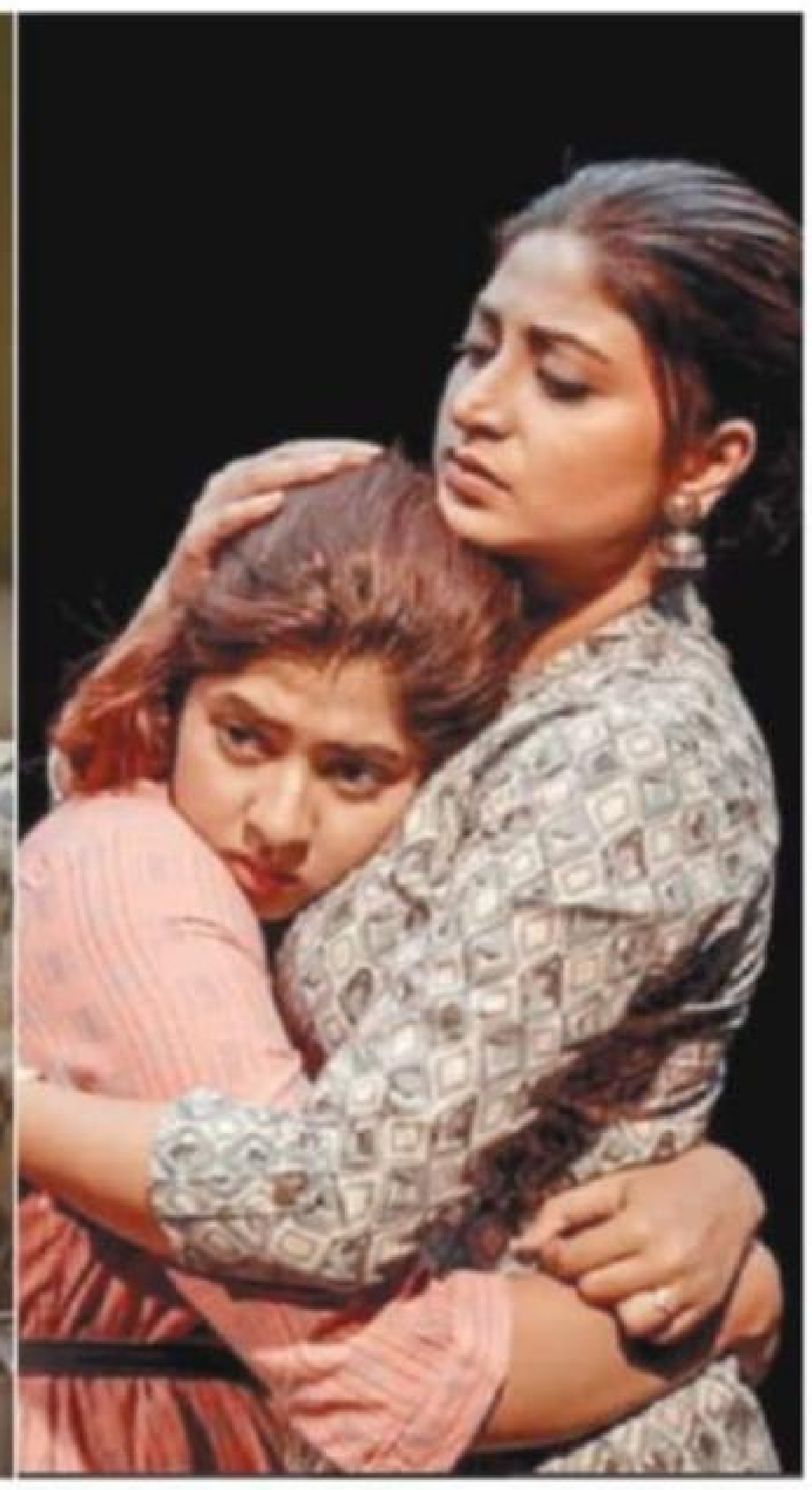


একগুচ্ছ নতুন ওয়েব কনটেন্ট

একগুচ্ছ নতুন প্রজেক্টের ঘোষণা করল ‘হইচই’। নানা স্বাদের কনটেন্ট নিয়ে হাজির তাদের সিজ়ন সিক্স! এই প্রথম ওয়েবে ডেবিউ করতে চলেছেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। দেবালয় ভট্টাচার্যের পরিচালনায় ‘ইন্দুবালা ভাতের হোটেল’-এ একজন বৃদ্ধার চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি। এছাড়াও এমন বেশ কিছু কনটেন্ট আসতে চলেছে যার কেন্দ্রীয় চরিত্রে মহিলা। ‘ইন্দু সিজ়ন টু’-তে রয়েছেন ইশা সাহা, ক্রিয়েটর সাহানা দত্ত। সন্দীপ্তা সেন ও দিতিপ্রিয়া রায় অভিনীত ‘বোধন’, সোহিনী সরকার, রাজনন্দিনী পালের ‘সম্পূর্ণা’, মধুমিতা সরকারের ‘জাতিস্মর’ রয়েছে তালিকায়। আসছে ‘কারাগার ২’, ‘মহানগর: অন্তিম পর্ব’, ‘বোধ’, ‘কাইজ়ার ২’-এর মতো বাংলাদেশের জনপ্রিয় সিরিজ়ের সিকুয়েল। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য ‘একেনবাবু ৬’ (অনির্বাণ চক্রবর্তী), ‘গোরা ২’ (ঋত্বিক চক্রবর্তী), ‘ফেলুদা: ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর’ (টোটা রায়চৌধুরী), ‘ব্যোমকেশ ও পিজ়্জরাপোল’ (অনির্বাণ ভট্টাচার্য), অরিন্দম শীলের ‘ত্রৈলোক্য’ ইত্যাদি।







অ্যান্থোলজি ছবিতে অর্ণ-সৌরসেনী

তিনটি ভিন্ন সময়ের গল্প নিয়ে তৈরি হচ্ছে ‘সেদিন কুয়াশা ছিল’। অ্যান্থোলজি ফিল্মের একটি গল্পের মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন সৌরসেনী মৈত্র ও অর্ণ মুখোপাধ্যায়। গল্পটি প্রাক স্বাধীনতা পর্যায়ের। অর্ণ ছবিতে এক বিপ্লবীর ভূমিকায়। অন্য এক বিপ্লবী সবুজ বর্ধন, তাঁর স্ত্রীর চরিত্রে সৌরসেনী। এই তিনজনের টানাপড়েনের গল্প বুনেছেন পরিচালক অর্ণব মিদ্যা। এছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন উপাবেলা মুখোপাধ্যায়, সায়ন্তন ঘোষাল প্রমুখ। ছবির অন্য দুটি গল্পেও রয়েছেন একঝাঁক নবীন-প্রবীণ নামী অভিনেতারা। একটি গল্পে দীর্ঘদিন পরে পরদায় দেখা যাবে পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও লিলি চক্রবর্তীকে। তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন জিতু কমল। অন্য একটি গল্প আবার তিন বন্ধুর সম্পর্ককে ঘিরে। রয়েছেন দেবশংকর হালদার, খরাজ মুখোপাধ্যায়, জয় সেনগুপ্ত। সংগীত পরিচালনার দায়িত্বে রণজয় ভট্টাচার্য। পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ চলছে ছবির।

ফকিরা-র নতুন অ্যালবাম

শুরুতে মোটেও তাঁরা ভাবেননি যে শুধু লোকগানই করবেন! কিন্তু ২০১১ সালে তিমির বিশ্বাস আসানসোলের এক অনুষ্ঠানে সিদ্ধান্ত নেন, লোকগানেই মনোনিবেশ করবেন তাঁরা। তারপর থেকেই লোকসংগীতের সঙ্গে সমার্থক হয়ে ওঠে ‘ফকিরা’ ব্যান্ড। সম্প্রতি মুক্তি পেল তাঁদের দ্বিতীয় অ্যালবাম ‘হরে কৃষ্ণ’। আটটি লোকগান নিয়ে এই অ্যালবাম, যার মধ্যে কিছু গান অবশ্যই মানুষ শুনেছেন আবার কিছু গান শোনা যায় না বললেই চলে। অ্যালবামের গানগুলোর রেকর্ডিং হয়ে গিয়েছিল ২০১৯-এই। কিন্তু কোভিডের কারণে থমকে যায় গানের মুক্তি। রেকর্ডিং হয়েছিল মুম্বইয়ের যশরাজ স্টুডিওয়। মিক্সিং মাস্টারের কাজও হয়েছিল মুম্বইতেই। তিমিরের কথায়, ‘‘দ্বিতীয় অ্যালবামের কাজ করতে করতেই মাথায় আসে একসঙ্গে আটটি গানকে একটা ভিডিওতে রাখার কথা। ভারতের অন্যতম সেরা স্টুডিওতে রেকর্ডিং করেছি, ভাল অডিও কোয়ালিটির জন্য।’’





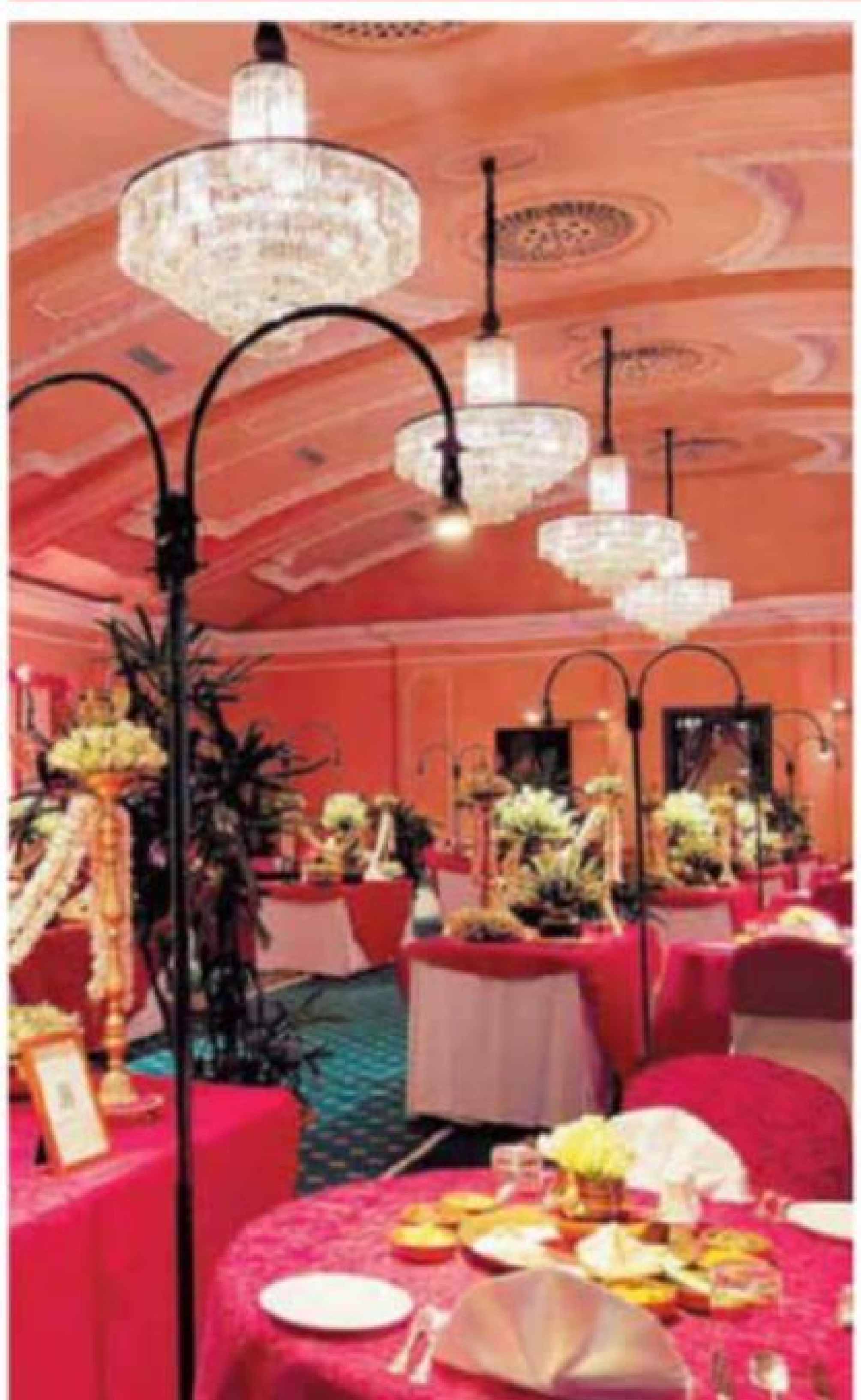
পুজোর গ্র্যান্ড আয়োজন

রাজকীয়ভাবে পুজো কাটাতে 'দি ওবেরয় গ্র্যান্ড, কলকাতা'-র বিশেষ আয়োজন।



দেবী পক্ষের সূচনায় চারিদিকে উৎসবের আমেজ। শরতের ঝলমলে আকাশ, বাতাসে পুজোর গন্ধ জানান দিচ্ছে মা আসছেন। সারা বছর কর্মব্যস্ততার মধ্যে কাটালেও পুজোর সময় প্রাণখোলা আনন্দে মেতে থাকতেই ভাল লাগে। সব ভাবনাচিন্তা দূরে সরিয়ে শুধু উৎসবের মেজাজে থাকাই ভাল। পুজো মানেই আড্ডা, খাওয়া দাওয়া, ঘুরে বেড়ানো। রোজকার নিয়ম থেকে বেরিয়ে এমন একটা জায়গায় পুজোর কটা দিন যদি কাটানো যায়, যেখানে থাকবে এই বসকিছুর আয়োজন। কলকাতা শহরে 'দি ওবেরয় গ্র্যান্ড, কলকাতা' পুজোয় নিয়ে এসেছে তাদের গ্র্যান্ড পুজোর আয়োজন, স্পেশ্যাল স্টেকেশন ব্যবস্থা। 'দি ওবেরয় গ্র্যান্ড, কলকাতা' ভারতের অন্যতম হোটেলগুলোর মধ্যে একটি। পুজোয় সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত তারা তাদের অতিথিদের জন্য রেখেছে বিশেষ আয়োজন। পুজোয় থাকবে স্পেশ্যাল মেনু। থাকছে পুজোর মহাভোজের এলাহি আয়োজন। থাকবে হরেকরকমের খাবারে সাজানো বাঙালি মহাভোজ। সপ্তমী থেকে দশমী দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে ৩টে পর্যন্ত থাকবে লাঞ্চের ব্যবস্থা। মহাভোজের আয়োজন হবে গ্র্যান্ড হোটেলের বলরুম এরিয়াতে। থাকবে বাফেও। সুস্বাদু বাঙালি পদে থাকবে চিংড়ির মালাইকারি থেকে কষা মাংস, পাবদার ঝাল, ভেটকি পাতুরি, চিতল মাছের পিঠে, তেল কই। সঙ্গে থাকছে বাংলার সুস্বাদু মিষ্টি। এককথায় শুক্তো থেকে কষা মাংস সবকিছুর সমাহার। খরচ প্রত্যেকের জন্য প্রায় ২৯৫০টাকা (ট্যাক্স ছাড়া)। শুধুমাত্র জমিয়ে পেটপুজো নয়, 'দি ওবেরয় গ্র্যান্ড'-এর সুসজ্জিত পুল এরিয়ায় নিশ্চিন্তে বসে আড্ডা দেওয়া, নিশ্চিন্তে বিশ্রামও নিতে পারবেন। এছাড়াও পাবেন ইন্টারনেট অ্যাকসেস ও লন্ড্রির সুবিধাও। তাই আর দেরি না করে উৎসবের দিনগুলোয় সাবেকিয়ানার সঙ্গে আধুনিক ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ এই ঐতিহ্যবাহী 'দি ওবেরয় গ্র্যান্ড' হোটেলে কাটিয়ে আসুন পুজোর দিনগুলো।







যোগাযোগ: www.oberoihotel.com,
ফোন: +৯১১১২৩৮৯০৬০৬



রানি রাসমনির বাড়ির পুজো

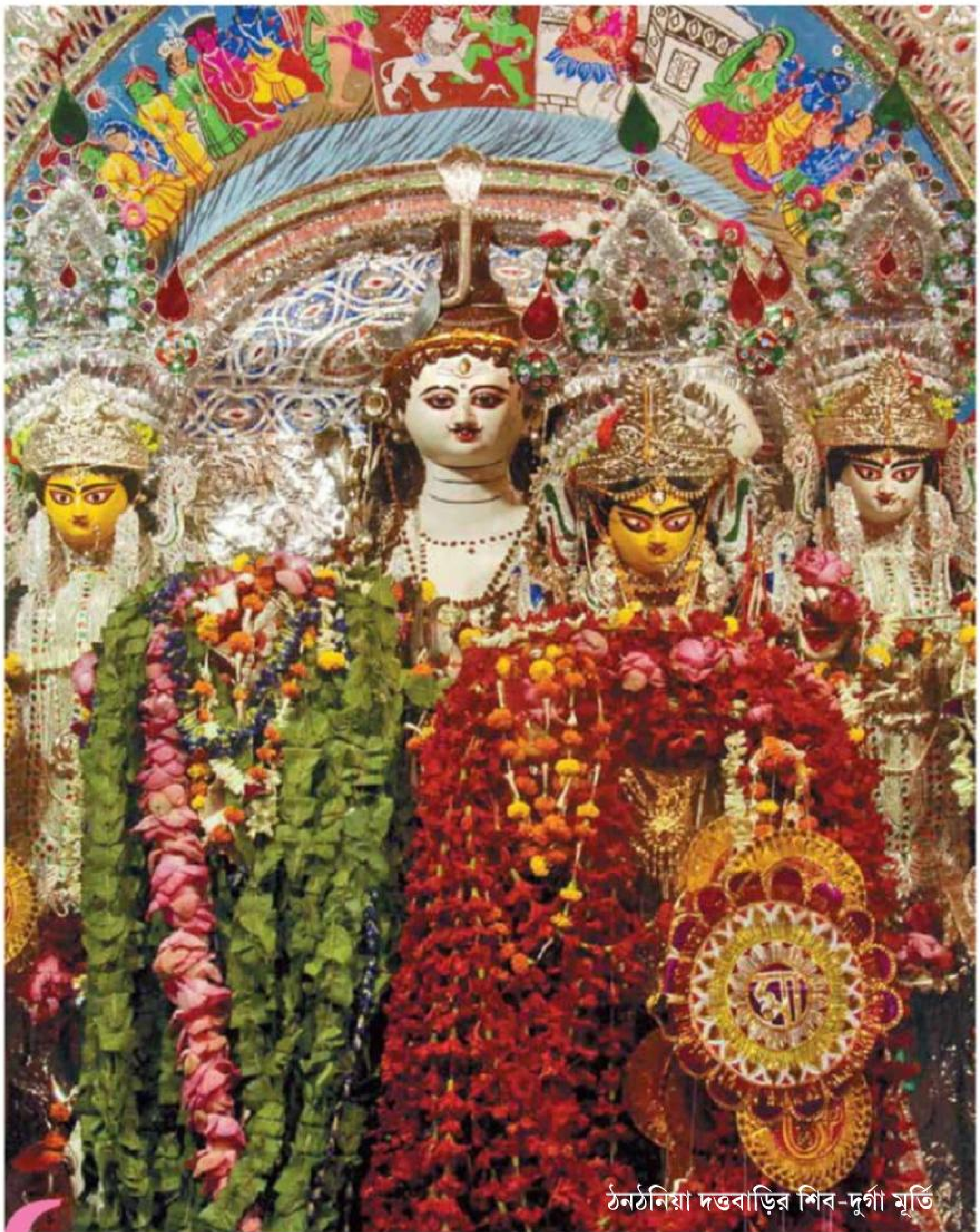
ঐতিহ্যে বিজড়িত দেবী দুর্গা

কলকাতা ও জেলার একাধিক ঐতিহ্যবাহী বাড়ির পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নানা রীতিনীতি। প্রতিটি দেবীমূর্তিরও রয়েছে কিছু বিশেষত্ব। এসব নিয়েই আলোচনা করলেন শিল্পী ও দুর্গা-গবেষক সৌমেন দত্ত।

কলকাতা ও মফস্‌সল মিলিয়ে এমন অনেক দুর্গাপুজোই রয়েছে যার আনুমানিক বয়স একশো, দুশো বা তিনশো (বা তারও বেশি) পেরিয়েছে। কিন্তু বয়সের ভারে ন্যুব্জ নয়, বরং এই ঐতিহ্যশালী বাড়িগুলি ধরে রেখেছে তাদের পুরনো ট্র্যাডিশনকে। দেবী-পুজোর নানা আচার-রীতিতে এখনও তাঁরা এখনও সেই ঐতিহ্যের ভার বহনকারী...

রানি রাসমণির বাড়ির পুজো: এই পুজোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল চণ্ডীপুরাণ চালচিত্র। বহু পুরনো ও স্বতন্ত্র ধাঁচের পটচিত্রের আদলে দেবীর চালচিত্র। কৃষ্ণ-গোপীদের লীলা, শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ ইত্যাদি সবই ফুটে ওঠে এখানকার চালচিত্রে। বীরভূমের শিল্পী লালু চিত্রকরের বংশ এই পটচিত্র তৈরি করেন। বাংলার শোলার কাজ, ডাকের সাজে সাজানো প্রতিমা। ১৭৯০ সালে রাজচন্দ্র দাসের হাত ধরে এখানে পুজোর সূচনা। সেই সময় থেকে পুজোর রীতি-নীতিতে প্রায় কোনও পরিবর্তনই হয়নি। এই

পালবংশের সময় থেকে এই পুজোর সূচনা। হালদার বাড়ির পুজোয় ঘট বিসর্জন হয়। এই বাড়িতে সিঁদুরখেলা হয় না।



ঠনঠনিয়া দত্তবাড়ির শিব-দুর্গা মূর্তি

উত্তর কলকাতার অন্যতম প্রাচীন পুজো ঠনঠনিয়ার দত্তবাড়ির পুজো। দ্বারিকানাথ দত্তের হাতে সূচনা হওয়া এই পুজোর বিশেষত্ব হল অষ্টমীর সন্ধিপুজোর বিশেষ রীতি। বাড়ির সব আলমারি, সিন্দুক খুলে দেওয়া হয় এই মাহেন্দ্রক্ষণে।

বাড়ির পুজোর অন্যতম আকর্ষণ এখানকার নানারকম ভাজা মিষ্টি। খাজা, গজা, মিহিদানা, লেডিকেনি-সহ নানা মিষ্টি ও নোনতা খাবার পরিবেশিত হয়। মহালয়ার পর প্রতিপদ থেকে নবমী অবধি প্রতিদিন একটি মাটির শিবমূর্তি বানিয়ে পুজো করা হয়। একটা সময়ে কবিগানের আসরও বসত এখানে।

ঠনঠনিয়া দত্তবাড়ি: উত্তর কলকাতায় দ্বারিকানাথ দত্ত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এখানকার দেবীমূর্তিকে। এখানে শিব-দুর্গামূর্তি যৌথভাবে পূজিত হন। তিনি যে আচার-অনুষ্ঠানের কথা বলে গিয়েছিলেন, সেই অনুসারেই এখনও পূজিত হন দেবী। দেবীমূর্তির ছাঁচেও কোনও পরিবর্তন আসেনি। এখানকার পুজোর একটি বিশেষত্ব হল, অষ্টমীর সন্ধিপুজোর লগ্নে পুরো বাড়ির শুদ্ধিকরণ হয়। বাড়ির সমস্ত আলমারি, সিন্দুক খুলে দেওয়া হয় সন্ধিপুজোর লগ্নে। বাড়িতে ছড়িয়ে দেওয়া হয় এক বিশেষ সুগন্ধী।

বাগবাজারের হালদার বাড়ি: এই ঐতিহ্যবাহী বাড়িতেও আদিকাল থেকে একই নিয়ম-রীতিতে পুজো হয়ে আসছে। কষ্টিপাথরের ‘মহিষমর্দিনী’ মূর্তি। বারো মাসই পূজিত হন দেবী। দেবীর মুকুটে রয়েছে ত্রিনয়ন। খুব একটা উঁচু মূর্তি নয় এঁদের। দেবীকে একটি কাঠের কাঠামোর উপরে বসানো হয়। বৈষ্ণব মতে পুজো হয় এখানে। শোনা যায়, পালবংশের সময় থেকে এই পুজোর সূচনা। হালদার বাড়ির পুজোয় ঘট বিসর্জন হয়। এই বাড়িতে সিঁদুরখেলা হয় না।

চিত্তেশ্বরী মন্দির: চিৎপুর অঞ্চলের চিত্তেশ্বরী দুর্গাপুজো চিতে ডাকাতের হাত দিয়ে শুরু হয়। তাঁরই নাম অনুসারে এই মন্দিরের নামকরণ। তাঁর মৃত্যুর পর আনুমানিক ১৬১০ সাল নাগাদ সেখানকার জমিদার মনোহর ঘোষ এগিয়ে নিয়ে যান পুজো। এখানকার দেবী বারো মাস পূজিত। প্রাচীন কলকাতার চিৎপুর অঞ্চলে বাঘের উপদ্রব ছিল বেশ। তাই, এখানকার মূর্তিতে সিংহের পাশাপাশি বাঘের অবস্থানও দ্রষ্টব্য। আরও একটি বিশেষত্ব হল, মায়ের সঙ্গে দক্ষিণরায়ের পুজোও হয় এখানে। বিশ্বাস করা হয়, চিতে ডাকাত মায়ের বুকে দেবনাগরী হরফে মন্ত্র লিখে গিয়েছেন। সেই মন্ত্রতেই দেবী আরাধনা করা হয় এখনও।

মুর্শিদাবাদের ছোট কাশিমবাজারের পুজো: একচালা মূর্তিতে পারিবারিক আদলে মায়ের মুখ। প্রায় ৩০০ বছর আগে ১৭০০ সালের আশেপাশে রাজবাড়িতে পুজো শুরু হয়েছিল। পারিবারিক পাণ্ডুলিপি মেনেই এই পুজো হয়



বাগবাজারের হালদার বাড়ি



কাশিমবাজার রাজবাড়ির রাজকীয় দেবীমূর্তি

আসছে। রথযাত্রার দিন কাঠামো পুজো হয়। এখানেও ন'দিনব্যাপী 'নবরাত্রি' পুজো হয়। আগে সপ্তমীর দিন ঘট প্রতিষ্ঠার আগে এক বিশাল সমাবেশ বেরত। হাতির পিঠে চড়ে ঘট নিয়ে আসতেন রাজা। এখন সেসব রীতিনীতি মানা সম্ভব না হলেও, বংশ পরম্পরায় পুজোর ঐতিহ্য একই। প্রতিপদ থেকে পঞ্চমী অবধি ১ লাখ বার দুর্গামন্ত্র জপ করা হয়। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিনদিনই এখানে কুমারী পুজো হয়। আর অপরাজিতা পুজো হয় দশমীর দিন।

বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মূর্তি: নবরত্ন মন্দিরের মধ্যে দেবী বিরাজমান। কালো পাথরের মূর্তি। এখানে দু'টি ঘট রয়েছে। দশমীর দিন মাটির ঘট বিসর্জন দেওয়া হলেও রুপোর ঘটে সারাবছর পূজিত হন দেবী। এখানকার বিশেষত্ব হল, শরৎ ও বসন্ত দুই ঋতুতে এই পুজো হয়। 'নবরাত্রি' পুজোও এখানকার বিশেষত্ব। অর্থাৎ, ন'দিনব্যাপী চণ্ডীপাঠ হয়। নাটমন্দিরে অবিরত চণ্ডীপাঠ হয় এখানে। সপ্তমীর দিন বসানো হয় রুপোর ঘট। প্রতিদিন প্রায় ৪০০ মানুষ ভোগ খেতে আসেন এখানে। বর্ধমানের মহারাজা এই জেলায় এসেছিলেন ব্যবসার কাজে। পঞ্জাব ক্ষত্রিয় পরিবার বাংলায় এসে সহজে বাংলার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। তিনিই শুরু করেন এই পুজো।



সর্বমঙ্গলা মূর্তি

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের পুজো: এখানকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 'মহামারির' পুজো। তৎকালীন বাংলা তথা বীরভূমে কলেরার প্রাদুর্ভাব ছিল ভয়ঙ্কর। রাজা ভাবতেন তিনি ও তাঁর প্রজারা যেন সুস্থ থাকেন। সেই থেকেই এই মহামারির পুজোর সূচনা। বর্তমানেও সেই পুজো হয়ে আসছে। নবমীর দিন মধ্যরাতে এই পুজো হয়। এখন রাজপরিবারের একজন সদস্য জীবিত, সলিল সিংহ ঠাকুর। তিনিই পুজো সামলান। মৃণ্ময়ীরূপে পূজিত হন দেবী। পটচিত্রে পুজো হয়। রাজপরিবারের সদস্যদের একটি বিশেষ ভোগ খেতে হয়— পাঁচ পোয়া ভাত, পাঁচ পোয়া মুগডাল, সৈন্ধব লবণ ও কাঁচকলা। আগেকার দিনে নীলকণ্ঠ পাখি উড়িয়ে দেওয়া হত। কিন্তু এখন সেই প্রথায় ইতি পড়েছে। কামান দাগার প্রচলনও ছিল। এখনও সন্ধিপুজোর দিন কামান দাগা হয়। কলকাতাতেও জোড়াসাঁকোর দাঁ বাড়িতে এই রীতির চল আছে।

নদীয়ার রাজ রাজেশ্বরী: সর্বজনীন পুজোর সূচনায় নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দে-র ভূমিকার কথা বহুশ্রুত। তাঁর বাড়ির অর্থাৎ নদীয়ার রাজবাড়ির পুজোর এই মূর্তি ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের এক উজ্জ্বল নমুনা। আলাদা আকর্ষণ চালচিত্র। চালচিত্রের মধ্যে দশমহাবিদ্যা বিদ্যমান। এই বাড়ির সিঁদুরখেলার আলাদা ঐতিহ্য রয়েছে। প্রাচীনকালে রানিমা সবার আগে বরণ করতেন দেবীকে। তারপর শুরু হত



চিত্তেশ্বরী মন্দির



বিষ্ণুপুর মল্লরাজাদের পুজো



শ্রীরামপুর দে বাড়ি

সিঁদুরখেলা। এখনও প্রায় ৪০০০ মহিলা ভিড় করেন এই উপলক্ষে। ১০৮ এখানকার বিশেষ সংখ্যা। ১০৮ জন ঢাকি, ১০৮ মণ চাল...সবই ওই সংখ্যাতেই হতে হবে। এমনকি এক সময়ে ১০৮টি বলি হত!

হাওড়ার আন্দুল দত্তচৌধুরীদের পুজো: আনুমানিক ১৬০৫-১৬২৭ সালের মধ্যে শুরু হয়েছিল এই পুজো। দেবীর বোধন হয় কৃষ্ণনবমী থেকে। মাটির বেদীর উপরে দেবীর অধিষ্ঠান। চৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতিবিজড়িত এই জায়গাকে অত্যন্ত পবিত্র বলে ধরা হয়। কীর্তনের অনুষ্ঠানও এখানকার বিশেষত্ব। দেবী এখানে রাজ রাজেশ্বরী রূপে পূজিত হন। পরিবারের অবিবাহিত মেয়েদের দেবীপক্ষে হাতে শাঁখা পরার রীতি রয়েছে। কিন্তু তাঁরা নোয়া পরতে পারেন না। লম্বা জিভেগজা এখানকার অন্যতম প্রসাদ। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী দেবীর উদ্দেশ্যে অন্নভোগ দেওয়া হয়। সপ্তমী-অষ্টমীতে খিচুড়ি ও নবমীতে পোলাও দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। আগে অবশ্য লুচি দেওয়া হত। মহাষ্টমীর দিন কালো প্রদীপের আরতি এখানকার বিশেষ রীতি। নবমীর দিন ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ জোড়া কুমারী পুজো হয় এখানে। দেবীর শোভাযাত্রায় মহিলাদের অংশগ্রহণ করবার নিয়ম নেই।

হুগলীর আটপুর রামকৃষ্ণ মিশনের পুজো: হরিপাল স্টেশন থেকে খানিকটা দূরে এই পুজো। এখানে পুজোর যাবতীয় জোগাড়যান্তি করেন মঠের পুরুষ সন্ন্যাসীরা। এখানকার বিশেষত্ব হল কুমারী পুজো। বেলুড় মঠের কুমারী পুজোর সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। কলকাতায় একাধিক বাড়িতেই সপ্তমী-অষ্টমী বা অষ্টমী-নবমীর দিন কুমারী পুজো হয়। শিউলি ফুল, বেলপাতা, আমপাতা, পদ্মফুল সহযোগে কুমারী পুজো হয়। দুই থেকে দশ বছরের মেয়েরাই কুমারী হিসেবে বিবেচিত হন। সন্ন্যাসীরা বিশেষ পোশাক পরে নিয়মাচার পালন করেন। চালকুমড়ো, আখ বলি দেওয়ার রীতি রয়েছে এখানে।

এছাড়াও উল্লেখযোগ্য: দর্পনারায়ণ মল্লিক স্ট্রিটের বৈষ্ণবদাস মল্লিকবাড়ির পুজোয় পূজিত হন শিবদুর্গা যৌথভাবে। শ্রীরামপুরে দে বাড়ির একটি বিশেষত্ব হল মায়ের অঞ্জলির সময়ে সব মহিলারা দেবীমূর্তিকে প্রদক্ষিণ করেন। চোরবাগানের শীল বাড়িতে আবার গাভিপুজো করা হয়। এই পুজোর উদ্দেশ্য হল শুদ্ধিকরণ। বাড়ির সদস্যরা মিলে অষ্টমীর সন্ধেবেলা অনুষ্ঠান করেন নিয়ম করে। কলকাতার নীলমণি দে ঠাকুরবাড়িরও আলাদা ঐতিহ্য রয়েছে। হাটখোলা দত্তবাড়িতে পুরুষ সদস্যদের কাঁধে চেপেই মায়ের বিসর্জন হয়। বিসর্জনের সময়ে দেশাত্মবোধক গান 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গাওয়া হয়।

ছবি সৌজন্যে: সৌমেন দত্ত
অনুলিখন: মধুরিমা সিংহ রায়



নদীয়ার রাজ রাজেশ্বরী



পুজো কাটুক পোষ্যদের নিয়ে

পুজো মানে সকলে একসঙ্গে উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠা। পোষ্যরা তো পরিবারেরই একজন সদস্য। এবার পুজোয় প্রিয় পোষ্যকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠুন। রইল 'সানন্দা'-র এই বিশেষ প্রতিবেদন। লিখেছেন মৌমিতা সরকার।

মা দুর্গার আগমনে আকাশ, বাতাস, প্রকৃতি, মর্ত্যবাসী মেতে ওঠে প্রাণখোলা উচ্ছ্বাসে। কিন্তু এই উৎসব কি শুধু মানবজাতির জন্য? আমাদের চারপাশে যেসব চারপেয়ে বন্ধুরা আছে তারাও তো এই সৃষ্টির অংশ। তাই উৎসবের আনন্দ উপভোগ করার অধিকার তাদেরও আছে। আমাদের অনেকের বাড়িতেই বিভিন্ন রকমের পোষ্য আছে। পোষ্যরা পরিবারেরই একজন। তাই পরিবারের সঙ্গে উৎসবের আনন্দে মেতে উঠলে তাতে পোষ্যদেরও সমান অধিকার আছে। এবার পুজো প্রিয় পোষ্যকে নিয়ে কীভাবে কাটাবেন, তা নিয়ে রইল কিছু ইনফো।

ইচ্ছে থাকলেও পুজোর অনেক জায়গায় পোষ্যকে নিয়ে যাওয়া যায় না। পুজো মণ্ডপ বা রেস্তরাঁয় এদের প্রবেশ নিষেধ থাকে। বাধ্য হয়েই পোষ্যকে তখন বাড়িতে রেখে বেরতে হয়। কিন্তু এ বছর পুজোয় পোষ্যকে নিয়ে নিশ্চিন্তে পুজো মণ্ডপ যেতে পারেন। চলুন এবার জেনে নিই এমন কয়েকটি পুজোর কথা।

বিধান সরণি অ্যাটলাস ক্লাব পুজো:
এক অভিনব পুজো মণ্ডপের আয়োজন করেছে বিধান সরণি অ্যাটলাস ক্লাব। তাদের থিম এবার 'পেট ফ্রেন্ডলি পুজো'। শিল্পী সায়ক রাজের অভিনব ভাবনাচিন্তা থেকেই এই পেট ফ্রেন্ডলি পুজো। পোষ্য অভিভাবকরা যাতে

পোষ্যকে নিয়ে পুজো দেখতে পারে তাই এ ব্যবস্থা। এখানে দেবীমূর্তির সঙ্গে দুটি পথ সারমেয়র মূর্তিও থাকবে। এই পুজোতে পোষ্যকে নিয়ে এলে তাদের জন্য ভিআইপি লাইন থাকবে। এছাড়া একজন ভেটিরিনারিও থাকবেন, যাতে পোষ্যদের কোনও সমস্যা না হয়। হেল্পলাইন নম্বরের ব্যবস্থাও থাকছে এখানে। মণ্ডপে আসার আগে এই হেল্পডেস্কে ফোন করলে সহজেই মণ্ডপে প্রবেশের ব্যবস্থা থাকবে। মহালয়ায় এই পুজোর উদ্বোধন। প্রতিপদ থেকে তৃতীয়া পর্যন্ত শুধুমাত্র পোষ্যকে নিয়ে এলেই মণ্ডপে প্রবেশ করতে পারবেন। তাই এবার পুজোয় পোষ্যকে নিয়ে ঘুরে আসুন বিধান সরণি অ্যাটলাস ক্লাব থেকে।
হেল্পলাইন নং: ৮৯১০৯২১৪১৪

হাওড়া সালকিয়া ছাত্র ব্যায়াম সমিতি: হাওড়া জেলার এই পুজোতেও থাকছে পেট ফ্রেন্ডলি আয়োজন। পুজো মণ্ডপে থাকবে পোষ্যদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা। মণ্ডপ পার্শ্ববর্তী উদ্যানে থাকছে এদের খেলাধুলো করার ব্যবস্থাও। শুধু সারমেয় নয়, পাখি, খরগোশ, বিড়াল সব পোষ্যকেই নিয়ে আসতে পারেন এখানে। শুধু তাই নয়, পথ কুকুরদের জন্য পুজো কমিটি করেছে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা। তাই পোষ্যকে নিয়ে অবশ্যই আসুন এখানে।



বিধান সরণি অ্যাটলাস ক্লাব পুজো


বিধান সরণি অ্যাটলাস ক্লাব পুজো

সেলেব ও তাঁদের পোষ্য

দি তি প্রি য়া রা য়, অভিনেত্রী

অভিনেত্রী দিতিপ্রিয়া রায়ের একটি পোষ্য সারমেয় আছে। নাম পপকর্ন। দিতিপ্রিয়ার পরিবারের কাছে তার পোষ্য পরিবারেরই একজন সদস্য। তাই পুজোয় তিনি তাঁর পোষ্যকে নিয়েই আনন্দে মেতে ওঠেন। দিতিপ্রিয়া তার বাড়ির সামনে পুজো মণ্ডপে পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গেই সময় কাটাতে ভালবাসেন। সেই মণ্ডপে আড্ডার আসরে পাড়ার অনেকেই তাদের পোষ্যদের নিয়ে আসেন। পুজোর সময় দিতিপ্রিয়া তার পোষ্যর জন্যও কেনাকাটা করেন। পপকর্নকে কিনে দেওয়া হয় নতুন জামা, বেল্ট, অ্যাকসসরিজ়ও। পুজোর সময় প্রায়ই বাইরে খাওয়া দাওয়া হয়, তাই দিতিপ্রিয়া ও পাড়ায় তার বন্ধুদের বাড়ির পোষ্যদের জন্য আলাদা করে রান্নার ব্যাবস্থাও করা হয়। এই পুজোতে অভিনেত্রী সকলের উদ্দেশ্য বলতে চান, "আমাদের আনন্দ যেন এই অবলা প্রাণীদের কষ্টের কারণ না হয়। এমনকিছু কখনওই করা উচিত নয়, যাতে এই প্রাণীগুলো ভয়, বা কষ্ট পায়।"



অ ভি ষে ক দ ত্ত, ফ্যাশন ডিজ়াইনার

পুজো এমন একটা সময় যখন আমরা সকলেই নিজের পরিবার ও প্রিয় মানুষগুলোর সঙ্গেই কাটাতে চাই। ফ্যাশন ডিজ়াইনার অভিষেক দত্তর কাছে তার পোষ্যরা তার সবচেয়ে প্রিয় ও কাছের। তাই পুজোর দিনগুলোতে পোষ্যকে ছাড়া আনন্দ করার কথা ভাবতেও পারেন না তিনি। পুজোতে সাধারণত


দিতিপ্রিয়া রায়


অভিষেক দত্ত


দ্য কমনরুম ক্যাফে


কাপে বং ক্যাফে

অভিষেক তাঁর পোষ্যদের নিয়ে কোনও পেট ফ্রেন্ডলি হোটেল অথবা রিসর্টে গিয়ে ছুটি কাটাতে পছন্দ করেন। সেখানে গিয়ে নিশ্চিন্তে আরাম করে পোষ্যদের নিয়ে সময় কাটান। পুজোর সময় অভিষেক তার পোষ্যদের জন্য নতুন পোশাক অবশ্যই বানিয়ে দেন। এবছর পুজোতে একই রকমভাবে কাটাতে চাইবেন তিনি। এবছর পেট ফ্রেন্ডলি পুজো মণ্ডপেও পোষ্যদের নিয়ে ঘুরতে চান তিনি।

পুজো মানেই জমিয়ে খাওয়াদাওয়া। এই সময় পোষ্যকে নিয়ে কোথায় যাবেন। রইল এমনই কয়েকটি কাফের সন্ধান

দ্য কমনরুম কাফে: দক্ষিণ কলকাতার সাদার্ন এভিনিউ অঞ্চলে আছে এই পেট ফ্রেন্ডলি কাফেটি। এখানে অপনি আপনার পোষ্যদের নিয়ে আসতে পারবেন। ওদের জন্য পুজোর সময় থাকবে স্পেশ্যাল মেনু। তার মধ্যে থাকবে বয়েলড চিকেন, এগ হোয়াইট, নানা রকমের আইসক্রিম। শুধু তাই নয়, পোষ্যদের জন্য আছে পোশাক, ব্যান্ডানা, কলার সহ বিভিন্ন রকমের সাজ সামগ্রী।



এখানে একসঙ্গে প্রায় ১০-১২টি পোষ্য থাকতে পারবে। এই কাফের কর্নধার নীলাঞ্জল বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটবেলা থেকেই পোষ্যদের খুব ভালবাসেন। সারমেয়দের প্রতি ভালবাসাই এই কাফে তৈরির অনুপ্রেরণা। এখানে পোষ্যকে নিয়ে এলে ন্যূনতম ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা খরচ হতে পারে। তাই এবার পুজোয় পোষ্যকে নিয়ে এখানে একবার ঘুরে যেতেই পারেন।

কাপে বং পেট ফ্রেন্ডলি কাফে: দক্ষিণ কলকাতার বাইপাস পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে একটি পেট ফ্রেন্ডলি কাফে 'কাপে বং'। এখানেও আপনি পোষ্যদের নিয়ে আসতে পারেন। এখানে একসঙ্গে চার থেকে পাঁচটি পোষ্য থাকতে পারবে। পোষ্যর অভিভাবকরা তাদের পোষ্যদের সঙ্গে নিয়েই এখানে আসতে পারবেন। এখানে সাধারণত কন্টিনেন্টাল ও ফিউশন খাবারই পাওয়া যায়। পোষ্যদের জন্যও থাকছে বিশেষ ব্যাবস্থা। কাফের কর্ণধার অমিত হালদারের নিজের বাড়িতে অনেক পোষ্য আছে। তারাই অমিতের এই প্রচেষ্টার অনুপ্রেরণা।



বিশেষজ্ঞ ডা. গৌতম মুখোপাধ্যায়

পুজোর আগে পোষ্যদের জন্য বিশেষ পরামর্শ।

- পোষ্যকে নিয়ে ঘুরতে গেলে পেট ফ্রেন্ডলি হোটেল বা রিসর্টে অবশ্যই থাকবেন।
- পোশ্যকে ক্রেশে রেখে গেলে, যাওয়ার আগে এবং আসার পরে অবশ্যই টিক মেডিসিন খাওয়াবেন। ক্রেশে দেওয়ার আগে ভ্যাকসিন দিতে ভুলবেন না।
- ক্রেশে আপনার পোষ্যর ডায়েট চার্ট দিয়ে রাখবেন। এবং কোনও বিশেষজ্ঞের যোগাযোগ দিয়ে দেবেন, যাতে প্রয়োজনে তারা যোগাযোগ করতে পারেন।
- পুজোর সময় অনেক ডাক্তার পাওয়া যায় না। তাই পুজোর আগে অবশ্যই চেকআপ করিয়ে নেবেন। এবং বাড়িতে প্রয়োজনীয় ওষুধ রাখবেন।
- শব্দবাজিতে পোষ্যদের সমস্যা হতে পারে। এরকম হলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে 'কামইন' ওষুধ খাওয়াতে পারেন।

এবার পুজো কাটুক ভিন্নভাবে। সকলের সঙ্গে পোষ্যরাও মেতে উঠুক আনন্দ উৎসবে।



নৃত্য

ইস্কনের একান্নতম বর্ষের কলকাতা রথযাত্রা এবার নিয়ে এল পঞ্চম বর্ষের গুন্ডিচা নৃত্য উৎসব। উৎসবের প্রথম সন্ধ্যায় উদ্বোধনী পর্বে বিগ্রহের সামনে পুষ্পারতি করেন প্রীতি পটেল (মণিপুরি), তানিয়া দেওয়ানজি (ভরতনাট্যম), দেবমিত্রা সেনগুপ্ত (ওড়িশি), রুবেনা চট্টোপাধ্যায় (কত্থক) এবং শম্পা মুখোপাধ্যায় (শিক্ষাবিদ)। সঙ্গে ছিলেন রমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (কত্থক)। প্রথম সন্ধ্যায় রমাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় তাঁর কত্থক নৃত্যদল উপস্থাপন করে 'রাধে রানি ব্রজকো চলি' ও পরে নবমাত্রিক তালের একটি প্রস্তুতি। প্রতিটি উপস্থাপনাই ছিল অত্যন্ত উপভোগ্য। দ্বিতীয় সন্ধ্যার শুরুতেই প্রিয়দর্শিনী ঘোষের পরিচালনা ও অংশগ্রহণে নাট্যনোভা নৃত্যদল উপস্থাপন করে দুটি অষ্টপদী (ভৈরবী, আদি তাল ও রাগমালিকা) এবং একখানি তিল্লানা (ধনশ্রী, আদিতাল)। তৃতীয় সন্ধ্যারও শুরু হয় ওড়িশি নৃত্য পরিবেশনা দিয়ে, চয়নে ছিল দলগত পরিবেশন, পল্লবী, কৃষ্ণবন্দনা ও রাজনীতা পরিবেশিত একক 'আহে নিলো সইলো'। এদিনের অপর পর্বে ছিল ভরতনাট্যম নৃত্য। অভয় পালের পরিচালনায় কুথুহলম নৃত্যগোষ্ঠীর সদস্যরা পরিবেশন করে একটি গান (সীথাকমলা কুচা বন্দনা। চতুর্থ সন্ধ্যায় ছিল অরিজিৎ বণিক ও সুলগ্না বণিক এবং তাদের আলিম্পং নৃত্যগোষ্ঠীর কুচিপুড়ি নৃত্য। সন্ধ্যার দুই পর্বের জন্য বরাদ্দ ছিল দুই মনোরম আকর্ষণ! গুরু কেলুচরণ মহাপাত্র রচিত 'আহি নিলো সইলো'-র পর অর্পিতা রচিত নৃত্য রচনা 'গুরুর অষ্টকম্' ছিল উপভোগ্য। পরবর্তী সন্ধ্যায় গৌড়ীয় নৃত্য নিবেদন করেন কাবেরী পুততুন্ড কর ও সহশিল্পীরা। সমবেত পরিবেশনে ছিল একটি ওড়িয়া সঙ্গীত, হরিরিহা মুগ্ধা এবং রঘুনাথের এককে একটি হিন্দি ভজন 'বোল পিঞ্জর কা তোতা'-র আশ্রয়ে নৃত্য। সমগ্র পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়।

নৃত্য



প্রবাদপ্রতিম শিল্পী কেলুচরণ মহাপাত্র ও শ্রীমতি সংযুক্তা পানিগ্রাহী'র স্মরণে হয়ে গেল তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান 'শ্রদ্ধাঞ্জলি'২২''। প্রথমদিনের শুরুতেই 'গতিভেদ পল্লবী', 'নাগেন্দ্রহারায়', 'শুদ্ধ দৈবৎ বিভাষ' ইত্যাদি উপস্থাপনাগুলি বিশেষ নজর কাড়ে। দ্বিতীয় দিনে কাকলি বোস গ্রুপের উপস্থাপনায় 'দেশ পল্লবী' এবং সুবিকাশ মুখার্জী গ্রুপের 'লহরী' উল্লেখযোগ্য। অনুষ্ঠানের শেষ দিনে ওড়িশি নৃত্যশিল্পী সুজাতা মহাপাত্র, ভরতনাট্যম শিল্পী শ্রীমতি রমা বৈদ্যনাথন প্রমুখদের উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখা যায়। সর্বশেষ উপস্থাপনায় দেখা যায় কথক নৃত্য গ্রুপ 'প্রেরণা'-র চমৎকার পরিবেশনা।

ফো টো গ্রা ফি

কোভিড-পরবর্তী সময়ে মানুষের ধুলো পড়ে যাওয়া কৃষ্টিচেতনাকে নতুন করে জাগিয়ে তুলতে ও আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে শহরে হয়ে গেল এক অভিনব ফোটোগ্রাফি প্রদর্শনী। বিশ্বতোষ সেনগুপ্তের একান্ত উদ্যোগে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে ২৯ জুন থেকে ৫ জুলাই কলকাতায় প্রদর্শীত হল 'ম্যাথামেটিক্যাল ফোটো আর্ট'। এটি তাঁর সপ্তম একক ফটোগ্রাফি-প্রদর্শনী। প্রকৃতির চারদিকে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন আঙ্গিক শুধুই ক্যামেরায় নয়, তাকে গাণিতিকভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপনা করাই শিল্পীর মুখ্য উদ্দেশ্য। শিল্পী বিগত প্রায় ষাট বছর ধরে এই পেশার সঙ্গে স্বমহিমায় যুক্ত। তিনি মনে করেন, ''চিত্রকলা এবং গণিত এই দুই মানব জীবনের এক বিশেষ অঙ্গ। সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ চেষ্টা করে আসছে আকার'কে সঙ্গী করে তাদের মনের ভাব প্রকাশ করার। আমার কাজ মানুষের সেই চিরন্তন ভাবনাকে সাকার করা।'' প্রদর্শনীর বহু প্রশংসিত ছবিগুলির মধ্যে 'মি উইথ হাই গার্ল' (নীচের ছবি), 'হ্যাপি মোমেন্ট', 'জিওমেট্রি', 'রিপলিং মাস', 'টু-ওয়ান জ়িরো', 'সারপেন্টাইল বিউটি', 'নির্বাণ', 'আইফেল টাওয়ার', 'ফিগার স্টাডি ০০২' উল্লেখযোগ্য।



সানন্দা
অ্যাপ

অ্যাপে ক্যানসার বধ

ক্যানসারের জটিল ধাঁধার সহজ উত্তর এখন আপনার মুঠোফোনে। আসছে 'কারকিনোস' অ্যাপ।

ক্যানসার রোগের নিরাময়ে খুলে গেল এক নতুন দিগন্ত। 'কারকিনোস' সেই যুগান্তকারী আবিষ্কারের নাম। কলকাতায় সম্প্রতি হয়ে গেল এই অ্যাপ লঞ্চের অনুষ্ঠান। গুগল প্লে স্টোরে বা অ্যাপল প্ল্যাটফর্মের সহজেই মিলবে এই অ্যাপ। এই অ্যাপের মাধ্যমে স্বল্প খরচে ও কম সময়ে ক্যানসারের চিহ্নিতকরণ সম্ভব। প্রায় ছ'ধরনের ক্যানসারের ডিটেকশন, এক্সপার্টের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ এবং মেডিক্যাল রিপোর্টের সুবিধা রয়েছে এতে। বিভিন্ন অত্যাধুনিক ফিচারের সঙ্গে এই অ্যাপ হাজার হাজার মানুষকে পরিষেবা দেবে। ব্রেস্ট ক্যানসার, ওরাল ক্যানসার, কোলন ক্যানসার, লাং ক্যানসার সহ একাধিক ক্যানসার-পূর্ববর্তী উপসর্গ এই অ্যাপে ধরা পড়বে। সহজ অনলাইন বুকিংয়ের মাধ্যমে এক্সপার্টেদের সঙ্গে সরাসরি কনসাল্টেশনের সুযোগও পাওয়া যাবে। চিকিৎসা সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে পেমেন্ট করার পর ব্যক্তি সহজেই তার রিসিট দেখতে পারবেন, ফলে উভয়পক্ষেই থাকবে স্বচ্ছতা। ব্যক্তি তার পূর্ববর্তী হেলথ রেকর্ড আপলোড করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে পরে তা চিকিৎসকদের দেখাতেও পারবেন। কোনও কাগজি প্রেসক্রিপশনের প্রয়োজন হবে না। সকলেরই আশা এই অ্যাপের ব্যবহার ক্যানসার নিরাময়ে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।



সানন্দা
ইভেন্ট ২



শহরে 'ম্যাঙ্গোম্যানিয়া'

আমের স্বাদ কার না প্রিয়? স্বাদের মোড়কে গ্রীষ্মের শহরে আয়োজিত হল আমের এক অভিনব উৎসব। সঙ্গী রইল 'সানন্দা'।

অ্যাক্রোপলিস, T2 এবং সানন্দার সম্মিলিত উদ্যোগে শহরে আয়োজিত হল আম-উৎসব 'ম্যাঙ্গোম্যানিয়া'। পাঁচদিনের এই অভিনব উৎসবে ছিল অনেক মজা ও স্বাদের বাহার। বলা বাহুল্য, স্বাদ প্রিয় বাঙালির আমের স্বাদ চেখে দেখার এ ছিল এক সুবর্ণ সুযোগ। ফলের রাজা আমকে নিয়ে সৃষ্টি হল এক নতুন উদযাপন। দেখা গেল আপামর জনতার অনাবিল উৎসাহ। আম খাওয়ার এই বিশেষ প্রতিযোগিতায় দেখা গেছে সাধারণ মানুষের বিপুল অংশগ্রহণ। চলতি বছরের ২৯ জুন থেকে ৩ জুলাই পর্যন্ত চলে এই প্রতিযোগিতা। বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী সৌমিত্র রায় এবং কে বিজয়ন উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। একটি এন.জি.ও-র শিশুরা এই মজার প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সৌমিত্র রায় এবং কে বিজয়ন এই সকল শিশুদের জন্য রঙিন উপহারের আয়োজন করেন। অন্যান্য খাদ্য উৎসবের সঙ্গে 'ম্যাঙ্গোম্যানিয়া'র এই প্রতিযোগিতার তফাত হল, বাংলার বিভিন্ন জায়গার স্বনির্ভর ও কৃষক গোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সমস্ত পণ্য দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মহিলাদের দ্বারা উৎপাদিত। অর্থনৈতিকভাবে ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া এই সকল মহিলাদের উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সঠিক মূল্যের উপর বিশেষ নজর রাখা হয়। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত আম আসে সরাসরি কৃষকদের থেকে। ম্যাঙ্গো স্কোয়াশ থেকে ম্যাঙ্গো কেক, আম-চা থেকে আম দই, উৎসবে হাজির ছিল সবকিছুই। বর্ষার শুরুতে আম-কে কেন্দ্র করে অভিনব এই উৎসব জনমানসেও যথেষ্ট সাড়া ফেলে। তৈরি হচ্ছে আগামির প্রস্তুতি।



রাতের সাজে বোল্ড আই মেক-আপের সঙ্গে উজ্জ্বল লিপস্টিক চলতে পারে। দিনের বেলা যে কোনও একটা দিক হাইলাইট করলেই ভাল লাগবে বেশি।





১ বোল্ড আই মেক-আপ চাইলে মেটালিক শেডের গ্লিটার চেপে চেপে লাগান আইলিডে।



২ সঙ্গে পুরু করে কাজল পরে নিন। স্মোকি এফেক্ট চাইলে হালকা করে স্মাজ করে নিতে পারেন।



৩ আইল্যাশ ৩০ সেকেন্ড ধরে কার্ল করে মাসকারা দিয়ে বারকয়েক কোট করে নিন।



৪ পোশাকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বা কনট্রাস্ট করে লিপশেড লাগিয়ে নিন ঠোঁটে।

ফেস্টিভ গ্ল্যামার

এথনিক পোশাকের সঙ্গে জমকালো সাজের জুটি... তার জন্য পুজোর চেয়ে সেরা সময় আর কিছু হতেই পারে না! জেনে নিন গর্জাস মেক-আপের সহজ কৌশল।

সারাবছর হালকা সাজ নিয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা চলে। উজ্জ্বল রং, গ্লিটার, শিমার... এসব তখন ব্রাত্য। জমকালো সাজে ‘উগ্র’ হয়ে ওঠার ভয়ে সকলেই ঝুঁকে পড়েন মিনিম্যাল, নো-মেক-আপ সাজের দিকে। কিন্তু পুজোর সময় এত ভাবনাচিন্তার প্রয়োজনই নেই! বরং জমকালো সাজ ওই ক’দিনের জন্য সকলের বেস্ট ফ্রেন্ড। না না, মেক-আপ প্রো নন বলে মুখ কাঁচুমাচু করার দরকার নেই। সহজ কৌশল শিখিয়ে দিচ্ছি, যাতে আগামী ক’দিন ভিড়ে মধ্যমণি হয়ে উঠতে পারেন সকলেই।



প্রথমেই বলব, বেস মেক-আপের উপর বেশি করে জোর দিন। বেস যদি ভাল হয়, সব সাজেই আকর্ষণীয় দেখাবে। ত্বক ভাল করে ময়শ্চারাইজ় করে প্রাইমার লাগিয়ে ফাউন্ডেশন সময় নিয়ে ব্লেন্ড করুন। তারপর কমপ্যাক্ট দিয়ে সেট করে নিন। পোশাকের রঙের রেফারেন্স রাখতে পারেন মেক-আপে। আবার কনট্রাস্টিং কালার প্যালেটও বেছে নিতে পারেন। আর কিছু না পারলে, চোখে সরু লাইনার এঁকে ঠোঁট ভরাট করে নিন বোল্ড লিপশেডে। দেখবেন, গ্ল্যামারাস হয়ে ওঠা আর কঠিন মনে হবে না!